সূচী

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সাফল্য *

আজ বিশ্বময় একটা সাড়া পড়ে গেছে যে বিংশ শতাব্দী শিশু-শতাব্দী। এ পর্য্যন্ত আমরা শিশুশিক্ষায় যত্নবান বা সফলকাম হই নি, বরং উল্টো—আমাদের ভুল উদ্দেশ্য ও প্রণালীর কঠিন নিষ্পেষণে তার মনোবৃত্তিগুলিকে মৃত, শুষ্ক করে তুলেছি। ফলে তার মনের, বুদ্ধির, শরীরের কোন বিকাশই হয় নি। তাই আজ দেশময় এই অনুভূতি এসেছে যে এমন এক সঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে আসতে হবে শিক্ষায় যার সংস্পর্শে শিশু তার অন্তর্নিহিত শক্তির দীপ্তিতে সুন্দর শক্তিমান্ হয়ে উঠবে, আত্মা হবে তার প্রশান্ত জ্যোতিষ্মান্।

দেশময় এই যে অনুভূতি এসেছে এও কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু এও ঠিক, শুধু এই অনুভূতি এলেই সমস্যার সমাধান হবে না। একটা অনুভূতির রঙ্গীন অস্পষ্ট আবছায়ায় বসে কূলহীন সীমাহীন শিক্ষাসমুদ্রে আমাদের খেয়ালের নৌকো ভাসিয়ে দিলে শিক্ষায় সুফল কোনদিন যে হবে তা মনে হয় না, তরী যে কোনদিন ফলফুলশোভিত নয়নাভিরাম কূলে এসে পৌঁছুবে তারও সম্ভাবনা খুবই কম। শিক্ষাসমুদ্রে নামবার আগেই আমাদের ঠিক করে নিতে হবে কোন্ কূলে আমরা তরী ভাসাব। এক কথায় আমাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি তা ঠিক করে নেওয়া দরকার। তাই প্রশ্ন ওঠে এই বিরাট যাত্রার পথশেষ কোথায়? এই পথনির্দ্দেশ সম্বন্ধে কতই না দেশে দেশে লেখা হয়েছে, বলা হয়েছে। কাহারো মতে আমাদের মনোবৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য, কাহারো মতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষসাধনই শিক্ষার কাম্য, আবার

* মেদিনীপুর শিক্ষকসম্মিলনীতে পঠিত।

কাহারো মতে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এ সকল উদ্দেশ্যগুলির ভিতরেই একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে গেছে—কেন যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধন বা মনোবৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ সাধন দরকার সে কথা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা স্পষ্ট করে কোন দিন বলেন নি। কারণ তাঁরা এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

পাশ্চাত্যের শিক্ষায় ব্যক্তিগত অধিকারগুলির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের উপর বিশেষরূপে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। এদেশে শিক্ষার যে আদর্শ আজ প্রায় ত্রিশ শতাব্দী ধরে চলে আসছে তা ভারতের নিজস্ব এবং আজ সমগ্র পাশ্চাত্য ব্যক্তিত্বের আবর্ত্তে পাক খেয়ে সেই পন্থারই অনুবর্ত্তী। ভারত পথপ্রদর্শক হয়েছে সমাজের কাছে মানুষের ঋণ দেখিয়ে দিয়ে, ভারত চিরদিন শিক্ষা দিয়ে এসেছে সেই শিক্ষাই সফল সর্ব্বাঙ্গীন স্থন্দর—যে শিক্ষা মানুষকে শিখিয়ে দেয় তার পিতৃঋণ শোধ কর্ত্তে, তার দেবঋণ শোধ কর্ত্তে, তার সমাজঋণ শোধ কর্ত্তে, তার রাষ্ট্রঋণ শোধ কর্ত্তে। আজ এই শিক্ষা শুধু পাশ্চাত্যেই কেন, সমগ্র বিশ্বের কাছে কাম্য হয়ে উঠেছে। কারণ জগৎ বুঝতে পেরেছে, ব্যক্তিত্বের নেশার ঝোঁকে আমরা মেতে উঠি শুধু আমাদের অধিকারের দাবীদাওয়াগুলো নিয়ে, ভুলে যাই প্রতি অধিকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গাঁথা আছে আমাদের কর্ত্তব্য —পিতামাতার প্রতি, শিক্ষকের প্রতি, দেশের চিরন্তন আদর্শগুলির প্রতি, সমাজের প্রতি, নিজের প্রতি। আজ আমরা ভারতের সেই অতি পুরাতন চিরনূতন আদর্শ—পাশ্চাত্য আজ যে পন্থার অনুবর্ত্তী —তা ভুলে গেছি বলেই সেই আদর্শে ছেলেদের আমরা অনুপ্রাণিত কর্ত্তে পারি না বা অনুপ্রাণিত কর্ত্তে ভুলে যাই; তাই শিক্ষায় আজ সোনার কাঠির, রূপোর কাঠির পরশের এত অভাব হয়ে পড়েছে। আমরা দিই দেখি ছেলেদের কানে এই নূতন মন্ত্র! বলি দেখি তাদের বুঝিয়ে সামান্য নগণ্য অসহায় শিশু অবস্থা হতে পিতামাতা

সমাজ রাষ্ট্র তাদের অশেষ যত্নস্নেহ দিয়ে বাঁচিয়ে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, দর্শন, ও বিজ্ঞানের যে ঐশ্বর্য্যসম্ভার দিয়ে তাদের অনন্ত অমৃতের অধিকারী করে দিয়েছেন তার কতটুকু ঋণ তারা পরিশোধ কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছে! শুধু ব্যক্তিত্বের উন্মাদনায় নিজের অপক্ব চিন্তার বা খেয়ালের বশে ভারতের সুন্দর মহান আদর্শগুলি ওলটপালট করে দেওয়ার নাম প্রগতি নয় বা দেশমাতৃকার সেবা নয়। মানুষ তখনই প্রকৃত সুখী যখন নৈতিক ভাবগুলি তার মনের উপর তাদের পূর্ণ প্রভাব বিকাশ কর্ত্তে সক্ষম হয়। ভারতের নৈতিক ভাবগুলির মধ্যে বিশ্বমৈত্রী, অহিংসা, নিঃস্বার্থসেবা, দেবে রাষ্ট্রে ভক্তি, সমাজচৈতন্য, এই গুলিই চিরদিন জগতের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করে এসেছে, আজ সে সমস্ত ভুলে গিয়ে ব্যক্তিত্বের গরল গিলে প্রচণ্ডকালের মূর্ত্তি ধরে ভাঙ্গনের অট্টহাস্যে নিজকে বিভীষিকা করে তুললে দেশের কাছে যে আমাদের অবিশ্বাসী হতে হয়, ভারতের চিরন্তন শিক্ষার আদর্শকে অস্বীকার কর্ত্তে হয়।

আমরা নিজেরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে আমরা মাতৃগর্ভ থেকে পড়বার আগ হতেই আমাদের পরিবেশ ও সমাজের কাছে নানা ঋণে জড়িত এবং সে সকল ঋণ পরিশোধ কর্ব্বার চেষ্টাই মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ, তা হলে আমার মনে হয় আমাদের এই দুর্ভাগা দেশ আবার শান্তি সুখের হাসিতে ও নৈতিক গরিমার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বড় কথা হচ্ছে এই, শিশুকে এই শিক্ষা দেবার আগে আমাদের নিজেদের এই বিশ্বাস অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করা চাই, আর একটা মস্ত জিনিষ চাই, সেটা হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়—নিজের উপরে নিজের বিশ্বাস।

একথা সত্যি, সকল শিক্ষকই সমান হন না। সকলেই রাগবির ডাঃ আর্নল্ডের (Dr. Arnold) মত বা কেম্ব্রিজের লর্ড অ্যাক্টনের মত উঁচুদরের শিক্ষক হতে পারেন না। শিক্ষকের সুশিক্ষকতা নির্ভর করে অনেকগুলো জিনিষের উপর—তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, পরিশ্রমশীলতা,

সহিষ্ণুতা, বাগ্মিতা, শিক্ষাপ্রণালী, কার্য্যকৌশল, স্বাস্থ্য, শিক্ষাদানে তাঁর আন্তরিকতা। সকলের সমান জ্ঞানবুদ্ধি, কার্য্যকৌশল বা পরিশ্রম কর্ব্বার ক্ষমতা থাকে না। সেজন্যে শিক্ষকে শিক্ষকে কিছু প্রভেদ থাকবেই কিন্তু শিক্ষাদানে আন্তরিকতা ও যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়েছেন তাতে একটা অটল বিশ্বাস প্রত্যেক শিক্ষকেরই সমান অধিকার—শুধু অধিকার নয়, না থাকলে এর চাইতে লজ্জা, ক্ষোভ ও পাপের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।

যতই অপ্রিয় হোক, একথা সত্যি যে আজ দেশে যে প্রকৃত শিক্ষার এত অধোগতি হয়েছে সেজন্য আমরা শিক্ষকেরাই অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষাদানে আজ আমাদের বেশীর ভাগ লোকের ভেতর আন্তরিকতা আছে বললে সত্যের অপলাপ করা হবে, বস্তুতঃ শিক্ষাদানে আমাদের মন নাই। শিক্ষাদানের কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা সে বিষয়েও আমরা কোন চিন্তা করি না। কাজেই কোন উঁচু আদর্শের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হবার কথাও উঠে না। অনেকে হয়ত বলবেন দোষ আমাদের নয়, দোষ হোল আমাদের সামান্য বেতনের, আমাদের প্রতি সমাজের শ্লেষের হাসির বা অবজ্ঞাকটাক্ষ ঘাতের। কিন্তু আমাদের কি একবারও মনে হয় না কেন আমাদের বেতন কম, কেনই বা সমাজ আমাদের প্রকৃত স্থান সসম্মানে ছেড়ে দেয় না—আজ যদি শিক্ষায় আমাদের আন্তরিকতা থাকত তাহলে শিশুজীবনকে নিজ স্নেহ ভালবাসা দিয়ে সরস করে তুলতুম, পরিশ্রম করে তার সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর করতুম, নিজের জীবনকে এক মহান আদর্শে গড়ে তুলে শিশুকেও সেই পথে হাত ধরে এগিয়ে দিয়ে আসতুম, বেতনের দিকে লক্ষ্য করতুম না, পাঁচজনে কি বলছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতুম না—আপন মনে ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটীর মত নিজের কাজে নিজে ডুবে থাকতুম। তা হলেই দেখতেন সমাজ আসত তার অর্থ নিয়ে আমাদের পূজো করতে—সমাজ সসম্মানে ছেড়ে দিত আমাদের সেই স্থান যে স্থান

চিরদিনই দেওয়া হয়েছে শিক্ষককে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে। সমাজ আমাদের বেতন কৃতজ্ঞ অন্তরে বাড়িয়ে দিত, বলত এঁরা মানুষ বটে, এঁরা জানেন কি করে জীবনকে একটা মহাব্রতে উৎসর্গ করতে হয়—এঁদের অভাব, এঁদের দৈন্য আমাদেরই লজ্জা। কিন্তু সমাজ কি আজ সে কথা বলে? কেনই বা বলবে? সমাজ জানে আমরা পাঁচটা টিউশনি করে দুপুরে স্কুলে আসি শুধু একটু বিশ্রাম উপভোগ করবার আশায়—ফলে অভিভাবকদের প্রাইভেট্ টিউটার রাখতে হয়, ছেলে স্কুলে এসে বিশেষ কিছু শিখতে পায় না। অভিভাবক এও দেখেন মাষ্টার মহাশয় ও ছেলের ভেতর স্কুলের ৪।৫ ঘণ্টার পরে আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, তাঁর ভাল ছেলে দেখাশোনার অভাবে কুসংসর্গে পড়ে খারাপ হয়ে যায়—এসব দেখেশুনেও কি আমরা আশা কর্ত্তে পারি সমাজ আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দেবে বা আমাদের ন্যায্য দাবীতে তার সম্মতি দেবে? নিশ্চয় আমরা প্রয়াস পাব শিক্ষকসঙ্ঘ ও সমিতির নানারূপ প্রচেষ্টায় আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতম কর্ত্তে; কিন্তু সবচেয়ে বড় কথাটা ভুললে চলবে না যে শিক্ষায় আন্তরিকতাই উঠছে সকল প্রশ্ন, সকল সমাধান ছাপিয়ে; একবার সমস্ত প্রাণ দিয়ে যদি এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি তা হলেই দেখব এ মহৎ কাজে কত আনন্দ, কত গর্ব্ব, কত সম্মান—সমাজ আপনি এসে বরমাল্য আমাদের গলায় পরিয়ে দেবে। আমি এ কথা বলছি না শিক্ষকদের ভেতর দু চার জন এমন নেই যাঁরা গুরুকুলের ভাস্বর দীপশিখা আজও নির্ব্বাপিত হতে দেন নি এবং সমাজ যাঁদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে সানন্দচিত্তে এগিয়ে আসে কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত কম যে জাতির অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হচ্ছে প্রতি পদে পদে।

কথার কথায় যদি ধরেই নেওয়া যায় যে এ দেশে শিক্ষকের বেতন অন্যান্য চাকুরীর তুলনায় চিরদিনই কিছু কম হবে কিন্তু তবুও এ কথা আমাদের বলবার অধিকার নেই যে যেহেতু আমাদের মাইনে কম, আমরা ভাল করে পড়াব না, ছেলেদের তত্ত্বাবধান করব না,

বিকেল বেলা তাদের দেখাশুনা করব না, তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের খোঁজ খবর করব না, বা প্রয়োজন মত তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে তাদের মঙ্গলের জন্য পরামর্শ করব না। ভেবে দেখা দরকার, আমরা ত কারখানার সামান্য কুলী মজুর নই যে চারটে বাজতে বাজতেই বলব, চল্লুম আমরা, আমাদের দিনের কাজ হয়ে গেছে। আমাদের যে প্রাণহীন কল নিয়ে কারবার নয়, আমাদের যে শিশুর কোমল মন; খেলাধুলো লেখাপড়া ও উপদেশের ভিতর দিয়ে গড়ে তোলবার কথা একটা মহান আদর্শে,—আমরা কি বলতে পারি, চারটে বেজেছে, আমাদের ছুটী। আমাদের সত্যিকারের বিজয়গৌরব সেইদিন যেদিন তারা মানুষ হবে, যারা এসেছিল আমাদের কাছে বাপমায়ের বুকভরা আশা নিয়ে তারা দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে বরেণ্য হবে। যদি কোন জীবন নিস্ফল হয় সেজন্য শিক্ষক ও পিতা-মাতা দায়ী—এমন কি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এরূপ একটী আইন পাশ করবার কথা চলছিল যে যদি বালক খুন করে, তবে বিচার হবে তার নয়, তার শিক্ষকের। তাহলে বুঝতে পারছেন, আমাদের দায়িত্ব কত বড়, কত বড় আত্মোৎসর্গ দরকার এই ব্রতে সফলকাম হতে। জগতের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষকের বেতন অন্যান্য চাকুরি অপেক্ষা কম, কিন্তু সেজন্য কি আজ সে সব দেশে শিক্ষাদানে বা শিশুর প্রতি উৎসাহ দানে কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয়? পূর্ব্বেই বলেছি ঔদাসীন্যের কথা দূরে থাক, আজ জগতের শিক্ষকেরা উপলব্ধি করেছেন শিশুর নিকট কত অপরাধে অপরাধী তাঁরা, তাই তাঁরা যেন এই পূর্ব্বকৃত অপরাধ খণ্ডন করবার জন্যই অসীম উদ্যম ও উৎসাহে শিশুজীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার জন্য মহতী প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। আজ কি শুধু ভারতই পিছনে পড়ে থাক্‌বে?

কিরূপে আমাদের শিক্ষাদানকার্য্য সফল হতে পারে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে, এখন আরও দু চারটী কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। একথা না বললেও চলে শিক্ষক যে বিষয়গুলি পড়াবেন সে বিষয়গুলিতে তাঁর বিশেষ দখল থাকা চাই।

দখল রাখতে গেলেই বিশেষ চর্চ্চার প্রয়োজন। অনুরাগ ও চর্চ্চা থাকলেই তিনি সে সকল বিষয়ে পুস্তক নিয়ে সর্ব্বদা নাড়াচাড়া কর্ব্বেন ও পড়াবার সময় তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার হতে উদাহরণ দিয়ে ও নানারূপ গল্প ইত্যাদি বলে বিষয়টী চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ করে তুলবেন। একথাও আমরা সবাই জানি যে প্রত্যেক শিশুই কতগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, আমাদের উচিত হচ্ছে সেই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং তাদের সাহায্যে শিশুর শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :—সকল ছেলেরই যেমন ছবি, রং, হাতের কাজ, ও ঔৎসুক্য, দৌড়ধাপের প্রতি বিশেষ ঝোঁক আছে, আবার তেমনি অনুকরণ-প্রিয়তা, প্রতিযোগিতা, শ্রদ্ধা, প্রশংসা লিপ্সা, যৌনপ্রবৃত্তি, গোষ্ঠী বা সংসদ-অনুরক্তি ও আদর্শবাদও তাদের ভেতর পূর্ণভাবে বিদ্যমান। শিক্ষায় সুফল লাভ করতে গেলে এ সব বৃত্তিগুলো মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ করে শিক্ষাকার্য্যে প্রয়োগ করতে হবে আমাদের।

প্রাইমারী স্কুলের অনেক শিক্ষকও আজ এখানে উপস্থিত। দুঃখের বিষয় প্রাইমারী স্কুলে অনেক জায়গায় আজও এক শিক্ষককেই দু তিনটী ক্লাশ একসঙ্গে দেখতে বা পড়াতে হয়। এই অবস্থায় যখন তিনি এক ক্লাশে পড়াচ্ছেন তখন অন্য ক্লাশগুলি নানারূপ যন্ত্র ও খেলনার সাহায্যে কি ভাবে ব্যাপৃত রাখতে পারেন, সে সকল কার্য্যপ্রণালী তাঁকে শিখতে হবে। ট্রেনিং স্কুল ও কলেজে শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী নানারূপ কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়, সামান্য জিনিষের সাহায্যে শিক্ষকগণকে নানারূপ যন্ত্র ও খেলনা নির্ম্মাণ করতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। সেইজন্য শিক্ষকদের নিকট অনুরোধ, সুযোগ ও সুবিধা পেলেই অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের শিক্ষকদের মত তাঁরা যেন ট্রেনিংএ যান, অনেক নতুন জিনিষ শিখতে পার্ব্বেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এইবার ডিসিপ্লিনের কথা একটু বলা যাক। ছেলেরা আমাদের অবাধ্য হয় কেন—কেন তারা বেয়াড়া হয়ে দাঁড়ায়? এটা একটা

মস্ত বড় সমস্যা। আমি এ একান্ত বিশ্বাস করি শিক্ষাদান কার্য্য যদি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, শিশু যদি তার সমস্ত প্রাণ দিয়ে এইটুকু উপলব্ধি করতে পারে, আমাদের শিক্ষকেরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের স্নেহ করেন ও আমাদের মঙ্গলের জন্য সতত সচেষ্ট, তা হলে কড়া শাসনের কোন প্রয়োজনই হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তবের ছবি একেবারেই বিভিন্ন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে মাষ্টার মহাশয়েরা অনেক স্থলেই স্কুলে আসেন তাঁদের দৈনন্দিন পরিশ্রমসাধ্য অন্য কার্য্যের নিষ্পেষণের পর একটু আরাম উপভোগ করতে। ছেলেরা বেশী প্রশ্ন করলে বা দেখিয়ে দিতে বললে তাঁরা বিরক্ত হন, এমন কি তাঁরা ক্লাশের সকল ছেলের নাম পর্য্যন্ত জানেন না, স্কুলের ছুটীর পর তাদের খেলাধুলো দেখা, তাদের স্কাউট্ ট্রূপে, কাব্‌প্যাকে বা ব্রতচারী কৃত্যালীতে সহায়তা করা, যে সব ক্লাব বা গোষ্ঠীতে তারা মেশে তার তত্ত্বাবধান করা, তাদের আশা-আকাজ্ক্ষা সুখ-দুঃখের সমভাগী হওয়া বা অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করাতো দূরের কথা। এ অবস্থায় ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের বাধ্য হবে কেন? তারা হয় ত ভাবে এই বেতনভোগী স্বার্থান্বেষী পলায়নোন্মুখ দলের সহিত যত কম সম্পর্ক রাখা যায় ততই ভাল। আমি একথা স্বীকার করি দেশের পরিস্থিতিতে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়ে ছেলেরা অনেক সময় হয় ত আমাদের অবাধ্য হয় কিন্তু এ ব্যাধির মূলগত কারণ তাই নয়। ছেলেরা আজ যে আমাদের অবাধ্য, তাদের মন যে আমাদের প্রতি বিরূপই শুধু নয়, পরন্তু রোগবীজাণুর আকর, সেজন্য দায়ী মুখ্যতঃ আমরা ও অভিভাবকেরাই।

আমরা শিক্ষক, আমাদের স্থান সত্যি জগতের শীর্ষে—নিঃস্বার্থ-ভাবে এক একটী অসহায় অসুন্দর জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার যে আনন্দ, গৌরব, সম্মান ও আত্মতৃপ্তি তা আমাদেরই! সে সুখ থেকে বঞ্চিত করছি আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে, অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—সে চেষ্টা করাও বৃথা, জগৎ তাতে ভুলবে না,

নিজের ভেতরটা একবার বিশ্লেষণ করে দেখলেই আমাদের একথা বুঝতে কঠিন হবে না। কিন্তু এ অপ্রিয় সত্য বলতে সাহস পেলাম আজ এই জন্যে যে আমি জানি শিক্ষকদের এ মহত্ত্বটুকু আছে যে তাঁরা আমার কথাগুলো অন্ততঃ একবার চিন্তা করে দেখবেন আর তার ভেতর যদি কিছু মাত্রও সত্যি থাকে তাহলে কোমর বেঁধে লেগে যাবেন শিশুকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, জয়ের পথে নিয়ে যেতে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি তাঁদের এই জয়যাত্রা শুভ হোক, সফল হোক, বাণীর বরপুত্র তাঁরা, তাঁদের স্থান হউক দেবীর বেদীর পাশে, সমাজের আবর্জ্জনার আঁস্তাকুড়ের মধ্যে নয়। আমাদের কানে বাজুক শাস্ত্রের—গীতার সেই অমর বাণী—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—কাজ কর্ব্বার অধিকার আমাদের, ফল চাইবার নয়—ফল ভগবানের হাতে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমরা আমাদের কাজে অগ্রসর হতে পারি, তা হলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের সকল চেষ্টা সাফল্যের গরিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠবেই উঠবে।

শিক্ষায় সমস্যা

মানুষ অপরিচিত পথে চলতে চলতে চৌরাস্তার মোড়ে এসে যেমন থমকে দাঁড়ায়, পথ নির্দ্দেশের অভাবে গন্তব্য স্থলে পৌঁছুতে হয় অসম্ভব দেরী, আমাদের জাতীয় জীবনেও সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনি একটী পরিস্থিতির। আজ পথ নির্দ্দেশের অত্যন্ত অভাব, জোর করে চাওয়ার কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা নেই, কাম্য কি তারও স্পষ্ট রূপের কোন অনুভূতি নেই, আছে শুধু বাগবিতণ্ডা, কোন পথে যাব তা নিয়ে আন্দোলন আলোচনা, চলতে হবে বলে চলার ক্ষীণ প্রয়াস, লক্ষ্যহীন, পথহারা ; এতে এসেছে অবসাদ, শ্রান্তি ; আসে নি হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার আত্মপ্রসাদ, বা মোক্ষ মেলার আনন্দ।

গোড়ায় গলদ হল আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায়। যে দেশে ছোট বড় মিলিয়ে শতকরা পঁচাশী জন নিরক্ষর, সে দেশে স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, সমাজসংস্কার, এসব কথা কতগুলো নিরর্থক বুলির মতই শোনায়। এই বাংলা দেশে বছরে পাঁচ সাত কোটি টাকার প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা ছেলেমেয়েদের কোন মতে দিতে গেলে, আর ভাল করে দিতে হলে লাগে বাইশ কোটি (সার্জেণ্ট রিপোর্ট অনুসারে) শুধু প্রথম পাঁচ বছরের শিক্ষার জন্য। কিন্তু ব্যয় কর্চ্ছি আমরা কত সরকারের তরফ থেকে ?—মাত্র আটাত্তর লক্ষ। অবিশ্যি টাকা ব্যয় করার কথাও তত মারাত্মক বা জরুরী নয় যত এ ভীষণ সত্য—কী শিক্ষা আমরা দিচ্ছি প্রাথমিক শিক্ষার নামে ? এ কি শিক্ষা, না শিক্ষার পরিহাস ? ফল হচ্ছে সমস্ত টাকাটা যাচ্ছে জলে, চার বছর শিক্ষার পরেও শতকরা আটটী ছেলেমেয়েও যেতে পার্চ্ছেনা প্রাথমিক স্কুল থেকে হাই স্কুলে ; সরকারী রিপোর্ট যাঁরা লেখেন তাঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন এই বলে প্রাথমিক শিক্ষায় যে এর চাইতে বেশী টাকা ব্যয় হচ্ছে না সেটাই পরম ভাগ্যি। অথচ জাপানের নিরক্ষরতা

দূর হল ৫০ বছরে, রাশিয়ার লাগল ২০ বছর, আর তুরস্কের মাত্র ১৫ বছর, কিন্তু সে নিরক্ষরতা দূরীকরণে নিয়োজিত হল রাষ্ট্রের সমস্ত অর্থশক্তি, চিন্তাশক্তি ও অক্লান্ত একাগ্রতা। সেখানে কেউ প্রশ্ন করেনি টাকা কোত্থেকে আসবে, চাকুরের মোটা মাইনেতে হাত দেওয়া যায় কিনা বা নতুন কর ধার্য্য করার ফলই বা কি হতে পারে। তাদের অন্তরকে ব্যাকুল করে তুলেছিল এই তীব্র অনুভূতি যে আলো বাতাস ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না, তেমনি জাতীয় জীবনেরও সাড়া কোন দিনই পাওয়া যাবেনা প্রাথমিক শিক্ষার অভাব হলে। একটা ভাবের উন্মাদনায় অসাধ্য সাধনে লেগে গেল সমস্ত জাতির উদগ্রশক্তি, অসম্ভব সম্ভব হল, কল্পনার ঐশ্বর্য্যকে ছাপিয়ে বাস্তব ফুটে উঠল একান্ত প্রীতিকর মনমাতানো সত্যে। বাংলা দেশে আজ কত বাগবিতণ্ডা হচ্ছে, বড়লোকের জমানো টাকার উপর টেক্স হবে কি না, হলে বা সে অর্থ দিয়ে কি হবে, ব্যয় সঙ্কোচ কতটা সম্ভব, আয়করের খানিকটা পেলে হয় সুবিধে, শিক্ষাকর সর্ব্বত্র চালু করা দরকার, আরো কত কী— কিন্তু এক দিনের জন্যও কি এই এত বড় জাতিটা আকুল হয়ে ওঠে না তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, একদিনের জন্যও কি তার মনে হয়না অন্য যুক্তি চিন্তার কোন অর্থই থাকে না যদি আমরা অস্বীকৃত হই জাতীয় মুক্তির মূল্য দিতে? জাতীয় কল্যাণের ভিত্তি আত্মত্যাগের উপর, আত্মসন্তোগের উপর নয়, যতদিন না ব্যাপক-ভাবে দেশনেতাদের মধ্যে বা জনসাধারণের মধ্যে সে অনুভূতি আসে, ততদিন শিক্ষাকরেও সুফল ফলবে না, স্কুলবোর্ডেও নয়। ওসব হল বাইরের জিনিষ, অন্তরকে স্পর্শ করে না; প্রাথমিক শিক্ষার শম্বুক গতিকেও বদলাতে পার্চ্ছে না। পাওয়ার মত কিছু পেতে হলে চাই জোর করে চাওয়া; আমাদের দাবীর পেছনে সত্যি আছে কি জাতির মিলিত শক্তি, উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষা, রুদ্ধ বেদনার জ্বালাময় অগ্নি? তা যদি থাকতো আজ টাকার ভাবনা ভাবতে হত না, আস্মান থেকে হোক, মাটি ফুঁড়ে হোক, টাকার গাছ গজিয়ে

উঠত, আর সবচেয়ে আগে ব্যবস্থা হত জাতির জন্মগত অধিকার প্রাথমিক শিক্ষার—মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনাই হোক বা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির পরিকল্পনাই হোক বা উভয় পরিকল্পনার সামঞ্জস্যই হোক সমস্ত তর্কবিতর্কের ক্রম বর্দ্ধমান গণ্ডী ছাড়িয়ে।

মাধ্যমিক বা দ্বিতীয়া শিক্ষা হল এদেশের ভদ্রসমাজের বাহন, তাতে যে চড়েছে তাকে নিয়ে ঠিক হাজির করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজদুয়ারে, তা তার বিদ্যাবুদ্ধি বা অর্থের পুঁজিপাটি থাক আর নাই থাক। জিনিষটা যেন গোগ্রাসে গেলা, রেলের টিকিট করে এক ষ্টেশন থেকে বরাবর অন্য ষ্টেশনে এসে নামা, খিদে আছে কি না, অন্য জায়গায় যাবার প্রয়োজন আছে কি না সে সব প্রশ্নই ওঠে না! ফল হয়েছে বিষময়—শিক্ষা হয়েছে অশিক্ষা বা কুশিক্ষার নামান্তর, হয় নি তাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, মাংসপেশীর গঠন, ঔদার্য্যের শান্ত আত্মপ্রসাদ, চরিত্রের বল, জীবিকানির্ব্বাহের ক্ষমতা। এই ভাঙ্গা তরী নিয়েই ছাত্রছাত্রীরা ঝাঁপ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুস্তর শিক্ষাসমুদ্রে ঠুন্‌কো ডিগ্রির মোহে—কত নৌকাডুবি হয়েছে, কত নবীন প্রাণ সমুদ্রের অতল তলায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে; যারা শেষ পর্য্যন্ত পারে এসে ভিড়েছে, তাদেরও দেখা গেল নিজের চেষ্টায় ডাঙ্গায় উঠে হাতে খেটে খাবার সামর্থ্য যা শিক্ষা নেই, সাহিত্যিক শিক্ষায় ব্যবস্থা হয়েছে শুধু অনশনে প্রাণ হারাবার। "Swiss Family Robinson" বা "Robinson Crusoe" বই হিসেবেই তারিফ কর্ত্তে শিখেছে তারা, পারে নি তার বাণী নিয়ে জীবনকে অনুপ্রাণিত করতে। ফলে দেশের বেকারসমস্যা আরো জটিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু সাহিত্যশিক্ষার পথে চললে জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; নতুন পথে চলা দরকার এ ধারণা শিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল না হলেও তার মনে যে ছোটখাটো একটা ধাক্কা এসে না লেগেছে তা নয় কিন্তু এমনি অভ্যাসের দোষ যে সাহিত্যিক শিক্ষার মোহ আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পার্চ্ছি না, কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। কিন্তু আজ নতুন করে পথনির্দ্দেশের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়া শিক্ষার অবসানে ও তারি সঙ্গে সঙ্গে আজ বৃত্তিগত, যান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা উঠেছে, এতে যে সত্যিকারের অনেক উপকার হবে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতদ্বৈধ থাকা উচিত নয়। তবে এর মধ্যে রয়েছে মস্ত বড় একটা কিন্তু। দেশে শুধু বৃত্তিকৈন্দ্রিক, যান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে চললেই হবেনা, সঙ্গে সঙ্গে চাই দেশের শিল্পোন্নতি, যান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম; সোনার তাল পাকিয়ে ব্যাঙ্কের সিন্দুকে তুলে না রেখে তা দিয়ে সোনার দেশ তৈরী কর্ব্বার সাহস ও কর্ম্মকুশলতা। সব দিক ভেবেচিন্তে দেশব্যাপী একটা সুবন্দোবস্ত না করলে বৃত্তিগত, যান্ত্রিক বা সাহিত্যিক শিক্ষার মধ্যে শেষকালে খুব বেশী তফাৎ হয় ত থাকবে না; তাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ঘাড়ে তুলে দেওয়া, গণতন্ত্রের মুখপত্র যে রাষ্ট্র তার কাছে এ অধিনায়কত্ব আশা করা মোটেই অসঙ্গত হতে পারে না।

প্রকৃত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বুনিয়াদের ওপরেই যে উচ্চশিক্ষার অটুট ইমারৎ গড়া যায়, এ অতি সাধারণ সত্যটা ভুলে গেলে নিজেদের পদে পদে ঠেকতে হবে, যেমন ঠেকে এসেছি এতদিন। বার্ণাড শ'য়ের সেণ্ট জোনের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাই বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে "হা ভগবান, কতদিন, আর কতদিন, অপেক্ষা করে থাকব!"

সহশিক্ষা

প্রায় সত্তর আশি বছর আগেকার কথা—ইংলণ্ডের সেকেণ্ডারী এক দ্বৈত-বিদ্যালয়ে (অর্থাৎ যে স্কুলে ছেলে ও মেয়ে দুইই নেওয়া হয়, কিন্তু পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যেখানে পুরুষ ও স্ত্রী শিক্ষককে যথাসম্ভব পৃথক রাখা হয়) এক অপরাহ্ণ বেলায় এক পুরুষ শিক্ষক ঢুকলেন মেয়ে শিক্ষকের ক্লাশে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। চিরাচরিত প্রথার এই ব্যাঘাতে মেয়ে শিক্ষকটি শুধু স্তম্ভিতই হলেন না, মূর্চ্ছিতও হয়ে পড়লেন ; সংজ্ঞা যখন ফিরে এল, প্রথম কাজটি যা তিনি করলেন তা আরো চমৎকার! তিনি পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে হেড্‌মাষ্টারমশায়কে ডেকে আনলেন। হেড্‌মাষ্টারমশায়ও যথারীতি গম্ভীর চালে কর্ত্তব্যচ্যুত সহকারী শিক্ষককে তাঁর পদস্খলনের জন্য ভ্রূকুটিকুটিল নয়নে শাসন জানিয়ে তাঁকে বগলদাবা করে বেরিয়ে গেলেন। প্রহসনের মহড়া হল ভাল, কিন্তু এ থেকে ঠিক বোঝা গেল না, চারিত্রিক উৎকর্ষ হল কার ?—পদস্খলিত শিক্ষকের না বিস্ময়নির্ব্বাক ছাত্রীবৃন্দের !

যা হোক, শিক্ষার এ অবস্থাটা কেটে গেল যখন শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিতে বহু পরিবর্ত্তন ঘটল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। দ্বৈত সেকেণ্ডারী স্কুলগুলো প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যয় সঙ্কোচের জন্য আর খানিকটা প্রাইমারী সহশিক্ষ বিদ্যালয়গুলোর দেখাদেখিও বটে। কিন্তু দিন যতই যেতে লাগল ততই ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে ব্যবধানের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ল—শুধু তাই নয়, আরো দেখা গেল যে, চারিত্রিক অবনতি বা অধোগতি না ঘটে বরং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সম্বন্ধটা অনেকটা সহজ হয়ে এল। এতেই হল সহশিক্ষার পথ প্রশস্ত ; এরপর এলেন Badley, Reddie, Pice, Cecil Grant এর মত উদারচেতা শিক্ষাব্রতীরা—যাঁদের

অক্লান্ত চেষ্টায় দেশের নানাস্থানে সহশিক্ষ সেকেণ্ডারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এর মূলে ছিল তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সহশিক্ষা যে ধরণের নৈতিক ও সামাজিক ফল প্রসব করতে সক্ষম তা শুধু ছেলেদের বা শুধু মেয়েদের স্কুল কখনই পারে না। এসব স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে আর একটা কারণও যা ছিল তা উল্লেখযোগ্য। সমাজে মেয়েদের স্থান সম্বন্ধে আস্তে আস্তে জনমতের পরিবর্ত্তন ঘটছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের যে একটা বিশেষ আব্রু বা আওতায় রাখতে হবে সে ভাবটাও কেটে যাচ্ছিল। এসব নানা-কারণে দ্বৈত শিক্ষার দিন গেল, সহশিক্ষার যুগ এল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই সহশিক্ষা বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছে রক্ষণশীল ইংলণ্ডেও। তাই আজ আমরা দেখতে পাই, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে চারশ'র উপরে সহশিক্ষ সেকেণ্ডারী স্কুল বেশ ভাল ভাবে চলছে এবং সমগ্র সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়গুলোর এক তৃতীয়াংশের ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু মেয়েদের ও শুধু ছেলেদের স্কুলের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫০ ও ৪৬৩। শিক্ষাবিদ্‌রা এও গণনা করে দেখেছেন যে, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের প্রতি সাতটি ছেলের ভেতরে অন্ততঃ দুটি ছেলে সহশিক্ষ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখছে। এই সহ-শিক্ষ বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হবে এক লক্ষের ওপরে অর্থাৎ ইংলণ্ডের যেসব ছেলে মেয়ে "উপযুক্ত" সেকেণ্ডারী বা দ্বিতীয়া শিক্ষা পাচ্ছে তাদের এক চতুর্থাংশ। এ থেকে আমাদের দেশের একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চয় কেটে যাবে। অনেকে মনে করেন স্কটল্যাণ্ড এবং তার দেখাদেখি আমেরিকা সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন করতে পারেন, কিন্তু সাবধানী ইংলণ্ড নিশ্চয়ই এ বিষয়ে এক পা বাড়াবেন না, বরং উল্টে এ অকল্যাণকর, সমাজবিধ্বংসী ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করবেন। পূর্ব্বেই বলেছি, ইংলণ্ডে সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন প্রথম দিকটায় হয়েছিল সুবিধা ও ব্যয়সঙ্কোচের জন্য, কিন্তু শিক্ষা-জগতে এ শেকড় গেড়ে বসল সুফলপ্রসূ বলে। এর প্রভাব এতটা বিস্তৃত হল মানুষের মনের ওপরে, যে বিলেতে যে সব শিক্ষক সহ-

শিক্ষ স্কুলে একবার কাজ করেছেন, তাঁরা শুধু ছেলেদের বা শুধু মেয়েদের স্কুলে আর ফিরে যেতে চান না, যদিও তাঁদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটে গেছে সে সব স্কুলে !

আজ দ্বিতীয়া শিক্ষার কথাই বিশেষ করে তুলেছি, ক প্রাথমিক বা ইউনিভার্সিটি শিক্ষায় ছেলেমেয়ে একত্র পড়া শিক্ষাজগতে কোন মতদ্বৈধ নেই। যতকিছু মতানৈক্য তা হচ্ছে কৈশোরে দ্বিতীয়া শিক্ষা সম্বন্ধে। বর্ত্তমানে রুশিয়া, * চীন, স্পেন, স্কটল্যাণ্ড, আমেরিকা, বেল্‌জিয়ম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং আংশিকরূপে ইংলণ্ডেও কৈশোরে সহশিক্ষা চলে। কিন্তু তা হলেও আজও এ বিষয়ে খানিকটা মতবৈষম্য আছে। বারো থেকে ষোলো বছর অবধি (কার্য্যতঃ অনেক সময় এগার থেকে আঠার পর্য্যন্ত) ছেলে মেয়েদের আলাদা আলাদা শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাবে যদি সহশিক্ষাপন্থীরা রাজী থাকতেন, তাহলে হয় ত এ বিষয়ে এতটা মতদ্বৈধ থাকত না ; কিন্তু ঠিক এই বয়ঃসন্ধিকালে সহশিক্ষার সুফল সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা এত সুস্পষ্ট ও বদ্ধমূল যে আলাদা শিক্ষাব্যবস্থার কথায় তাঁরা আদৌ কান দেন না।

কিন্তু এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে এখনও অনেকে আছেন যাঁরা বয়ঃসন্ধিক্ষণে সহশিক্ষার ভেতর জাতীয় ও ব্যক্তিগত অধোগতির একটা বিশেষ কারণ দেখতে পান।

সহশিক্ষা সম্বন্ধে এই যে মতবিরোধিতা তার দুটি কারণ। প্রথমতঃ, সহশিক্ষা বলতে কি বুঝায়, কি এর উদ্দেশ্য, কি এর কার্য্যতালিকা—সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। দ্বিতীয়তঃ, সহশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত অন্ধ সংস্কার যা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এ-সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার দিকে একবার চোখ

---

* গত মহাযুদ্ধের ভেতরে রুশ গভর্ণমেণ্ট সহশিক্ষা প্রথা নামঞ্জুর করেছিলেন (১৯৪৩) কৈশোরদের সামরিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় অসুবিধা হয় বলে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে আবার সে ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।

মেলেও তাকায় না। কিন্তু আজ সহশিক্ষা গোপনে অন্তঃপুরে আর পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নেই, সে আজ প্রকাশ্য সভায় আপনার অধিকার দাবি করে সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই দরকার পড়েছে এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত সুচিন্তিত জনমতের—সংগৃহীত তথ্যাবলীর সম্যক্ আলোচনা, শুধু যার যার নিজের মনের খেয়ালের ফানুসে চড়ে উড়ে বেড়ানো নয়।

সহশিক্ষার মানে মোটামুটি আমরা বুঝি যে, ছেলে এবং মেয়ের একসঙ্গে শিক্ষা হবে এবং স্কুলে ও স্কুলের বাইরেও খানিকটা মেলামেশার সুযোগ সুবিধা তাদের থাকবে। কিন্তু এ থেকে এ মানে কিছুতেই হতে পারে না যে ছেলে এবং মেয়েদের একই স্থানে একই সময়ে একই শিক্ষকদ্বারা একই প্রণালীতে একই জিনিস শেখান হবে। ছেলে ও মেয়েদের ভেতরে যে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনেক পার্থক্য রয়েছে এবং জীবনযাত্রায় তাদের প্রয়োজনও যে বিভিন্ন সে কথা সহশিক্ষা প্রথায় পরিষ্কার মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকায় এবং তাদের মেলামেশার ভেতর দিয়ে অনেকগুলো সুফল আশা করা যায় বলে সহশিক্ষাপন্থীরা মনে করেন যে তাদের এক সঙ্গে একই শ্রেণীতে পড়া বা খেলার মাঠে ও সামাজিক জীবনে এক সঙ্গে মেলামেশা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এসব খেলাধুলো, লেখাপড়ায় 'সেক্স'-বৈষম্যের জন্য যে পার্থক্য রয়েছে সে গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে তাঁরা চলেন না এ কথা বললে অত্যন্ত ভুল হবে। তাঁরা একথা বলেন যে একই স্কুলের আওতায় ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন প্রয়োজনের ব্যবস্থা বেশ ভাল করেই হতে পারে।

ধরে নেওয়া যাক মেয়েদের মাতৃত্বের কথা এবং গৃহে নারীর স্থানের কথা। Aldous Huxleyর *Brave New World*এ Test Tube-এ শিশু জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইংলণ্ডের ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে প্রমাণিত হয়েছিল যে এমন কাজ নেই যে মেয়েরা সে দেশে করে নি। দ্বিতীয় বিশ্বসমরে

মেয়েরা জলে স্থলে আকাশে রণচণ্ডীর মূর্ত্তি ধরে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তা হলেও, পাশ্চাত্যেই হোক আর প্রাচ্যেই হোক আজও বেশীর ভাগ মেয়েই বিবাহিত জীবনে গৃহলক্ষ্মীর পদই বেছে নেন —অন্ততঃ সোৎসুকনেত্রে এই কল্পিত সুখময় ভবিষ্যতের দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করেন! ভাল সহশিক্ষ স্কুলে মাতৃত্বের ও গৃহস্থালীর চাহিদা মেটাবার প্রচুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ সেখানে আলাদা ক্লাসে শিশুপালন, প্রসূতির পরিচর্য্যা, সেলাই, আসবাব পত্র সাজানো, রান্না, কাপড়ধোয়া ইত্যাদি কাজ শেখাবার ব্যবস্থা আছে।

যারা সহশিক্ষার এই মূল নীতিটা মেনে নেন, তাঁরাও এই নতুন ব্যবস্থায় ছেলে মেয়েদের চারিত্রিক অবনতির আশঙ্কা করে একটু পিছপাও হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁরা একথা ভুলে যান যে কৈশোরে ছেলেমেয়েদের সংযতভাবে মেলামেশা না করতে দিয়ে পরস্পর হতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ছেলেদের বা শুধু মেয়েদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ করে রাখা শতগুণ ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। একথা বাতুলও বলবে না যে বয়ঃসন্ধিক্ষণে কিশোরকিশোরীর পরস্পর মেলামেশার ভেতরে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শিক্ষায় কি আজ সূক্ষ্ম ও বিচক্ষণ দৃষ্টির এতই অভাব যে, যে বিপদের আশঙ্কা করে আজ আমরা আঁতকে উঠ্ছি তাকে উচ্ছেদ বা নির্ম্মূল করে সহস্র সহস্র প্রতিষ্ঠানে যে সুফল মিলেছে তা আমাদের ভাগ্যে বর্ত্তাবে না? এ পৃথিবীতে পাওয়ার মতো কোন জিনিসই হয় ত পাওয়া যায় না তাতে যদি বিপদ বা অনিশ্চয়তার ছায়া না পড়ে। একবার একজন এরোপ্লেনে উঠতে গিয়ে বলে বসলেন যে তিনি টিকিট কিনবেন না যতক্ষণ না তাঁকে গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে যে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটবে না। যাঁরা বিপদের ছায়া দেখে আঁতকে উঠছেন তাঁদের কথা ভাবতে গিয়ে কি এই এরোপ্লেন আরোহীর কথাই মনে হয় না?

অবিশ্যি একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য যে, সকল প্রশ্ন ছাপিয়ে

পিতামাতা ও অভিভাবকের মনে একটি প্রশ্নই সর্ব্বদা উঁকি ঝুকি মারছে—এই সহশিক্ষ স্কুল বা বিদ্যালয় আমার ছেলে বা মেয়ের পক্ষে—তার নৈতিক চরিত্রের পক্ষে—কি ঠিক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান? অভিভাবকেরা অবিশ্যি ছেলে মেয়ের সাহচর্য্যে চরম চারিত্রিক অবনতির আশঙ্কা করেন না; কিন্তু তাঁদের মনে একটা অস্বস্তি থেকে যায়, বার বার মনে এই প্রশ্নই ওঠে—ছেলে ও মেয়েকে একসঙ্গে পড়ানোতে বা তাদের অবাধ মেলামেশায় এমন কতকগুলো ভাবাবেগ বা অশান্তির স্বৃষ্টি হতে পারে যে এ পথে না এগনোই বোধ হয় শ্রেয়ঃ, অন্ততঃ এ চিত্তচাঞ্চল্য যতদিন সম্ভব স্থগিত রাখা উচিত। কিন্তু তাঁরা এটা ভুলে যান গোলযোগের যেটা শেকড় রয়ে গেছে সেটা সহশিক্ষাপন্থীরা স্বৃষ্টি করেন নি—তা স্বৃষ্টি করেছেন স্বয়ং প্রকৃতি। ছেলেমেয়েদের স্কুলজীবনের ঠিক মধ্যিখানে যৌন-বিকাশ প্রকৃতিদেবীরই হাতে-গড়া জিনিস। একদিকে একে একেবারে চেপে দেওয়া, আবার অন্যদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে এই যৌনপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি দুইই সমান ক্ষতিকর; তাই সহশিক্ষ স্কুলে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে ছেলে ও মেয়েরা স্কুলের খেলাধুলো ও নানা কার্য্যাবলীর ভেতর দিয়ে তাদের জাগরণোন্মুখ যৌনভাবকে নিজেদের অজ্ঞাতসারে চরিতার্থ করে পরস্পরের ভেতরে পূর্ণ সংহতি আনতে পারে। অভিভাবকের ভয় তাঁর ছেলে বা মেয়ে যৌনপ্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়বে। কিন্তু এই সহশিক্ষ স্কুলেই যে তাঁর ছেলে বা মেয়ে তাদের যৌনপ্রবৃত্তিকে সহজ সরল পথে প্রকাশ করে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পারে সে কথা তিনি প্রায়ই ভুলে যান।

একথাও তাঁর মনে রাখা উচিত যে বেশীর ভাগ সহশিক্ষ স্কুলই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ছেলেদের বোর্ডিং স্কুলে চারিত্রিক অবনতির স্রোত রোধ করবার জন্যে। আজকে শিক্ষাবিদ্‌রা একথা মেনে নিয়েছেন যে সহশিক্ষ স্কুল (বোর্ডিং বা 'ডে' স্কুল) সাধারণ ছেলেমেয়ের পক্ষে শুধু ছেলেদের বা শুধু মেয়েদের স্কুলের চাইতে যৌন বিবর্ত্তনের দিক

থেকে অনেক নিরাপদ স্থান। কয়েক বছর আগে সমস্ত বিলেতে একটা ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল Aleck Waughএর Public School সম্বন্ধে *The Loom of Youth* নভেলখানি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে। Aleck Waugh নিজে একজন Public School এর ছাত্র। Public Schoolএ যে নোংরামি ও অনৈসর্গিক কুপ্রথাগুলো প্রচলিত আছে তার একটা জীবন্ত পূর্ণাবয়ব বর্ণনা তিনি এই নভেলে দিয়েছেন। যে সব বিষয়গুলো এই নভেলে অবতারণা করা হয়েছিল তা অনেকদিন ধরেই শিক্ষকদের জানা ছিল, তবে চোখের সামনে এমনি করে আয়না আর কেউ ধরে নি। ছেলেদের Day School গুলোর অবস্থাও এ বিষয়ে Boarding School গুলোর অবস্থার চাইতে ভাল ছিল না। Prof. Findlay, Public School এর নৈতিক অধোগতি অতিরঞ্জিত করা হয়েছে বলতে গিয়ে কেবল এইটুকুই বলতে পেরেছেন যে অন্ততঃ অর্দ্ধেকের কিছু কম ছেলে অক্ষত দেহমন নিয়ে Public School থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। যা হোক, জনসাধারণের এতে চোখ খুলে গেল। মেয়েদের স্কুলগুলিও এই কুপ্রথা থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। একটু বয়স্ক মেয়েরা সর্ব্বদাই একে অন্যের বা শিক্ষয়িত্রীর প্রেমে পড়ছে, বাইরের জগতের তাদেরই মত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ পুরুষদের কাছে ছোট ছোট প্রেমপত্র পাঠাচ্ছে—বা সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবি ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে বা তাদের ঢেউখেলানো চুল নিয়ে পাগল হয়ে উঠছে। এ সবের মূলে হচ্ছে সেই একই কারণ—স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ। সুবিখ্যাত লেখিকা Rozamond Lehmanএর *Dusty Answer* নামক নভেলখানায় মেয়ে স্কুলের রাত্রে শোবার ঘর বা ডরমিটারির যে দৃশ্যাবলী আঁকা হয়েছে তাতে মনে যুগপৎ একটা আতঙ্ক ও দুঃখের সৃষ্টি না হয়ে পারে না। Olive Mooreএর *Celestial Seraglio* নভেলখানি এ বিষয়ে একটী ডাক্তারী অনুশীলন বা ক্লিনিক্যাল স্টাডি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এক অভেদ্য অস্বাভাবিক দেয়াল তুলে রাখলে যে তাদের মনের ওপর অসম্ভব জুলুম করা হয় তা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্র (Psycho-analysis) ছাড়াও আমরা সহজে বুঝিতে পারি। এই জুলুমের ফলে সৃষ্টি হয় নানারকম অনৈতিকতা, পাপাচরণ, স্বকাম (Narcissism), কুৎসিত চিন্তা, নোংরা কথা, অঙ্গভঙ্গী, হস্তমৈথুন, বা এর চাইতেও অনেক গুরুতর কিছু। কিশোরের স্বাভাবিক যৌন ভাবাবেগ সহজ স্ফুরণের সুযোগ পায় না, তাই তাকে নানা অনৈসর্গিক অলিগলির ভেতরে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাতে হয়ে ওঠে সে পুতি-গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর। সহশিক্ষ স্কুল তার নিয়ন্ত্রিত কার্য্যপদ্ধতির ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের সহজ ভাবে চালিয়ে নিয়ে যে তাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে এ বিষয়ে শিক্ষাজগতের যাঁরা সত্যিকারের খবর রাখেন তাঁদের মনে অন্ততঃ কোন দ্বিধা নেই। এ ব্যবস্থায় তাদের যৌনপ্রবৃত্তি বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত উদ্দাম অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে নি, সহজ নৈসর্গিক বিকাশের ভেতর দিয়ে সে পূর্ণ পরিণতির পথে চলতে শিখেছে। সহশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি-ভঙ্গী বদলাতে হবে, একথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য, কারণ তাঁদের মতের আমূল পরিবর্ত্তন না হলে এদেশে সহশিক্ষ স্কুলের চাহিদা বাড়বে না, চিরদিন যে বিষচোখে তাকে দেখা হয়েছে তারি তিক্ততা ও সন্দেহ থেকে যাবে।

একথা প্রশ্ন করা যেতে পারে কিশোরকিশোরীর মেলামেশা থেকে বিপদের আশঙ্কা না করে এই অপ্রত্যাশিত সুফল কি করে পাওয়া যেতে পারে? এর উত্তর যে খুব কঠিন নয় এ মনোবিদ্ ছাড়াও শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে বুঝতে পার্ব্বেন। দূর থেকে যা দেখা যায় তাই সুন্দর, সম্মোহন বলে বোধ হয়, কিশোরকিশোরী বা যুবকযুবতী সম্বন্ধেও একথা খাটে—তাদের মধ্যে ব্যবধান রাখা হয় বলেই দূর থেকে তারা একে অন্যের সম্বন্ধে একটা অসম্ভব উচ্চ ধারণা (অন্ততঃ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে) পোষণ করে এবং একটা অনিরোধ্য টানে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সহশিক্ষ স্কুলের সান্নিধ্যের

ভেতর এরকম অমূলক ভিত্তিহীন ভাবের উদ্রেক হওয়া কঠিন—খেলাধুলো, হুড়োহুড়ি ও পাঁচটা কাজের ভেতর তাদের সত্যিকারের রূপ ধরা পড়ে, দোষগুণ সবই চোখের সামনে ভাসে—অন্ধ প্রেমের সৃষ্টি না হয়ে তারা আবদ্ধ হয় মিতালি বন্ধনে। এ মিতালি বা দোস্তালির মূলে থাকে সব জেনে শুনে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম তাই। এই বন্ধুতা হয় স্থায়ী—একে অন্যকে বুঝতে শেখে, জানতে শেখে, প্রেমে না পড়েও যে বন্ধু হওয়া যায় এটা বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, (যেটা আজও বেশীর ভাগ লোক মেনে নেন না বা নিতে চান না) ; আর তারা আরো বুঝতে শেখে দৈনন্দিন জীবনের আদানপ্রদানের ভেতরেই সামাজিক ও কর্ম্মজীবনের পূর্ণবিকাশ। এতে গৃহের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়, তাতে সুফল ফলবে এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বস্তুতঃ বিশেষ লক্ষ্য করে দেখা গেছে সহশিক্ষ স্কুলে 'সেক্স' (Sex) জিনিষটা সবাই ভুলে যায়—সেটা পড়ে থাকে পেছনে, সামনে যেটা এগিয়ে আসে সেটা হচ্ছে কৈশোর বা যৌবনসুলভ কর্ম্মোদ্দীপনা, ক্রীড়োৎসাহ ও অফুরন্ত সহযোগিতা। সহশিক্ষ স্কুলে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে প্রেমাভিনয় কর্ত্তে ছেলে মেয়েকে দেখা যায় না। দুএকজন অত্যধিক ভাবপ্রবণ যারা থাকে তারা স্কুলের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কাঁচা মনকে দু দিনেই শক্ত করে নেয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে সহশিক্ষ স্কুলের ইতিহাস শুধু কিশোর বা শুধু কিশোরীদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাসের চাইতে সহস্রাংশে ভাল। এ ব্যবস্থায় উত্তরকালের যৌনজীবন যে সহজ সরল হয়ে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নাই—আর কতকগুলো ক্ষণভঙ্গুর, নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রসূত 'প্রেমপরিণয়ের' (love marriages) সংখ্যাও যে কমে যায় সে বিষয়েও বোধ হয় কোন মতান্তর হবে না। বাঙ্গালীর অপবাদ আছে যে সে ভাবপ্রবণ ; তার যৌনভাবপ্রবণতা সারাতে হলে ছোটবয়স থেকেই নিয়ন্ত্রিত আনন্দ ও কর্ম্মস্রোতের ভেতরে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে, ব্যবধানের

দেয়ালের আড়ালে অস্বাস্থ্যকর চিন্তার আগার গড়ে উঠলে ভবিষ্য জীবনে যৌন অভিযোজন (adaptation) ও সুখের আশা খুবই সুদূরপরাহত। আমাদের সমাজব্যবস্থার ফলে স্বামীরা হয়ে পড়ে অত্যধিক স্ত্রৈণ, ভাবপ্রবণ বা অসম্ভবরূপে দাম্ভিক, স্বেচ্ছাচারী প্রভু —এ দুয়ের একটির ভেতরেও যৌন অভিযোজনের চিহ্ন মাত্র নেই।

সহশিক্ষার নৈতিক দিকটা বিশেষভাবে আলোচনা কর্ত্তে বাধ্য হলুম কারণ এটা নিয়েই হচ্ছে যত তর্কবিতর্ক, মারামারি, কাটাকাটি। নৈতিক দিক থেকে এর অনুমোদন হলে সামাজিক, নাগরিক বা শিক্ষার দিক থেকে কোন বিশেষ আপত্তি উঠতে পারে না এটা বোধ হয় সহজবোধ্য। আমাদের সামাজিক ও নাগরিক জীবনের আদর্শ রচিত হয়েছে স্ত্রীপুরুষের উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজনের দিকে পুরোপুরি নজর রেখে। এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা কোন্ ব্যবস্থায়—স্ত্রীপুরুষের অস্বাভাবিক বিচ্ছেদে, না ছোটবয়স থেকেই তাদের নিয়ন্ত্রিত সাহচর্য্যের ভেতরে ? এই জন্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সহশিক্ষ বিদ্যায়তনের কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে। সামান্য সাধারণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাও অনায়াসে বুঝতে পার্ব্বেন স্ত্রীপুরুষকে বহুদিন বিভিন্ন গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে জীবনের কাজে হঠাৎ সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের সহযোগী হতে আশা করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

বুদ্ধি, মন, অনুরক্তি, শারীরিক সামর্থ্যের পার্থক্য ইত্যাদি শিক্ষার দিক থেকে যেসব আপত্তি উঠতে পারে এখন তা আলোচনা কর্ব্ব। অনেকে আজো মনে করেন ছেলেমেয়ে কিশোরকিশোরীর স্বাভাবিক বুদ্ধি বা ধীশক্তি (intelligence) বিভিন্ন, সেজন্য তাদের একসঙ্গে শিক্ষা হতে পারে না। মনোবিদ্‌রা বা ইংলণ্ডের শিক্ষানিয়ন্ত্রণ বোর্ডে (বোর্ড অফ এডুকেশন) পণ্ডিতেরা যেসব তথ্য নিরূপণ করেছেন তা থেকে এ যুক্তি মোটেই সমর্থিত হয় না। মনস্বিতার বা ধীশক্তির নানারূপ পরীক্ষা নিয়ে (Intelli-

gence Tests) দেখা গেছে মাপে ছেলেমেয়ে কিশোরকিশোরী যুবকযুবতী প্রায় সমানই দাঁড়ায়, মেয়েরা ছেলেদের চাইতে ধীশক্তিতে মোটেই খাটো নয়, তবে যেটুকুন পার্থক্য আছে তা শুধু তাদের বিভিন্ন মন, অনুরক্তি ও স্বভাবের দিক থেকে ; আর এ পার্থক্যের মূলে রয়েছে সামাজিক পরিস্থিতি ও সমাজনিরূপিত যার যার বিশেষ কাজ। এসব গবেষণা থেকে এখন এও প্রমাণ হয়েছে একই স্তরের স্ত্রীপুরুষের ভেতরে ধীশক্তির যেটুকু তফাৎ আছে তার চাইতে অনেক বেশী তফাৎ আছে একই 'সেক্সে'র লোকের ভেতর। কাজেই স্ত্রীপুরুষের বুদ্ধির পার্থক্যের দিক থেকে সহশিক্ষা নাকচ করা যায় না, শুধু তাদের বিভিন্ন মন, অনুরক্তি বা প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা বিদ্যায়তনে রাখা প্রয়োজন।

ছেলেমেয়ের ভেতর একটা পার্থক্য কিন্তু ধাতুগত এবং বিজ্ঞানসম্মত—সেটা হচ্ছে তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের ধারায় বা ক্ষিপ্রতায়। মেয়ের জীবনে কৈশোর পদার্পণ করে ছেলের জীবনের বছর দুয়েক আগে, কাজেই তার মানসিক শক্তি একটু এগিয়ে চলে সমবয়স্ক ছেলের চাইতে। কিন্তু এই অগ্রগতি থেমে যায় ঠিক চোদ্দ বছরে যখন ছেলে তাকে ধরে ফেলে এই ধীশক্তির ঘোড়দৌড়ে। কিন্তু প্রকৃতিদেবী হয়তো কোনদিনই নারীজাতির ওপর খুব সদয় নন—তাই এই এগিয়ে চলার মূল্য দিতে হয় তাকে প্রথম যৌবনে অল্প আয়াসে ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়ে! এখানেই শেষ নয়—আগেই বলেছি চোদ্দ বছরে ছেলে মেয়েকে ধরে নেয় অথচ তার খাটবার শক্তি থাকে মেয়ের চাইতে অনেক বেশী। তাই যখন একই ক্লাসে ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, অত্যধিক খাটুনীর ফলে মেয়ের শরীর মন দুই-ই ভেঙ্গে পড়ে। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত অহেতুক, কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ আপত্তি অবিশ্যি শুধু সহশিক্ষা সম্বন্ধে নয়, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা জড়িয়ে এই আপত্তি। মেয়েরা ছেলেদের চাইতে ধীশক্তিতে হীন নয় একথা

তাঁরা প্রমাণ করেছেন প্রবেশিকা থেকে এম-এ, এম্. এস্-সি- পরীক্ষার ফল দিয়ে কিন্তু এর জন্য কি অসম্ভব মূল্য না দিতে হয়েছে ভগ্নস্বাস্থ্যে, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিতে, বিরল কেশদামে, অবসন্ন দেহ মনে—এক কথায় আত্মবলিদানে!

সেজন্য ইংলণ্ডের পণ্ডিতেরা বলেছিলেন ছেলেরা যে পরীক্ষা ১৬ বৎসর বয়সে দেবে মেয়েরা দেবে সে পরীক্ষা ১৭ বৎসর বয়সে। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থা জগৎকে একদিন মেনে নিতেই হবে। তবে এ ব্যাপারেও সহশিক্ষ স্কুল মেয়ের দিক থেকে অনেক নিরাপদ স্থান। কারণ এখানে ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে জানে, তাদের পক্ষে বিপক্ষে যা আছে তা বোঝে এবং প্রথম যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই (বিশেষ করে চোদ্দ বছরের পর) মেয়েদের অত্যধিক খাটুনির হাত হতে রেহাই দেবার একটা সত্যিকারের চেষ্টা চলে। সত্যিকারের প্রতিকার অবিশ্যি হচ্ছে পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে যে যার ইচ্ছা, অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন প্রিয় জিনিসগুলো নিয়ে গবেষণা ও কাজের ভেতর দিয়ে জীবনকে পূর্ণ করে তুলবে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তা হবার সম্ভাবনা অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে নেই।

ছেলেমেয়ের ভেতরে দৈহিক বলের পার্থক্য সবাই মেনে চলে এবং কেউ তাদের একসঙ্গে ফুটবল বা হকি খেলতে নির্দ্দেশ দেয় না। কিন্তু ক্রিকেট, টেনিস, সাঁতার কাটা, স্কিপিং বা দড়ি লাফানো, ব্যাডমিণ্টন, ভলিবল, ফেন্‌সিং (অসিক্রীড়া), লোকনৃত্য, চারু অঙ্গ-চালনা ইত্যাদি ক্রীড়ায় কোন আপত্তি হতে পারে না। এসব খেলাধুলো অত্যধিক পরিশ্রমসাপেক্ষ নয়; পরন্তু তাদের দেহমনকে নদীতে অবগাহন করার মত শুদ্ধ পবিত্র করে দিয়ে যায়।

এ কথা হয় ত খানিকটা সত্যি ছেলেদের অঙ্ক, বিজ্ঞান, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ইত্যাদি মেয়েদের চাইতে পড়তে ভাল লাগে এবং সেই অনুপাতে এসব পরীক্ষাতেও তারা ভাল করে। মেয়েরা আবার সাহিত্য, ইতিহাস, আধুনিক ভাষা ও চারুকলায় ছেলেদের হারিয়ে

দেয়। এ থেকে কারো অপটুতা বা শক্তিহীনতা প্রমাণিত হয় না। মেয়েদের সাধারণ পরিস্থিতি যা, তাতে তারা অঙ্ক ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু উদাসীনই থেকে যায় এবং ছেলেদের বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনেকাংশে এমন হয়ে উঠেছে যাতে তারা কাব্য ও চারুকলা হতে দূরেই থাকতে চায়। আগেই বলেছি, সমস্ত ব্যাপারটা হচ্ছে সামাজিক পরিস্থিতি ও যার যার রুচি ও প্রয়োজন নিয়ে—এখানে শক্তিহীনতা বা মনস্বিতার অভাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এস্থলে সহশিক্ষ স্কুল আলোকবর্ত্তিকা তুলে আমাদের পথ দেখাতে ভোলে নি। পরিসংখ্যান (statistics) থেকে দেখা যায় সহশিক্ষ স্কুলে মেয়েদের অঙ্কশাস্ত্রে ও ছেলেদের সাহিত্যে নম্বর অনেক ভাল শুধু ছেলেদের বা শুধু মেয়েদের স্কুলগুলো থেকে। স্যার বেঞ্জামিন গট্ (Sir Benjamin Gott) মিডিলসেকস্ স্কুলগুলোর পরিসংখ্যান থেকে পরীক্ষায় পাশ ও কৃতিত্ব সম্বন্ধেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

আরেকটী বিষয়ে সহশিক্ষ স্কুল মামুলীধরণের স্কুলগুলোকে হার মানিয়েছে। ছেলেদের কার্য্যকুশলতা, উদ্যম, সৃজনীশক্তি ও স্বাধীনতা এবং মেয়েদের শ্রমশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সহশিক্ষ স্কুলে সংক্রামক হয়ে উভয় দলের মধ্যেই বিশদভাবে ছড়িয়ে পড়ে—একটা স্বাস্থ্যকর উদ্দীপনায় ছেলেমেয়ের উভয়েরই যে প্রভূত উপকার সাধিত হয় শিক্ষাজগতে একথার বহুল প্রচার আবশ্যক।

সহশিক্ষ স্কুলের পাঠ্যতালিকা (Curriculum) ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধে অল্প বিস্তর আলোচনা আবশ্যক। শিক্ষাবিদ্‌রা একথা মেনে নিয়েছেন যে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের গৃহস্থালীর ও ছেলেদের হাতের কাজ ছাড়া তাদের পাঠ্যতালিকা একই হবে। আমাদের বাংলাদেশের সেকেণ্ডারী স্কুলের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নতুন পাঠ্যতালিকায় এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যদিও তাতে ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে একই স্কুলে পড়বার কথা ভাবা হয় নি। যাহোক, সহশিক্ষ স্কুলের

পক্ষে ছেলেদের হাতের কাজ ও মেয়েদের গৃহস্থালী কাজের জন্য আলাদা ক্লাসের বন্দোবস্ত করা কঠিন হবে না। প্রত্যেক ভাল স্কুলেই নানারুচির নানা অবস্থার খোরাক জোগাবার একটা প্রয়াস আছে; সহশিক্ষ স্কুলে যেটুকুন দরকার সেটুকুন হচ্ছে এমন শিক্ষয়িত্রী সেখানে কয়েকজনা থাকবেন যাঁরা গৃহবিজ্ঞান, চারুকলা, নার্সিং, শিশুপালন ইত্যাদি মেয়েদের যত্ন নিয়ে শেখাতে পারবেন। কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী না থাকলে সহশিক্ষ স্কুলকে এই আখ্যা দেওয়া বৃথা—শুধু শিক্ষক দিয়ে সহশিক্ষ স্কুল চালানো অসম্ভব। গৃহস্থালী, চারুকলা ইত্যাদি শেখানো ছাড়াও মেয়েদের দিকটা দেখবার জন্যে, তাদের বিশেষ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে, প্রতি সহশিক্ষ স্কুলে কয়েকজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন।

সহশিক্ষা সম্বন্ধে আর যেসব আপত্তি আছে—ছেলেরা মেয়েলি ও মেয়েরা মদ্দা হয়ে যাবে, জীবন থেকে যৌবনের রোমান্স উঠে যাবে, স্কুলে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব চলবে আরো কত কী—এ সব ছেলেমানুষি কথায় আজকাল কেউ কান দেয় না কারণ হাজারো বার প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই পরখ করে দেখা গেছে এসব অলীক আশঙ্কা ভিত্তিহীন, সংস্কারগত ভয় মাত্র।

সহশিক্ষা আজ ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশে বাগবিতণ্ডার সীমা এড়িয়ে বাস্তব রাজ্যের বিচার্য্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতি ও পুরুষের স্বার্থপর বিরুদ্ধাচরণ। একে একে সেসব দূর হয়েছে ও যেখানে হয় নি, হচ্ছে; সর্দ্দা-আইন অনুসারে মেয়েদের বিবাহ বয়স চৌদ্দ করা হয়েছে, এবং উপযুক্ত পাত্র ও অর্থ অভাবে মেয়েদের বিবাহও দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। এসব নানাকারণে মেয়েদের শিক্ষার চাহিদাও বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে দেশে মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর (সেকেণ্ডারী বা প্রাইমারী) সংখ্যা বেড়ে ওঠে নি কারণ মেয়েদের শিক্ষায় হাস্যকর রকমের কম খরচ হলেও আজও কারো চোখে সেটা বিশেষ লাগেনা। কাজেই ব্যয়সঙ্কোচের

দিক থেকে সহশিক্ষার কথাটা আমাদের দেশে অনেকেই ওঠাতে বাধ্য হন। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমি আগাগোড়াই সহশিক্ষার ফলে যে সব চারিত্রিক, নৈতিক ও মানসিক সুফল ফলে তার ওপরেই জোর দিয়েছি ; আমি ঠেকে একে চাচ্ছি না, বরং সাধ করে বরণ করে নিচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, আজও আমাদের দেশে প্রাইমারী স্কুলে পর্য্যন্ত সহশিক্ষা মঞ্জুর কর্ত্তে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন, দ্বিতীয়া শিক্ষা বা কলেজের শিক্ষার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। কিন্তু আজ বাংলা দেশে সেকেণ্ডারী স্কুলে সহশিক্ষার চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে মফঃস্বলের সহর ও গ্রামগুলোতে যেখানে মেয়েদের স্কুল নেই। কিন্তু আমাদের সন্দিগ্ধ আশঙ্কাকুল মন যত রকম বাধা সৃষ্টি করবার তা কর্চ্ছে, জিনিসটাকে বিশেষ ভাবে তলিয়ে দেখবার ধৈর্য্যটুকুন যেন তার নেই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ১০ বছরের বেশী ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়া নামঞ্জুর করেছেন, এতে যে গ্রামে ও মফঃস্বলে স্ত্রীশিক্ষার কত ক্ষতি হচ্ছে তা না বল্লেও বোঝা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য (যথা—মেয়েদের জন্য বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষয়িত্রীর বন্দোবস্ত ইত্যাদি) দাবী করতে পারেন, কিন্তু সমস্ত জিনিষটাকে নাকচ করলে চলবে কেন ? কিন্তু আমাদের সব ব্যবস্থাই উল্টো। দশমবর্ষোত্তীর্ণ মেয়েদের আমরা ছেলেদের সঙ্গে পড়তে দি না, কিন্তু পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষোত্তীর্ণা প্রথম-যৌবনাদের সমবয়স্ক যুবকদের সঙ্গে পড়তে দিতে কোন আইনগত বাধা নেই। অথচ ভাবাবেগের দিক থেকে ঠিক এই বয়সই কৈশোর ও যৌবনের সব চেয়ে বড় বিপদের বা আশঙ্কার সময়। কিন্তু এ আশঙ্কা আগেই বলেছি সাধারণতঃ অমূলক, ভিত্তিহীন—যদি সহশিক্ষা ছোট বয়স থেকেই ঠিক ভাবে চলতে থাকে।

অনেকে ভুলে যান যে বাংলাদেশে সবশ্রেণীর বিদ্যায়তনেই সহশিক্ষা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, কিন্তু কোন কুফল বা উচ্ছৃঙ্খল-তার কথা শোনা যায় নি। প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল মিলিয়ে

(১৯৪৫-৪৬ সালের বাংলার শিক্ষারিপোর্ট অনুসারে) ছেলেদের স্কুলগুলোতে মেয়েদের সংখ্যা হচ্ছে সাড়ে চার লক্ষের কিছু উপরে, শুধু সেকেণ্ডারী স্কুলগুলোতে অবিশ্যি মাত্র চার হাজারের কিছু উপরে। বাংলাদেশে কলেজে ও ইউনিভার্সিটীতে পড়ছেন প্রায় ৩৮৪০টী মেয়ে, তার ভেতর প্রায় দু হাজার মেয়ে পড়ছেন ছেলেদের আর্ট্স্ কলেজে ও ইউনিভার্সিটীতে। বাংলাদেশের শিক্ষাগঙ্গায় উচ্ছৃঙ্খলতার বান ডেকেছে বলে আজও কেউ কিছু শোনে নি। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে সহশিক্ষার প্রচলন বাংলা থেকে বেশী। তা হলে আর এ বৃথা সন্দেহ ও আশঙ্কা নিয়ে সহশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে লাভ কি? একথা ভুলে গেলেও চলবে না যে আমাদের দেশের ঐতিহ্য সহশিক্ষাকে বর্জ্জন করে না, তাকে আদরে গ্রহণ করে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার প্রতিস্তরে সহশিক্ষাই ছিল সাধারণ নিয়ম, একই গুরুর পায়ের তলায় বসে ছাত্রছাত্রী পাঠাভ্যাস করেছে, আর এ ব্যবস্থার চরম পরিণতি দেখতে পাই আমরা নালন্দা (ষষ্ঠ শতাব্দী) ও বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে। তর্কেবিতর্কে, ক্রীড়ায়, সভায়, গোষ্ঠীতে যুবকযুবতীর অবাধ মিলনে কুফল সেদিন ফলে নি, আজও ফলছে না, শুধু আমাদের ভীত সন্দিগ্ধ মন একটা সঙ্কোচের অবতারণা করে সমস্ত জিনিসটাকে অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছে।

নারীর প্রতি সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এই এত বড় একটা ঐতিহ্যকে ডিঙ্গিয়ে কুৎসিত আচরণ কর্ত্তে ছেলেমেয়েরা সহজেই প্রয়াস পাবে একথা ভাবা যুক্তিসঙ্গত হবে না। আজ শিক্ষানীতিতে চাই সন্দেহের পরিবর্ত্তে বিশ্বাস, সস্নেহ পরিচালনা ও দূরদৃষ্টি। শিক্ষার কোন মূল্যই নেই যদি সে শুধু বিদ্যার বোঝার ভারে নুইয়ে পড়ে, জীবনের দিকে তাকাবার শক্তি বা ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে। জীবনের দাবী যে জ্ঞানের দাবীর চাইতে বড় একথা আমাদের বুঝতে হবে, শিখতে হবে।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্র সমস্যা-সমাকীর্ণ, কিন্তু সকল সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা। অথচ এ বিষয়ে যা বলা হয় বা লেখা হয় তার পেছনে থাকে একটা ভাবোচ্ছ্বাস, তাতে থাকে না চিন্তার ছাপ বা গবেষণার বিশ্লেষণ। কিন্তু জাতির অগ্রগতি এমন ওতঃপ্রোতভাবে এর সঙ্গে জড়িত যে শিক্ষার অন্যান্য শাখার চাইতে এদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্, তথা প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই একান্ত প্রয়োজন।

আজকাল অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায় যে, বাংলা দেশের স্কুলকলেজগুলিতে মেয়েরা দিন দিন বেশী সংখ্যায় ভর্তি হচ্ছেন এবং য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলিতেও মেয়েদের সংখ্যা বছর বছর সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছে। দেশে স্ত্রীশিক্ষা এতটা প্রসার লাভ করেছে যে, যেসব স্কুলকলেজ কেবল মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত, তাতে আর তাঁদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না এবং দলে দলে মেয়েরা সহশিক্ষা লাভের জন্য ছেলেদের স্কুঁলকলেজগুলিতেও এসে ভিড় করছেন। বাংলার মেয়েদের ভেতর শিক্ষালাভের এই আগ্রহ দেখে কেউ বা দেশের উন্নতির কথা ভেবে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, আবার কেউ বা পাশ্চাত্যশিক্ষার ঢেউয়ে মেয়েদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে,—এই আশঙ্কায় ভারি বিমর্ষ হয়ে পড়ছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, স্কুলকলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মেয়েদের ভয়ানক অনিষ্ট হচ্ছে ; এই শিক্ষা তাঁদের চরিত্রের মাধুর্য, লজ্জা, শালীনতা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছে ; শুধু তাই নয়, হানি হচ্ছে তাঁদের স্বাস্থ্যের দীপ্তির, অপচয় হচ্ছে তাঁদের মানসিক শক্তির—স্ত্রীশিক্ষা হয়ে উঠছে অনাবশ্যক ব্যয়ের একটা দুঃসহ আড়ম্বর। এসব অভিযোগের

ভেতর কোন সত্যই যে নেই একথা বলা কঠিন, তবে স্ত্রীশিক্ষায় যে ব্যয়বাহুল্য মোটেই হচ্ছে না সেকথা প্রমাণ কর্তেও খুব বেশী সময় লাগে না। ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্ন কি করে উঠতে পারে তা বুঝতে পারি না ; মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় যা কিছু দোষত্রুটি আজ ঘটছে তা ব্যয়সংকোচ ও ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যেই—ব্যয়বাহুল্যের জন্য নয়। তবে যাঁরা এরকম কথা বলেন তাঁদের কথার সঙ্গে কাজের বড় একটা সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না ; কারণ মুখে তাঁরা যাই বলুন, কাজের বেলায় কিন্তু তাঁদের বাড়ীর মেয়েদেরও তাঁরা শিক্ষার জন্য স্কুলকলেজে পাঠাতে কসুর করেন না।

সে যাই হোক আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটেছে এ কথাটা যদি সত্যিই হয়, তবে সেটা খুবই আশার কথা সন্দেহ নেই ; কারণ জাতিগঠন ব্যাপারে সুশিক্ষিত পিতার চেয়েও সুশিক্ষিতা মাতার প্রয়োজন যে বেশি, যুক্তিতর্কের আশ্রয় না নিয়ে সহজবুদ্ধিতেই তা বোঝা যায়। কিন্তু সত্যই কি দেশে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটেছে ?

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতির সুপারিশ করে 'হার্টগ কমিটি' বলেছিলেন :—'The importance of the education of the girls and women in India at the present moment cannot be overrated. It affects vitally the range and efficiency of all education. The education of the girl is the education of the mother, and through her, of her children. The middle and high classes of India have long suffered from the dualism of an educated manhood and an ignorant womanhood—a dualism that lowers the whole level of the home and domestic life and has its reaction on personal and national character.

* * * *

The education of women, specially in the higher stages will make available to the country a wealth of capacity that is now being largely wasted through lack of opportunity. It is only through education that Indian women will be able to contribute in increasing ideas and culture of the country."

বিশপঁচিশ বছর আগে স্কুলে বা কলেজে যে কয়টি মেয়ে শিক্ষালাভ করিতেন, আজকাল তার তুলনায় অনেক বেশি মেয়ে শিক্ষালাভ করছেন ;—এবং ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম-এ অবধি য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলিতে মেয়েদের সংখ্যা আগের চেয়ে বেশ কিছু বেড়েছে,—একথাটা সত্য হলেও এতে করে যে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয়েছে তা ভেবে উল্লসিত হবার কোন কারণ দেখি না।

মেয়েদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ছেলেদের মত মেয়েদেরও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যে একান্ত দরকার এবিষয়ে কোন মতভেদ থাকতে পারে না। ছেলেরা শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নানা রত্ন আহরণ করবে ;—আর মেয়েরা বাইরের জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ বর্জিত হয়ে ঘরের কোণে কূপমণ্ডূকের মত জীবন যাপন করবে ;—এমন বিধান অতি বড় রক্ষণশীল ব্যক্তিও আজকাল আর দিতে চাইবেন না। গৃহের, সমাজের, তথা জাতির উন্নতির মূলে মেয়েদের দায়িত্বের কথা এখন আর অস্বীকার করা যায় না ; এবং এই দায়িত্ব মেয়েরা পালন করতে পারবেন তখনই, যখন ছেলেদের সঙ্গে তাঁরা সমানতালে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার সুযোগ পাবেন।

এখন বিচার করে দেখা যাক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার মেয়েরা সত্যই কতটা অগ্রসর হতে পেরেছেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হচ্ছে বলে আমরা মুখে যতই আস্ফালন করি না কেন, আদবে আমাদের দেশে স্কুলকলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করবার উপযুক্ত বয়সের

মেয়েদের সংখ্যার তুলনায় যাঁরা উচ্চশিক্ষা পাচ্ছেন এমন মেয়েদের সংখ্যা অতি নগণ্য। উচ্চশিক্ষা বলতে কলেজি শিক্ষাকেই বোঝায়। কিন্তু শুধু কলেজি শিক্ষাকেই উচ্চশিক্ষা আখ্যা দিলে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়ে দাঁড়ায় বলে আমি ইংরেজি স্কুলের উঁচু ক্লাসের শিক্ষাকেও উচ্চশিক্ষা বলে ধরতে চাই। কিন্তু কলেজেই হোক আর স্কুলের উপরের ক্লাসগুলিতেই হোক, মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের সংখ্যার তুলনায় ঢের কম।

বাংলাদেশে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১২১টী আর্ট্‌স্‌ ও সায়েন্স কলেজ, ১৯২টি বৃত্তিশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং হাজার দুয়েক ইংরেজি স্কুল আছে। এই সব স্কুল কলেজের ভেতর মাত্র ১১টি কলেজ, ৩২টি বৃত্তিশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং ১৩৬টি স্কুল মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪৫-১৯৪৬ সালের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টগুলি থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের মোট ২ কোটি ৬০ লাখ পুরুষ বাসিন্দার মধ্যে ৩৫,১৭৭ জন ছাত্র বিভিন্ন কলেজ সমূহে এবং ২,৫২,৫৮৭ জন ছাত্র ইংরেজি স্কুলের উপরের চারটি শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করছিলেন। আর বাংলার ২ কোটি ৪০ লাখ স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবলমাত্র ৩,৮৫৩টি ছাত্রী কলেজে উচ্চশিক্ষা এবং ১৩,৬২৮টি ছাত্রী ইংরেজী স্কুলের উপরের চারটি শ্রেণীতে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেয়েছেন। অর্থাৎ স্কুলের উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা ধরেও ছেলেদের গড়ে প্রায় ১৭ জনের জায়গায় গড়ে ১ জন মাত্র মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। এ সত্ত্বেও যদি আমরা দেশে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছে বলে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে চাই, তবে তার চেয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা আর কি হতে পারে জানি না। এই যে হিসাব দেওয়া গেল এটা বছর দুয়েক আগেকার হিসাব। গেল দু বছরে এই সংখ্যা অবশ্য অল্প কিছু বেড়েছে ;—মেয়েদের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সংখ্যাও বেড়েছে। ফলে অনুপাতে সেই ১ ঃ ১৭ প্রায় ঠিকই আছে। শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা আমাদের দেশে যে ভাবে বাড়ছে, সেই বৃদ্ধির হার এত

সামান্য, এত তার মন্থর গতি যে, এই হারে বাড়তে থাকলে শিক্ষিত ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যার সমতা ঘটাতে দু চার বছর নয়, দুচার শ বছর লেগে যাবে।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সহশিক্ষার কথাটা বাদ দেওয়া যায় না। বাংলাদেশে যে হাজার চারেক মেয়ে কলেজে ও য়ুনিভার্সিটিতে শিক্ষালাভ করছেন, তাঁদের মধ্যে ২৩৮৩টি ছাত্রী মেয়েদের কলেজে পড়াশুনা করে থাকেন ; বাকি প্রায় দু হাজারকে স্থানাভাবে অগত্যা ছেলেদের কলেজে ভর্তি হতে হয়েছে। মফঃস্বলের কলেজগুলিতেও কর্তৃপক্ষকে ধীরে ধীরে মেয়েদের প্রবেশাধিকার দিতে হচ্ছে। এভাবে অতি অল্প সময়ের ভেতর সহশিক্ষা বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। পূর্ব প্রবন্ধেই বলেছি এতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য যে অত্যন্ত অপ্রচুর ব্যবস্থা আমাদের দেশে রয়েছে, তাতে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা যৎসামান্য বাড়লেই সহশিক্ষা প্রবর্তন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কলকাতার কোন কোন কলেজে আবার মেয়েদের জন্য সকাল বেলায় আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এরকম ব্যবস্থায় শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ মেয়েরা গ্রহণ করতে পারেন কিনা ভেবে দেখা উচিৎ। এসব কলেজে অধ্যাপকেরা সকাল ৬টা থেকে ১০টা অবধি শুধু মেয়েদের ক্লাসে অধ্যাপনা করেন। আবার ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যেই অনেক সময় তাঁদের ছেলেদের ক্লাসে অধ্যাপনার জন্য হাজির হতে হয়। এতে করে তাঁদের কাছ থেকে খুব ভাল কাজ পাবার আশা করা অন্যায় হবে। এ ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষা হতে পারে না, হয় শুধু নারীশক্তির অপচয়। আমার মনে হয় যে, মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য দরকার,—হয় যথেষ্ট সংখ্যক মেয়ে স্কুলকলেজ স্থাপন করা, আর নতুবা ছেলেদের সঙ্গেই একত্র শিক্ষালাভ করবার সুব্যবস্থা করা। সহশিক্ষার ফলে যে, মেয়েদের কোন অনিষ্ট হচ্ছে এখন পর্যন্ত তা প্রমাণিত হয় নি। বরঞ্চ, সহশিক্ষার ফল কোন কোন কলেজে বেশ ভালই

হয়েছে। এমন অবস্থায় একটা কাল্পনিক আশঙ্কা নিয়ে সহশিক্ষার বিরুদ্ধ সমালোচনা করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি রোধ করা সুবিবেচনার কাজ হবে বলে মনে হয় না। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আজকাল বাংলাদেশে যত মেয়ে স্কুলে ও কলেজে পড়াশুনা করছেন, তাঁদের একটা মস্ত বড় অংশ ছেলেদের সঙ্গে একত্র শিক্ষালাভ করছে।

এবার আমি মেয়েদের পাঠ্যবিষয় ও তাঁদের উচ্চশিক্ষায় ব্যয় সম্বন্ধে দুএকটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব। অনেকে বলেন যে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দেহগত, প্রকৃতিগত, ক্ষমতাগত ও সমাজগত যে পার্থক্য আছে, সেটা সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য একই রকম পাঠ্য নির্ধারণ করা অনুচিত। কথাটা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। মেয়েরা স্কুল কলেজের শিক্ষায় ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যতই ভাল ফল দেখান না কেন, তাঁদের স্থান যে প্রধানতঃ অন্তঃপুরে এটা ভুলে গেলে চলবে না। সুতরাং মেয়েদের,—বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত মেয়েদের,—পাঠ্য-বিষয় এবং তাঁদের দৈহিক ব্যায়ামপদ্ধতি নির্বাচনের সময় এমন সব বিষয় এবং এমন সব খেলাধুলা নির্বাচন করা উচিত যাতে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বা যেগুলি করতে গিয়ে তাঁদের দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির কোন হানি না হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেয়েদের পাঠ্যবিষয় হিসাবে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শুশ্রূষাবিজ্ঞান, প্রসূতির কর্তব্য, চিত্র ও সূচীশিল্প, রন্ধন, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। লজিক, উচ্চাঙ্গের গণিতশাস্ত্র, অর্থনীতির জটিল ও দুরূহ তত্ত্বগুলি যদি তাঁদের ভাল না লাগে তবে সেগুলি পড়তে তাঁদের বাধ্য করা অনুচিত এবং সেগুলি তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ কোন কাজেও আসে না। ব্যায়াম চর্চার বেলায়ও মেয়েদের শক্তি, সামর্থ্য ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যায়ামপদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত। সুখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নূতন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ঐচ্ছিক বা

বৈকল্পিক পাঠ্য নির্বাচনের সময় মেয়েদের উপযোগী কয়েকটি বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছেন। এখন মেয়েরা বৈকল্পিক পাঠ্য হিসাবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চারুকলা, সঙ্গীত ও সূচীশিল্প ইত্যাদি পড়তে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উচিৎ কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসেও এমন কয়েকটি বিষয় পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করা যেগুলি পড়তে মেয়েদের স্বভাবতঃই ভাল লাগবে এবং যেগুলি তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে পরে কাজে আসবে। শিশুপালনতত্ত্ব, প্রসূতিতত্ত্ব, শিশু-মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় কলেজি শিক্ষার প্রথমস্তরে পাঠ্যরূপে নির্বাচিত করা যেতে পারে। তবে ইণ্টারমিডিয়েটের পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যনির্বাচনের ব্যাপারে ছেলেদের ও মেয়েদের পাঠ্যবিষয়ে কোন পার্থক্য রাখা দরকার বলে মনে করি না। কারণ উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে যে গণিতে ও লজিকে মেয়েদের স্বাভাবিক বিমুখতা থাকা সত্ত্বেও একাধিক ছাত্রী গণিতের ও দর্শনের উচ্চতম পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেছেন! যথার্থ জ্ঞানের রাজ্যে কখনও জাতি বা লিঙ্গভেদ থাকতে পারে না। সুতরাং ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে মেয়েদের জন্য কয়েকটি বিশেষ বিষয় পাঠ্যনির্ধারণ করা সঙ্গত হলেও উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে,—অর্থাৎ বি-এ ও এম-এ শ্রেণীতে এরূপ পাঠ্যনির্বাচনের কোন দরকার নেই। মেয়েরা শিক্ষার উচ্চতম স্তরে পৌঁছানোর সময় পূর্ণবয়স্কা হয়ে ওঠেন এবং এই বয়সে বুদ্ধিমান ছেলে ও বুদ্ধিমতী মেয়ের মনের বিকাশ প্রায় সমভাবেই সাধিত হয়ে থাকে।

এবার মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় ব্যয় কি হচ্ছে তা দেখা যাক। ইণ্টারমিডিয়েট থেকে য়ুনিভার্সিটির সর্বোচ্চ শ্রেণী অবধি চালাতে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ধরে ছেলেদের বেলায় প্রায় উনপঞ্চাশ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। এদিকে মেয়েদের অনুরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য খরচ হচ্ছে তিন লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা। এই ব্যয়ের হিসাব অবিশ্যি ছেলেদের ও মেয়েদের মাইনে থেকে যা খরচ হয় তা বাদ

দিয়ে ; ছেলেদের মাইনে থেকে প্রায় ষাট লাখ, আর মেয়েদের মাইনে থেকে মাত্র এক লাখ দশ হাজার টাকা খরচ হয়। এথেকে বোঝা যায় যে, অভিভাবকেরাও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষায় ঢের কম ব্যয় করছেন এবং দেশের কর্তৃপক্ষরা যদিও মাথা গণতি হিসাবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের জন্য কিছু বেশি খরচ করছেন, তবু সে খরচ জাতির অগ্রগতির জন্য অতি সামান্যই। হাই স্কুলের বেলাও একই কথা খাটে। বাংলার তথা ভারতের সমাজের অর্ধেক হল নারীকে নিয়ে। সমাজের অর্ধেক অংশকে অবহেলা করে বাকি অর্ধেকের পুষ্টিবিধানের জন্য আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, তাতে সমাজদেহের উন্নতি হতে পারে না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহের একাংশ সুস্থ ও সবল থাকলেও যেমন তা কোন কাজে লাগে না, ঠিক সেই রকম সমাজদেহের অর্ধাঙ্গ নারীকে বর্জন করে কেবল অপর অংশের পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা করলে তা সমাজের উন্নতির পথে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করবে না—করতে পারে না। মেয়েদের শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা দেশের হিতকামী ব্যক্তিগণের একটি অপরিহার্য কর্তব্য।

যতদিন আমরা এই কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন না করতে পারব, ততদিন জাতীয় অকল্যাণের ছায়া দেশের উপর চেপে বসে থাকবেই থাকবে।

শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের দান

অনেকেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে দেশে দেশে আজ যে নতুন শিক্ষাযুগের প্রবর্ত্তন হয়েছে তার গোড়া পত্তন হয়েছিল ইউরোপ ও আমেরিকায়। এই ভুল ধারণার পেছনে রয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবিনশ্বর দান সম্বন্ধে অজ্ঞতা—শুধু বিদেশেই নয়, এ দেশেও। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় জগৎ বিস্ময়াভিভূত, চারুকলায় তাঁর খ্যাতি দেশবিদেশে ; তাঁর চিন্তাধারা, সূক্ষ্মানুভূতি ও সৃজনীশক্তি যে শিক্ষাক্ষেত্রেও সমান ফল প্রসব করেছে এ জিনিষটা তাই মানুষের চোখে তত সহজে ধরা পড়ে নি। অথচ খতিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সব শিক্ষাবিদ্ ও মনীষিগণ নতুন যুগের ডমরু বাজিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। জন ডিউয়ি, বা মাদাম মণ্টেসরি যুগপ্রবর্ত্তক হিসেবে যে সম্মান পেয়েছেন সে সম্মান রবীন্দ্রনাথেরও প্রাপ্য, হয়ত আরো কিছু বেশী। আমার মনে হয় তাঁর আসন প্লেটো, রুসো, পেষ্টালট্জি ও ফ্রোবেলের সঙ্গে ; এঁরা এঁদের দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে পথের সন্ধান জগৎকে জানিয়েছেন, সে পথে আছে আনন্দ, মুক্তি ও মানবমনের উন্মেষণ। আজও জগৎ সে পথ দিয়ে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে পারে নি, পুরনো পথের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তারি কুহকে পড়ে মুক্তিপথের ইঙ্গিত সে দেখেও দেখছে না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাজগতে যে বাণী প্রচার করেছেন ও কর্ম্মজীবনে তাকে মূর্ত্তরূপ দিয়েছেন তাতে আছে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবশক্তির মুক্তি। সে হিসেবে তাঁর দান অতুলনীয়।

বিংশ শতাব্দীকে শিক্ষার 'নবযুগ, বা 'শিশু-শতাব্দী' বলা হয়, তার মূলগত কারণ হচ্ছে এই শতাব্দীতেই শিশুর প্রতি মানবমনের

দরদ জেগে উঠেছে, পূর্ব্বকৃত সকল অপরাধ ও নির্ম্মম অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শিশুমনের অলিগলির মধ্যে প্রবেশ করে স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে, আনন্দের ভেতর দিয়ে, তার মনোবিকাশের ছন্দের সঙ্গে তাকে আজ শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্বন্ধীয় লেখাগুলো পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি কী গভীর, তাঁর চিন্তাশক্তি কী নিগূঢ়, কী সীমাহীন তাঁর কল্পনাশক্তি ও শিশুর প্রতি স্নেহ। তাঁর এই ধরণের লেখা নিয়ে আমাদের দেশে খুব বেশী আলাপ আলোচনা হয় নি এটা দুঃখের বিষয়; যাতে রবীন্দ্র-শিক্ষাসাহিত্য গবেষণার বিষয় হয় সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি থাকলে সুফল ফলবে। প্রায় ৫৬ বৎসর আগে (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' নামক একটী প্রবন্ধ রাজসাহীতে পাঠ করেন; শিক্ষা সম্বন্ধে এই তাঁর প্রথম রচনা। কিন্তু এই রচনাটী অল্প বয়সের (৩১ বৎসর তখন তাঁর বয়স) হলেও এমনি সারগর্ভ ও তথ্যবহুল যে আজ পর্য্যন্ত ভারত বা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি শিক্ষাব্যবস্থায় সে ভাবধারা নিঃশেষে প্রয়োগ করে উঠতে পারে নি।

শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি তাঁর প্রখর দৃষ্টিতে এমনি ভাবেই ধরা পড়েছিল যে তাঁর অননুকরণীয় ভাষাচিত্রে তার চেহারা দেখাচ্ছিল বীভৎস, কুৎসিত—দেশ তার শিক্ষাব্যবস্থার সে মূর্ত্তি দেখে আঁতকে উঠেছিল। তাই পরবর্ত্তীকালের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখতে পাই অপরিসীম। তিনি সে প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন আমাদের শিক্ষা নিরানন্দ, স্বাধীনতাহীন, মানসিক শক্তি হ্রাসকারী। তিনি আরো দেখিয়েছিলেন বিদেশী ভাষার ভেতর দিয়ে শিক্ষা হওয়ায় ভাষাশিক্ষার সঙ্গে ভাবশিক্ষার বা ভাবের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক থাকে না, তাতে ফল হয় এই জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় না, উভয়ের মাঝখানে একটা দুর্ভেদ্য ব্যবধান থেকে যায়ই যায়, নিবিড় মিলন হবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে,

সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে ; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।" আবার তিনি বলেছেন, "শিক্ষা যদি জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত না হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক, তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎসব হইতে পারে না।" রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে এই কথাটী প্রবন্ধে বলেছিলেন যে আনন্দ ও স্বাধীনতা ছাড়া ছেলের মানসিক শক্তি হয় পঙ্গু, শরীর হয় অপটু, বাল্যপ্রকৃতির মেটে না ক্ষুধা, কল্পনারাজ্যের দ্বার চিরদিন থেকে যায় রুদ্ধ।

শিক্ষার এই অভাবগুলো মোচন করবার জন্য ১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন বোলপুরে 'শান্তিনিকেতন' বিদ্যালয়। আনন্দ ও স্বাধীনতার যে আকর্ষণ তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে তিনি আরেকটী নিগূঢ় বন্ধনের স্বৃষ্টি করলেন ছেলের জীবনে—সেটী হল শিশুপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিবিড় মিলন, ঘনিষ্ঠতম আন্তরিকতা। বনানীর স্নিগ্ধছায়া, নদীর কলোচ্ছ্বাস, বিস্তীর্ণ উদার নীলাকাশ, হরিৎধান্যক্ষেত্র, কাশবনের শুভ্র হাসি, ধূ ধূ করা বিশাল মাঠ, আষাঢ়ের ঘনঘটা—প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাক্ষেত্রে যে শিশুমন গড়ে ওঠে তাতে অলক্ষিতে বেড়ে যায় বিশ্বের সহিত মানুষের যোগাযোগ, প্রকৃতির সঙ্গে স্থাপিত হয় চিরমৈত্রী। এই ভাবটী তিনি বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'তপোবন' (১৩১৬) নামক রচনায়। তিনি বলেছেন, "কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ সহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা, নদী, সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল।

………বন তাদের ছায়া দিয়েছে, ফলফুল দিয়েছে, কুশসমিত জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটী বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেয়েছিলেন।………নিখিল চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া। ………আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে, অর্থাৎ কেবল স্কুলকলেজের পরীক্ষায় পাশ করা নয়, বা কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা করা নয়।" তাই শান্তিনিকেতনের ছেলেরা ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরব্রতে উদ্‌ব্যস্ত হয় নি। তারা বেশ সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এই কঠোরতাকে বরণ করে নিয়েছে। তাদের লেখাপড়া, খেলাধুলো, উপাসনা সবই হয় খোলা মাঠে গাছতলায়! বিশ্বপ্রকৃতির সাথে নিবিড় যোগস্থাপনের কি সুন্দর ব্যবস্থা! প্রকৃতির সাথে নিজের স্বরূপটীর নিত্য পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এই যে শিক্ষার ব্যবস্থা তাতে জীবনের অন্ধ্ররন্ধ্রগুলো আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে—তাই সেখানকার ছোট ছেলে-মেয়েদের মন যেন সর্ব্বদাই বলতে থাকে ঃ—

আমাদের শান্তিনিকেতন
আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশ ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্য নূতন।
মোদের তরুমূলের মেলা
মোদের খোলা মাঠে খেলা
মোদের নীল গগনের সোহাগ মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।

এই আনন্দনীতি ভিত্তি করে বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যে কত না শিক্ষা-

পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে, "The Play Way in Education", "The Project Method", "The Dalton Plan", "Children's Art", ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ১৯০১ সন থেকেই শান্তিনিকেতনে চলে আসছে এসকল নীতির মূলমন্ত্রের দৈনন্দিন প্রয়োগ। বাইরের জগৎ আজ আস্তে আস্তে তা টের পাচ্ছে ও কবির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করছে। আরেকটী জিনিষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে জগতে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন (১৯০৫)—স্কুলে স্বায়ত্তশাসন (Self Government in Schools)। বাঙ্গালীর চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ও তার নির্জ্জীব মন রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই পীড়া দিয়েছে, তাই তিনি স্বায়ত্তশাসনের ভেতর দিয়ে কর্ম্মকুশলতা, চারিত্রিক বল ও সংযমের বাঁধন গড়ে তুলেছিলেন বাঙ্গালীছেলের ভেতর। ইউরোপে ও আমেরিকায় ১৯০৫ এর পূর্ব্বে কেউ কেউ এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যায়তনে পূরোপূরি এই প্রথা প্রবর্ত্তনের সাহস প্রথম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমিলনের বার্ত্তা দেশে প্রচার করেছিলেন, তাঁর বাণীতে পাশ্চাত্য মুগ্ধ হোল, প্রাচী আপন দ্বার খুলে দিল।

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো"

* * *

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।"

বিশ্বমিলনের যে অপরূপ কল্পনাটী বিশ্বকবির চিত্তের সবখানি জুড়েছিল তা মূর্ত্ত হয়ে উঠল ১৯২১ সনে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল জাতি সকল শিক্ষার্থীরই

অবারিত দ্বার, এই মিলনকেন্দ্রে মিলিত হন বিশ্বের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী। এখানে বাংলা, সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, সিংহলী, ইংরাজী, ফরাসী, গ্রীক্, চীনা, ইতালীয় প্রভৃতি বহু ভাষার চর্চ্চা হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে জেনারেল চীয়াং কাই শেক ও মাদাম "চীনাভবন" দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর অমূল্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত বলেছেন, "শত শত সাম্রাজ্যের সমান এই একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থাগার—পৃথিবীর নানা ভাষায় নানা বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থরাজি এই গ্রন্থাগারে স্তরে স্তরে সজ্জিত।" শান্তিনিকেতনের 'কলাভবন' ভারতীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

পূর্ব্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ কবি, জ্ঞানী কিন্তু কর্ম্মীও বটেন। তাই শিক্ষার ব্যবহারিক ও বৃত্তিমূলক দিকটাকে তিনি বিশ্বভারতীতে একটী বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন বোলপুরের সংলগ্ন স্থরুলের "শ্রীনিকেতনে"। এখানে চাষবাস, গোপালন, তাঁতবোনা, কাপড়-ছোপানো, ট্যানিং, চামড়া ও মাটির সুদৃশ্য নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ তৈরী ইত্যাদি নানারকম কাজ হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পল্লীসংস্কারও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সমগ্র গ্রামসেবার আদর্শ শিক্ষায় প্রথম প্রবর্ত্তন হয় তাঁর উদ্দীপনায় ও দূরদৃষ্টিতে।

তাই এই অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ গড়ে উঠেছে চল্লিশ বছরের ভেতর—বোলপুরের রাঙ্গা মাটির মরুভূমির উপর দেশবিদেশের শিক্ষাব্রতীর তীর্থস্থান। এখানে আত্মার সঙ্গে বিশ্বের যোগ আছে, কর্ম্মের সঙ্গে আনন্দের যোগ আছে, চারুকলার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের নিকট সম্বন্ধ রয়েছে, জ্ঞানের সঙ্গে যোগ রয়েছে তপোবনের শান্তরসের, তাই আজ বোলপুর মহামানবের মিলনতীর্থ।

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে মন সরে না; কিন্তু তবু করা প্রয়োজন। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে এ সম্বন্ধে মোটেই সচেতন, বা ওয়াকিবহাল নন তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁদের মনে তীব্র বিতৃষ্ণা না জাগলে নূতনতম পরিকল্পনাগুলো (ওয়ার্ধা বুনিয়াদী শিক্ষা, সার্জেন্ট বুনিয়াদী শিক্ষা ইত্যাদি) কোনদিনই পুষ্টিলাভ করবে না, বা জনসাধারণের কাছে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পাবে না। তাই প্রাথমিক শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা, তার রূপ, তার সমস্যা, সবই শিক্ষিতসমাজের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, নইলে জাতির ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করে তোলা অসম্ভব হবে। আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, একথা ঠিক যে দেশের শিক্ষিত জনমত যে ব্যবস্থার পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে সুদৃঢ় করে না তোলে, সে ব্যবস্থা কোনদিনই কায়েম হয়ে উঠতে পারে না। তাই পুরনো শিক্ষাব্যবস্থার চিতাভস্মের ওপরে যদি নতুন শিক্ষামন্দির গড়তে হয়, তা হলে সব চেয়ে আগে চাই এ জিনিষটা বোঝা যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে চিতাভস্মে কোন্ মন্ত্র উচ্চারিত হলে আবার ফিরে আসবে তাতে সজীব সবল প্রাণ। এই প্রবন্ধে মুমূর্ষু রোগীর কাতর আর্ত্তনাদই শুনব, পরবর্ত্তী প্রবন্ধটীতে একে স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনবার কথা আলোচনা করব।

দশ বছর ধরে অবিরাম আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রচারকার্য্য চালানো সত্ত্বেও, ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার যে কঙ্কালসার চেহারা দেখা দিল তাতে শঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়। দেখা গেল ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ লোকের ভেতর, মাত্র ৪ কোটি তেয়াত্তর লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ১০·৫ জন লোক সামান্য

লেখাপড়া জানে আর বাকী ৯০ জন রয়ে গেছে একেবারে নিরক্ষর, জ্ঞানের আলোর ছোঁয়াচ পর্য্যন্ত তাদের গায়ে লাগে নি। আরো দেখা গেল দশ বছরের মধ্যে (১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত) ভারতের অগণিত নিরক্ষর নরনারীর ভেতর শতকরা একজন করেও সাক্ষরদের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি, এটা কি কম আফশোষ বা ক্ষোভের কথা! ১৯৪১ এর পর থেকে দেশে যদি ব্যাপকভাবে ওয়ার্ধা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন হত তা হলে হয়ত এ অবস্থার বেশ কিছু উন্নতি হত; কিন্তু ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ নির্য্যাতনের ফলে তা সম্ভব হয় নি। তাই আজ প্রত্যেক দেশপ্রেমিকই দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিত হয়ে উঠছেন। শিক্ষা, নীতি, সমাজ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি বা গণতন্ত্র যে দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে জাতীয় অগ্রগতি নির্ভর করে জাতির সাক্ষরদের ওপর। তাই ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার এ দুরবস্থা থেকে কি এই সিদ্ধান্তেই লোকে উপনীত হবে না যে দেশের শিক্ষিতসমাজ সর্ব্বজনীন সাক্ষরতা সম্বন্ধে এতদিন সজাগ ছিলেন না বা সে সম্বন্ধে প্রয়াস ও ত্যাগস্বীকার বিশেষ কিছুই করেন নি?

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ও গল্‌তি কিছু ইতরবিশেষ করে সারা ভারতবর্ষময় প্রায় একই রকমের—অর্থাভাব, এক বা দু-শিক্ষক-সম্বলিত স্কুল, শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষয়িত্রীর অভাব, সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষোপকরণের অভাব, কার্য্যকুশলতাহীন সাহিত্যিক শিক্ষা, ফলে নিরক্ষর পিতামাতার শিশুকে স্কুলে পাঠানো সম্বন্ধে গভীর ঔদাসীন্য,—আর এসবের পুঞ্জীভূত ফল—প্রাথমিক শিক্ষায় বালশক্তির বিরাট অপচয় ও অর্থনাশ।

এ বিষয়টা আরো শোচনীয় বলে মনে হয় যখন দেখি, যেসব দেশ ভারতেরই সামিল ছিল তারা বেশ অল্প সময়ের ভেতরই জাতীয় অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় নিরক্ষতার কলঙ্ক দূর কর্ত্তে সমর্থ হয়েছে। জাপানের লেগেছে পঞ্চাশ বছর, রুশ ও তুরস্কের

যথাক্রমে কুড়ি ও পনের বছর। জিনিষটা আরো অরুন্তুদ হয়ে ওঠে যখন ভাবি কিছুদিন আগেও ভারতের যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে তাও নেই। কোন স্বদেশপ্রেমিকই একথা ভুলতে পারেন না যে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে টমাস্ মন্‌রো (Thomas Monroe) পার্লামেন্টসভায় বলেন "প্রত্যেক গ্রামে একটী বিদ্যায়তন ছিল" এবং আডাম্ সাহেব (Mr. Adam) ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বলেন "বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ শিক্ষালয় বা বিদ্যায়তন ছিল।" একথা ঠিক শুধু বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিয়ে শিক্ষার ভালমন্দ বিবেচনা করা যায় না এবং সেদিনের শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু তবুও একথা মানতেই হবে যে যদি ভারতের বর্ত্তমান অগণিত শিক্ষালয়হীন গ্রামগুলোর চেহারা বদ্‌লে দিয়ে প্রতি গ্রামে একটী শিক্ষালয় স্থাপন করা যেত, তা হলে জনশিক্ষা এর চাইতে অনেকগুণ প্রসার লাভ করত।

বাংলার কথাই ধরা যাক্ :—বাংলাদেশে লক্ষাধিক গ্রাম আছে; বিদ্যালয়-সম্বলিত গ্রামের সংখ্যা হল ৩৭,২৯২ আর বিদ্যালয়হীন গ্রামের সংখ্যা হল ৭২,৩০২, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিয়ে বিচার কর্ত্তে গেলে অন্যান্য প্রদেশের চাইতে বাংলাদেশের অবস্থা ভাল মনে হবে (বাংলা দেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা সব চাইতে বেশী), কিন্তু এই বাংলাদেশেও আজ প্রতি ৩·১৪ বর্গমাইলের ভেতর মাত্র একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এ অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। শিশুদের এতটা পথ চলে ইস্কুলে আসতে বেশ অসুবিধে হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আডাম্ সাহেবের গণনা থেকে জানা যায় বাংলা ও বিহারের প্রতি ৬৩টী ছেলেমেয়ের জন্য একটী শিক্ষালয় স্থাপিত ছিল; আজ বাংলায় ৪০,১২১টী প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৪৪-৪৫ এর বাংলার রিপোর্ট) এবং প্রায় ৭০ লক্ষ বিদ্যালয়-গমন-উপযোগী শিশু (৬ থেকে ১১ বয়স্ক শিশু) বিদ্যমান, কাজেই ১৭৫টী ছেলেমেয়ে পিছু মাত্র একটী স্কুলের ব্যবস্থা কর্ত্তে সক্ষম হয়েছি আমরা। ১০০ বছর আগের তুলনায়ও আজ বাংলা

দেশের এই অবস্থা ; প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্যকারিতা এতে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধেও মোটামুটি একথা খাটে। যদি ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জন, ৬ থেকে ১১ বছর বয়স্ক শিশু বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হলে দেখা যায় আজ ভারতবর্ষে প্রায় ৩৩০ জন ছেলেমেয়ে পিছু মাত্র একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এ ব্যবস্থা কোনমতেই সন্তোষজনক হতে পারে না।

প্রতিগ্রামে এক বর্গ মাইল পরিধির ভেতর একটী করে উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষক ও সাজসরঞ্জাম-সম্বলিত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালয় থাকবে এটাই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম, তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার লাভ করবে না। যে মন্দাক্রান্তা তালে আমরা এ বিষয়ে অগ্রসর হচ্ছি, আর যে ঘোড়ার বেগে ছুটে চলেছে আমাদের দেশে জন্মের হার, তাতে দেশের বিদ্যালয়-গমন উপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ের আবেষ্টনীতে আনতে গেলে হয় ত হাজার বছর লেগে যাবে। এ কথা ভাবতে গেলেও অধীর হয়ে উঠতে হয়।

অবিশ্যি আশাপ্রদ কোন কিছুই যে নেই একেবারে একথা বলা হয় ত অন্যায় হবে। সারা ভারতবর্ষে—মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা, বোম্বাই ও পাঞ্জাব সব প্রদেশেই নিকৃষ্ট, এক-শিক্ষক-সম্বলিত সাজসরঞ্জামহীন যথাতথা প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠিয়ে দিয়ে সে জায়গায় পরিকল্পনাসম্ভূত চারিশ্রেণীসংযুক্ত স্কুল খুলবার প্রয়াস হয়েছে, তাতে স্কুলের সংখ্যার হ্রাস হয়েছে সন্দেহ নেই* কিন্তু স্কুলগুলো আগের চাইতে উন্নততর হয়েছে ও শিক্ষকমণ্ডলীর

---

* ভারতসরকারের ১৯৩২-৩৭ পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট অনুসারে মোট ৩৯৪১ অর্থাৎ প্রায় চার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় কমেছে। এর পরে ভারতসরকারের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট যুদ্ধের জন্য বের হয় নাই। বাংলাদেশের ৬৪,০০০ প্রাথমিক স্কুল কমে ৫৪,৪৬০এ এসে দাঁড়িয়েছিল ১৯৩৯-৪০ সালের বাংলাদেশের রিপোর্ট অনুসারে। ১৯৪৫-৪৬ সনের বাংলা রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা এখন এসে দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজারের একটু উপরে (৪০,১০৮)।

বেতনও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটী শুভ লক্ষণও প্রক হয়েছে—স্কুলের সংখ্যা কমেছে বটে কিন্তু স্কুলে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ছেলেদের সংখ্যা ১৯৩২-৩৭ সনের ভেতর বেড়েছে প্রায় দশ লক্ষ আর মেয়েদের বেড়েছে পাঁচ লক্ষের কিছু উপরে। এতে অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি খানিকটে আগ্রহ হয়েছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ভারত সরকারও এ বিষয়ে খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সত্যই কি এতে আত্মপ্রসাদের কোন যথার্থ কারণ আছে? সমস্ত ভারতে ১৫ লক্ষ বেশী ছেলেমেয়ে যদি স্কুলে ঠিকমত গিয়েও থাকে, তা হলেও স্কুল-গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের শতকরা ৮৪ জন স্কুলের বাইরেই রয়ে গেল আর গড়ে ৩৩০টী ছেলেমেয়ের পিছু পড়ল একটী স্কুল। তারপর, আত্মপ্রসাদের শেষ রসটুকুনও শুকিয়ে যায় একেবারে, যখন ভেবে দেখা যায় কী অকেজো ক্ষণভঙ্গুর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি আমরা যার সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধ, কোন যোগাযোগ নেই। এর স্বরূপ আমূল পরিবর্ত্তন না কর্ল্লে এ শিক্ষা কোন কালে কার্য্যকরী হবে না।

এখন বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্ববাদিসম্মত শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করব। শিশুশক্তির যে বিরাট অপচয় চলছে তারই কথা সর্ব্বাগ্রে বলতে হয়। একথা পণ্ডিতেরা মেনে নিয়েছেন যে অন্ততঃ চার বছর (১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত) বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাস না কর্ল্লে সাক্ষর বা সামান্য লেখাপড়া জানা বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৯৩৩-৩৪ সনে প্রথম শ্রেণীর ৩৮,৬৩,৩১৯ ছেলের ভেতর মাত্র ১০,৭০,৩৬০টী ছেলে ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪র্থ শ্রেণীতে এসে উপনীত হল। অনেকে ফেল করে নীচু ক্লাসে রয়ে গেল আর কেউ বা পড়াশুনো একদম ছেড়ে দিল অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সব ছেলেরা আসে তাদের মধ্যে শতকরা ৭২ জন নিরক্ষতার অভিশাপমুক্ত হতে পারে না এবং তাদের ফাজিল বা বাতিলের (Wastage) মধ্যে ধরা যায়। মেয়েদের অবস্থা আরো শোচনীয়। যেখানে ছেলেদের

তের শতকরা ২৭·৭ জন চতুর্থ শ্রেণীতে এসে পৌঁছয়, মেয়েদের বেলা সেখানে শতকরা পৌঁছয় মাত্র ১৪·৩ জন। ছেলেমেয়েদের লিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রথম শ্রেণীতে (সব চেয়ে নীচু শ্রেণীতে) রা ভর্ত্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা ১৯ জনের বেশী সাক্ষর ত পারে নি। এর চাইতে মর্ম্মান্তিক বা মারাত্মক অবস্থা আর হতে পারে ?

প্রাদেশিক রিপোর্টগুলো থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে প্রাথমিক স্কুলে নিরক্ষরতা দূর হয় শুধু তাদেরই যারা মাধ্যমিক স্কুলে যায় ; বস্তুতঃ প্রাথমিক বিদ্যা যারা আয়ত্ত কর্ত্তে আসে তাদের উন্নতি কিছুই হয় না, তারা যে নিরক্ষর সে নিরক্ষরই থেকে যায়। সোজাকথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বর্ত্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দ্বারা কোন উপকারই সাধিত হয় না। এমন কি বোম্বাই ও পাঞ্জাব যে দুটি প্রদেশ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ একটু সজাগ ও অগ্রগামী তাদেরও ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ফাজিল বা বাতিলের ('ওয়েস্টেজের') হার হচ্ছে শতকরা যথাক্রমে ৬৩ এবং ৭৭ জন। অনেকে হয়ত এই ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন যে পাঞ্জাবে ও বর্ম্মাদেশে ফাজিলের হারটার খানিকটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু একথাও স্বীকার কর্ত্তে হবে যে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর মত প্রদেশেও ফাজিলের হারের অতি শম্বুকগতিতে পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এসব দেখে শুনে শুধু এক সিদ্ধান্তেই শিক্ষাবিদ্ মাত্রেই উপনীত হবেন—যে এ শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত কোন সন্তোষজনক ফললাভ অসম্ভব।

প্রাদেশিক রিপোর্টগুলো এই অসম্ভব ফাজিলের কতকগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ও শাসনসম্বন্ধীয় কারণ নির্দ্দেশ করে থাকে তার ভেতরে নিম্নলিখিত কারণগুলো বিশেষভাবে আলোচ্য :—কৃষকমজুরদের ছেলেমেয়ে উপার্জ্জনক্ষম হলেই চার বছর শিক্ষার আগেই স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া, অকেজো বা সাহিত্যিক শিক্ষা, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা কম হলেও চলে অনেক অভিভাবকের এই ধারণা, সহশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকের এখনো আপত্তি,

বহু অসম্পূর্ণ বা দুই শ্রেণীর স্কুল (বাংলাদেশে আজও প্রায় তিন হাজার স্কুল এক থেকে দু বা তিন-শ্রেণী-সম্বলিত), শিক্ষকের অভাব, ফলে শিক্ষককে এক অদ্ভুত কসরৎ কর্ত্তে হয় অর্থাৎ একই শিক্ষককে একাধিক বৃহৎ শ্রেণী একই সময়ে পড়াতে হয়, (ভারতে ছেলেদের প্রাথমিক স্কুলগুলোর ভেতর শতকরা ৪৬টী এবং মেয়েদের স্কুলগুলোর ভেতর শতকরা ৬২টী এক-শিক্ষক-সম্বলিত স্কুল),* শিক্ষিত শিক্ষকের অভাব, (যদিও ট্রেনিং বা শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের (স্ত্রী ও পুরুষ) হার বেড়ে শতকরা প্রায় ৫৭ জন হয়েছে কিন্তু এঁদের অনেকেরই লেখাপড়া অত্যন্ত কম জানা আছে), চিত্তাকর্ষক পাঠদান ও উপযুক্ত তদারকের অভাব, সারা বছর ধরে স্কুলে ভর্ত্তি করা, নিয়মিত স্কুলে না আসা, ও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জিলা ও স্কুল বোর্ডের অশিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা চালানো। বলা বাহুল্য এসব প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত না হলে বিশেষ কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। প্রাদেশিক সরকারদের ফাজিলের কারণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেই চলবে না—আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের এ শোচনীয় অবস্থার বিরতি ঘটাতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এ অপরিসীম দুরবস্থার একটা মূল কারণ হচ্ছে উপযুক্ত অর্থ এতে ব্যয় হচ্ছে না যাতে করে স্কুলগুলোকে সত্যিকারের আনন্দ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান করে তোলা সম্ভবপর হয়। ১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতের মোট খরচ হয়েছে আটকোটির কিছু কম অথচ শুধু বাংলা দেশেই সার্জ্জেণ্ট রিপোর্ট অনুসারে ৬ থেকে ১১ বছর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে দরকার ২২ কোটি টাকা (১৯৪৫-৪৬ সালের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে খরচ হচ্ছে আজ প্রায় এক কোটি আশী লক্ষ), বোম্বাই ও মাদ্রাজেও যথাক্রমে মাত্র দুকোটি ও দেড়কোটি মত খরচ হচ্ছে (ভার্নাকুলার স্কুলের উঁচু

* বাংলা দেশের ১৯৪৫-৪৬ সনের শিক্ষারিপোর্ট বা পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে তিন হাজার তিন শ পঞ্চাশটি (৩৩৫০) এক-শিক্ষক-সম্বলিত স্কুল আজো বাংলাদেশে আছে।

ক্লাশের খরচাসমেত) যদিও হওয়া উচিত আট কোটি ও কুড়ি কোটি টাকা। একথা সত্য যে ১৯৩২ সালের তুলনায় সারা ভারতে ১৯৩৭ সালে ১৭ লক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষায় খরচ বেড়েছে এবং যুক্তপ্রদেশে ছাড়া আর সমস্ত প্রাদেশিক সরকারই খরচা কিছু বাড়িয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ, কিন্তু প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় তা এত কম যে তাতে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ব্যর্থতার গ্লানি ছাড়া আর কিছুই বর্ত্তায় নি। সার্জ্জেণ্ট রিপোর্ট অনুসারে বোম্বাই (আট কোটি) ও পাঞ্জাব (১২ কোটি) ছাড়া বাংলা, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদির মত বড় প্রদেশগুলির কমবেশী কুড়ি কোটি টাকা লাগে ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের ভালভাবে শিক্ষা দিতে। সাজসরঞ্জাম-সম্বলিত বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ ট্রেনিং-প্রাপ্ত, অন্ততঃ ত্রিশ টাকা মাসিক বেতনভোগী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দিতে সমস্ত ভারতের ছ থেকে চোদ্দবৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার খরচ যেখানে ধরা হয়েছে দুশো কোটি, সেখানে আট কোটি টাকা খরচ হচ্ছে বল্লে লোকে আমাদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে পারে। অথচ বস্তুতঃ হচ্ছে তাই। এদেশে বৃটীশ আমলে অনেক তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে তা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু আজ স্বাধীন দেশে এ সমস্যা পূরণ জাতীয় গভর্মেণ্টকে করতেই হবে, ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেলে চলবে না।

এর জন্য হয় ত অনেক নতুন বন্দোবস্ত করতে হবে, অনেক কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়বে, বক্রোক্তি শ্লেষোক্তি শুনতে হবে, খানিকটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে, কিন্তু তা হলেও হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। খরচের অদলবদল করে হোক, শাসনবিভাগের মোটা মাইনের চাকুরেদের মাইনে কিছু কমিয়ে হোক, ধার করে হোক, বা নতুন আয়ের ব্যবস্থা করেই হোক, রাষ্ট্রকে দশবৎসর বা পনের বৎসরের একটী পরিকল্পনা নিয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প চিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে যাতে করে স্কুলে যাবার বয়সের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে ভাল স্কুলে পড়তে পারে। দেশবিধ্বংসী যুদ্ধ যখন লাগে, তখন যা করে হোক রাষ্ট্র টাকা সংগ্রহ করে, টাকা নেই বলে হাত উল্টে বসে থাকে না।

কিন্তু নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম বহুদিন থেকেই চালানো উচিত ছিল সে সংগ্রাম কি টাকার অভাবে চিরদিনই বন্ধ থাকবে? ভারতবাসী একটা জিনিষ ঠিক এখনো বুঝে উঠতে পারে নি—দেশ আক্রমণকারী শত্রুর চাইতে নিরক্ষরতা আরো কত বড় মারাত্মক শত্রু, এক শত্রু অল্প কিছুদিনের জন্য হয় ত মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য, কৃষ্টি নষ্ট করতে সমর্থ হয় কিন্তু শিক্ষিত দেশ আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে কিন্তু নিরক্ষরতা মানুষের প্রাণশক্তিকে, তার আত্মাকে বিনষ্ট করে, মানুষের যা কিছু কাম্য তার জন্য সংগ্রাম করবারও শক্তি লোপ পেয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে আজ যে জিনিষের একান্ত প্রয়োজন সেটী হচ্ছে রাষ্ট্র ও গণপ্রতিনিধিদের নানা বিষয়ে ত্যাগস্বীকার ও কায়েমী স্বার্থে ঘা দেবার স্থির সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পের রহস্যজনক অভাব বলেই দেশের আজ এই দুরবস্থা।

যে সব জায়গায় মেয়েদের স্কুল নেই সেখানে ব্যয়সংক্ষেপ করে মেয়েদের শিক্ষা দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সহশিক্ষা। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এ বিষয়ে পাওয়া গেছে মোটামুটি আশাপ্রদ সাড়া। সমস্ত ভারতবর্ষে যে সব মেয়েরা ছেলেদের স্কুলে পড়ছে তাদের সংখ্যা শতকরা ৩৮ জন থেকে বেড়ে শতকরা ৪৪ জন হয়েছে। বর্ম্মাদেশ এ বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে, সেখানে শতকরা ৮২টী মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে পড়ে। দিল্লী আবার ঠিক তেমনি উল্টো, শতকরা মাত্র ৩টী মেয়ে পড়ে ছেলেদের সঙ্গে। আগের তুলনায় অবিশ্যি দিল্লীতেও কিছু উন্নতি হয়েছে, দশ পনর বছর আগে প্রায় একটী মেয়েও যেত না ছেলেদের স্কুলে। এ বিষয়ে দিল্লী রিপোর্টের মত :—"সহশিক্ষার অবস্থা আশাপ্রদ, ধীরে ধীরে সেকেলে পরিবর্ত্তন-বিরোধী মনোভাব দূর হইতেছে।" মাদ্রাজ (শতকরা ৬০), বর্ম্মা (শতকরা ৮২·৪), আসাম (৫২·৯), উড়িষ্যা (শতকরা ৭২) এবং কুর্গ (শতকরা ৭২)—এই সব দেশ ও প্রদেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, যে সব মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পড়ছে তাদের সংখ্যা মেয়েদের স্কুলে পড়া মেয়েদের চাইতে অনেক বেশী। বাংলাদেশে

মাধ্যমিক স্কুলের উঁচু ক্লাশে ছেলেমেয়ের একসঙ্গে পড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানা থাকা সত্ত্বেও সহশিক্ষা দিন দিনই বেড়ে চলেছে, কারণ তা ছাড়া গ্রামে বা মফঃস্বলে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আর কোন বন্দোবস্তই নেই।

একটী প্রদেশের কথা আমার বিশেষ করে মনে হচ্ছে, সেটী পাঞ্জাব। পাঞ্জাবে সাধারণ লোকের ভেতর সমাজব্যবস্থা বড্ড সেকেলে কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে ছেলেদের স্কুলে পড়া মেয়ে ও মেয়েদের স্কুলে পড়া ছেলের সংখ্যা বেড়েছে। কাজেই এ বিষয়ে বোধ হয় আর মতদ্বৈধ নেই যে পুরানোপন্থী ভারতবর্ষেও সহশিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায়, লোকের গা-সহা হয়ে উঠেছে, সত্যিই তাই হওয়া উচিত। অবিশ্যি সহশিক্ষার সুফল যদি ফলাতে হয় তা হলে সহশিক্ষ বিদ্যালয়ে উচিত মত কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পাঞ্জাব ও মান্দ্রাজে স্বামীস্ত্রীকে একই স্কুলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে এ বিষয়ে অল্পবিস্তর ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে প্রয়াস করার কথা দূরে থাক, বিষয়টা গভীরভাবে ভেবেই দেখা হয় নি। পাঞ্জাবে লায়ালপুর ও জুলুন্দর এই দুটী কেন্দ্রে কুড়িটী কুড়িটী করে শিক্ষকদের স্ত্রীদের ট্রেনিং দেওয়া হয়, এই করে সহশিক্ষ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের সমস্যা দূর করবার প্রচেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। আজ একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁদের স্বভাবসুলভ স্নেহ ও আন্তরিকতার দরুণ লেখাপড়া জানা ট্রেনিং-প্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রী অনুরূপ পুরুষ শিক্ষকদের চাইতে শতগুণে ভাল। এবিষয়ে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও সার্জেণ্ট রিপোর্টেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন, বিদ্যাবুদ্ধি বা যোগ্যতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যৎসামান্য উল্লেখ করেছি। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বর্ত্তমানে এ দুটী বিষয়ই অত্যন্ত লজ্জাকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চাশ হাজার শিক্ষকের বলতে গেলে কোন বিদ্যাবুদ্ধিই নেই।

তারপর প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন ১৬৲ টাকা হতে ১০৲ টাকা, কি তারও কম আজো দেওয়া হচ্ছে। অবিশ্যি বাংলায় সম্প্রতি প্রধান শিক্ষককে পঁচিশ ও সহকারী শিক্ষককে ২০৲ টাকা কয়েকটী জিলায় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ২৫৲ টাকা ও সার্জ্জেণ্ট রিপোর্টে ৩০৲ টাকা সহকারী শিক্ষকের প্রাথমিক বেতন ধার্য্য হয়েছিল যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালে কিন্তু এসবই যুদ্ধোত্তরকালে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যাদির মাগ্‌গি দরের জন্য অত্যন্ত কম বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন মাননীয় প্রধান ও শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি শিক্ষকদের এক সভায় বলেছেন প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ৪৫৲ থেকে ৭৫৲ টাকা হবে। এ হলে তবু যাঁরা জাতির পক্ষে সব চেয়ে দায়িত্বশীল, গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেবেন তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের মোটামুটি একটা বন্দোবস্ত হবে। শুধু বাংলাতেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে এ ব্যবস্থা যাতে অচিরেই অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে প্রাদেশিক জাতীয় গভর্ণমেণ্টগুলির বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশে অযোগ্য শিক্ষকের পরিবর্ত্তে ট্রেনিং-প্রাপ্ত প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াবার জন্য গুরুট্রেনিং স্কুল ছাড়াও হাই স্কুলের সংলগ্ন গুটী চল্লিশ প্রাথমিক ট্রেনিং কেন্দ্রের ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে আরো দেড় লক্ষ শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হবে এবং "দশ বা পনের বৎসর পরিকল্পনার" চাহিদা মেটাতে বছরে অন্ততঃ ১২,০০০ বার হাজার শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী উৎরানো দরকার। কাজেই শুধু পশ্চিমবঙ্গে অন্ততঃ চার পাঁচ হাজার নতুন শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী বছরে তৈরী করা আবশ্যক। অনুপযুক্ত শিক্ষকের পরিবর্ত্তে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের কাজ অখণ্ডিত বাংলাদেশে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অনেকক্ষেত্রেই যোগ্যতা সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে একটা রফা করা হয়েছিল। কিন্তু এতে আসল কাজ কিছুই হয় নি। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ গভর্মেণ্টকে ওয়ার্ধা ও বলরামপুরে যোগ্য লোক পাঠিয়ে ট্রেনিং দিয়ে আনতে হচ্ছে, যাতে করে তাদের হাতে শিক্ষা পেয়ে

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীরা ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের জীবনপথের পাথেয় দিতে পারেন। অন্যান্য প্রদেশেও শিক্ষকের যোগ্যতা ও বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে। কাগজপত্রে পরিকল্পনার অবস্থা কেটে গেছে, কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিন এসেছে।

১৯১০ সালে মহামতি গোখ্‌লে যখন সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে তাঁর বিখ্যাত প্রাথমিক শিক্ষা বিল্ উপস্থাপিত করেন, তখন থেকেই ভারতহিতৈষীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সুফলপ্রসূ কর্ত্তে হোলে তাকে শুধু অবৈতনিক কর্লে'ই চলবে না, বাধ্যতামূলকও করা দরকার। বাংলাদেশ ছাড়া আজ প্রায় প্রতি প্রদেশেই যেখানে যতটুকুন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়েছে তা মোটামুটি অবৈতনিক ; কিন্তু ফল সন্তোষজনক নয়, কারণ যেখানে পরীক্ষা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেখানেও ছাত্রছাত্রীর স্কুলে নিয়মিত আসা সম্বন্ধে সজাগ কড়া শাসনে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে বা কোন দিন সে শাসন করাই হয় নি। একথা ঠিক যে বাধ্যতামূলক পল্লী বা অঞ্চলগুলির সংখ্যা ভারতবর্ষে দিন দিন বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে পাঞ্জাবের স্থান সর্ব্বাগ্রে—প্রায় সাড়ে দশ হাজার গ্রামে ও চুয়ান্নটি সহর অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যুক্তপ্রদেশকে দ্বিতীয় স্থানের সম্মান দেওয়া যেতে পারে, সেখানে হাজার বার শ গ্রাম ও গোটা চল্লিশ সহর অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা, স্কুলে উপস্থিতি, পরীক্ষার ফল ও শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে প্রমোশন ইত্যাদির দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যায় এ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার ফল মোটেই আশানুরূপ হয় নি। যুক্তপ্রদেশেও নতুন ভর্ত্তির সংখ্যা যা হওয়া উচিত তার চাইতে অনেক কম এবং অনেক অভিভাবককে স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্ত্তি করতে মোটেই বাধ্য করা হয় না। দেখা গেছে অনেক বাধ্যতামূলক মিউনিসিপালিটিতে প্রথমশ্রেণীর শতকরা প্রায় ৮০ জন ছেলেমেয়ে

সাক্ষর হবার বহু পূর্ব্বেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। যেসব অন্যান্য প্রদেশ অল্পবিস্তর বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে তাদেরও অভিজ্ঞতা একই রকম।

এ অবস্থার জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলো বিশেষভাবে দায়ী :—ঠিক অঞ্চল মনোনয়ন না করা, অভিভাবকে রুষ্ট করবার ভয়, স্কুলে অনুপস্থিতির ঘটনা বা কেস্‌গুলোর বিচারে বিলম্ব, উপস্থিতি-কমিটী ও কর্ম্মচারীগণের শৈথিল্য ও অপারগতা ইত্যাদি। বর্ম্মাদেশের রিপোর্টে এ বিষয়ে একটী সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে "অনেকে মনে করেন যে ফাজিল দূরীকরণের উপায় হইতেছে অচিরে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিলে ফাজিল বা অপচয়ের হার বৃদ্ধি পাওয়ারই আশঙ্কা বেশী।" এ মত মেনে নেওয়া চলে না, মেনে নিলে অগ্রগতির সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষার রূপ বদ্‌লে দেওয়া যেতে পারে, তার কাঠামো বদ্‌লে দেওয়া যেতে পারে, তার ভেতর দিয়ে জনসাধারণের নিত্যজীবনের প্রয়োজন মিটিয়ে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারা যায়, অভিভাবকের কাছে তাকে ঈপ্সিত বস্তু করে তোলা যেতে পারে, বহু অর্থ এতে ঢালা যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আমরা না করি, তা হ'লে সবই ব্যর্থ হবে। আজকের পরিস্থিতিতে যেটা বিশেষ দরকার সেটা হচ্ছে আইনের সাহায্যে অপরাধীকে দণ্ড দিয়ে এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চালু করা এবং উপস্থিতি-কমিটী ও কর্ম্মচারীরা যাতে তাঁদের ওপর যে গুরুভার ন্যস্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে যাঁর যাঁর কর্ত্তব্য চক্ষুলজ্জা ও দলাদলি ছেড়ে নির্ভীকচিত্তে সম্পাদন করেন সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এ প্রত্যাশা করা নিশ্চয়ই অসম্ভব প্রত্যাশা করা নয়, জাতিকে অগ্রগতির মুখে তুলে ধরতে গেলে এতটুকুন প্রয়াস স্বীকার বোধ হয় অনেকেই করবেন। তা ছাড়া মন্ত্রীমণ্ডলী ও শাসক বর্গের হাতে এমন অনেক ছোটখাটো পুরস্কার আছে যাতে করে উদাসীন জড়প্রকৃতি

জনসাধারণকেও প্রথম অবস্থায় জাতির ভবিষ্যতের দিকে সজাগ করে তোলা যায়।

এখন দেখা যাক প্রাথমিক শিক্ষার রূপ কি হবে। এখানেও মহাত্মা গান্ধী আলোকবর্ত্তিকা তুলে ধরেছেন, যেমন ধরেছেন তিনি জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা

গান্ধীজির ওয়ার্ধা প্রস্তাব শিক্ষাজগতে তার অভিনবত্ব নিয়ে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে ; মানুষের মনকে নাড়াচাড়া দিয়ে চিরাচরিত গণ্ডীর বাইরে তাকে নিয়ে গেছে এক নতুন ভাবরাজ্যে ; আর সব চেয়ে বড় কথা যেটা—সমস্ত বাধাবিপত্তি, সমালোচনা, বিদ্রূপ, কটাক্ষ, বক্রোক্তি অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে নিজ সাফল্যের মর্য্যাদায় দুর্গত দেশের অভাবিত কল্যাণসাধনায়।

গত আট নয় বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের ভেতরে কি করে সম্পূর্ণরূপে এক নতুন পরিকল্পনা এতটা পুষ্টি ও শক্তি লাভ করল সেটা ভেবে দেখা দরকার। আমার মনে হয় কতকগুলো কারণের একত্র সমাবেশে এ অঘটন সম্ভব হয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, দেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গণমনের জাগরণ ও পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি শিক্ষিত সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান ঔদাসীন্য বা আস্থার অভাব। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার নিকষে এ পরিকল্পনা সাচ্চা সোনা বলেই উৎরে গেছে ; এক বাংলা ছাড়া (এখানে মাত্র তেইশটী বুনিয়াদী শিক্ষালয় আছে) আর সব প্রদেশেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনামত বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, বছরের পর বছর এই পরিকল্পনার মূলনীতি ধরে বিশ্বাসী মন নিয়ে শান্ত সমাহিত প্রফুল্ল চিত্তে কর্ম্মপ্রবাহ চলেছে অবিশ্রান্ত ধারায়। ফলে দেখা গেছে, হাতের কাজকে কেন্দ্র করে শিশুর বা কিশোরের সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে সৃষ্টির আনন্দের ভেতর দিয়ে এক সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষা গড়ে উঠতে পারে। এমন কি, শিক্ষার ব্যয়ভারেরও অনেকটা হাতের কাজের আয় থেকেই উঠে আসতে পারে। তৃতীয় কারণ হচ্ছে, সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় ওয়ার্ধা প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ (হাতের কাজ বা বৃত্তির ভেতর দিয়ে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ), শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ, মেধাবী

ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে উচ্চতর মানসিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ওয়ার্ধা পরিকল্পনার ভেতরই ভাবগত ও পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধীয় শিক্ষানীতি-সম্মত কতকগুলো আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্ত্তন। এই সব কারণে শিক্ষা-বিদ্গণের যে এক সময়ে ঘোরতর আপত্তি ছিল ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সম্বন্ধে, তা বহুল পরিমাণে কেটে গেছে। আজ শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, অভিজাত মধ্যবিত্ত, শিক্ষাবিদ্ অশিক্ষাবিদ্ সবাই বুঝতে পেরেছেন দেশকে তাড়াতাড়ি এগোতে হলে ব্যাপক গণশিক্ষার প্রয়োজন এবং এমন শিক্ষার প্রয়োজন যা থেকে হবে দেশের চাহিদার পূরণ, যা স্পর্শ করবে দেশের প্রাণকে, যা নিজকে মুক্ত করবে দুশ বৎসরের ঠুনকো বিলিতি সাহিত্যিক শিক্ষার মোহময় নিগড় থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও এই অনুভূতি মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে নি নানা কারণে। কিন্তু আজ শুভমুহূর্ত্ত এসেছে, দেশে স্বাধীনতার স্পন্দন শুরু হয়েছে, নতুন করে গড়ে তোলবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এসেছে প্রাণে, এ শুভলগ্ন যেন বিফলে না যায়।

এখন দেখা যাক, ওয়ার্ধা প্রস্তাবের মোটামুটি কাঠামোটা কি দাঁড়িয়েছে। দেহ ও মনের সম্যক বিকাশের জন্য হাতের কাজের ভেতর দিয়ে ৭ থেকে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত (সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষার ব্যয়ভার রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনেকাংশে গ্রহণ, কোন বৃত্তিকে কেন্দ্র করে গ্রামের বা সহরের পারিপার্শ্বিকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাতৃভাষা, অঙ্ক, অঙ্কন, সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্টিগত বিষয়বস্তুকেও (সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা ইত্যাদি) পাঠ্যসূচীতে স্থান দেওয়া, গ্রামকে প্রিয় আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বলে গ্রহণ করা ও প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের ১১।১২ বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য স্থানান্তরিত করা।* আমার মতে এ-ই

* এ ব্যবস্থা বি. জি. খের কমিটি ও সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা সম্মত, আমার মনে হয় না এতে ওয়ার্ধার তরফ থেকে কোন আপত্তি উঠবে।

ওয়ার্ধার প্রকৃত রূপ এবং এ রূপ শিক্ষাজগতের চিরআরাধ্য মূর্ত্তি, এই আদর্শের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে শিক্ষাজগতের অপরিতৃপ্ত অন্বেষী মন বহু যুগযুগান্তর ধরে; আজ এ মূর্ত্তি চোখের সামনে দেখতে পেয়ে স্বতঃই হয়েছে সে উল্লসিত, আনন্দদৃপ্ত।

হাতের কাজের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়েকে মানুষ করা রুশো প্রভৃতি শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতজনের অনুমোদিত পন্থা। এতে দেহমনের অবসন্নতা কেটে গিয়ে আসে সৃষ্টির আনন্দ, আত্মশক্তিতে জাগ্রত চেতনা, মানসিক বুদ্ধির সম্যক স্ফুরণ; দুপাতা বই পড়ার চাইতে এ যে কত বড় সম্পদ জাতির দিক থেকে তা নিতান্ত অপরিণামদর্শী ছাড়া সবাই বুঝতে পারবেন। এ হাতের কাজ নেবে নানা রূপ এবং নিত্যব্যবহার্য্য অনেক জিনিষই পড়বে তার ভেতরে, যেমন পুতুল, ব্যাজ (badge), কাপড়, গামছা, টুল, চেয়ার, টেবিল, সেল্‌ফ, মগ, বালতি, কৃষি ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক ব্যয়ের দিকটা। একথা বোধ হয় সত্যি, ওয়ার্ধা বিদ্যালয় স্থাপনা চিরপরিচিত অকেজো প্রাথমিক স্কুলগুলো থেকে অধিক ব্যয়সাপেক্ষ, যদিও এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। হিসেব করে দেখা গেছে, যে টাকা খরচ হয় স্কুলের গোড়াপত্তন কর্ত্তে, পাঁচ বছরে সে টাকা উঠে আসে স্কুলের আয় থেকে। নিম্নতম দুই শ্রেণীতেও অনেক প্রদেশেই প্রকৃত ব্যয়ের চাইতে (অর্থনীতিতে যাকে বলে Real expenditure) আয়ের অনুপাতই বেশী হয়েছে। কাজেই সত্যিকারের কোন লোকসানই নেই, যদি নিছক টাকাপয়সার দিক থেকেও জিনিষটাকে বিচার কর্ত্তে হয়।

প্রদেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে সাত-বছর-মেয়াদী একটি তাঁতের-কাজ-শেখানো স্কুল স্থাপন কর্ত্তে লাগে ৫২৫০৲ টাকা আর কৃষিকাজ-শেখানো (শেষ দুই উচ্চশ্রেণীতে) একটি স্কুল স্থাপন কর্ত্তে লাগে ৬৭৫০৲ টাকা। জমির দামশুদ্ধ লাগে যথাক্রমে ৫৫০০৲ টাকা ও ৮০০০৲ টাকা। আর এ রকম স্কুলের বাৎসরিক

খরচ (শিক্ষক মহাশয়গণের বেতনসমেত) প্রায় ৩০০০৲ টাকা। কাজেই বাংলাদেশে যদি আমরা ১০০টি স্কুল নিয়েও কাজ শুরু করি (৭০টি তাঁতের স্কুল, ৩০টি কৃষি স্কুল) তা হলে স্কুল স্থাপনার খরচ পড়বে ৩,৮৫,০০০ + ২,৪০,০০০ = ৬,২৫,০০০ টাকা এবং বাৎসরিক ব্যয় হবে ৩০০০ × ১০০ = ৩,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ সবশুদ্ধ প্রায় ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এর পর বৎসর বৎসর স্কুলের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে ফেলা যাবে। আমি শুরু হিসাবে মাত্র ১০০ স্কুলের কথা বলছি, কারণ ওয়ার্ধা ও সার্জেণ্ট পরিকল্পনা সম্মত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক আমাদের প্রদেশে নেই। তাদের ট্রেনিং দিয়ে তবে এসব স্কুল খোলা যাবে। এ বিষয়ে অধীর বা অসহিষ্ণু হলে চলবে না ; মনে প্রকৃত বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকলে আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা আশাতীতরূপে বাড়িয়ে ফেলতে পারব এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের শিক্ষার প্রসার হবে দেশের চারিদিকে, দেশের দুর্দ্দশা কেটে যাবে, সত্যিই এদেশের নরনারী মানুষ হবার পথে এগিয়ে যাবে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সম্মত দেশব্যাপী স্কুল খুলতে বহু টাকার প্রয়োজন হবে—রাষ্ট্র অর্থ সাহায্য কর্ল্লেও হবে—কারণ রাষ্ট্রের অর্থ-সামর্থ্য কোনদিনই অপরিমেয় নয়, ভবিষ্যতেও হবে বলে আশা করা যায় না, অথচ বহু অর্থের প্রয়োজন হবে দেশকে ২০ বৎসরের ভেতর নিরক্ষরতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে তাকে অনাস্বাদিত আনন্দের রাজ্যে নিয়ে যেতে। কাজেই সবাইকেই ভাবতে হবে টাকা তোলার সহজ উপায় রাষ্ট্রের পক্ষে কি হতে পারে গরীব বা জনসাধারণের ওপর কর ধার্য্য না করে। একটী উপায় স্বতঃই মনে হয়—সেটী হচ্ছে রাষ্ট্র বা ষ্টেট্ লটারী। এর বহু নজীর আছে—বিশেষ করে যেটী মনে পড়ছে সেটী হচ্ছে, আইরিশ হাঁসপাতাল সুইপ্ ষ্টেকের কথা। আয়র্লণ্ডে ভাল হাঁসপাতাল ছিল না, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। কিন্তু আজ সমস্ত আয়র্লণ্ড হাঁসপাতালে ছেয়ে গেছে। আরও বড় কথা, তার হাঁসপাতালগুলো আমেরিকার

বিশ্ববিখ্যাত হাঁসপাতালগুলোর সমকক্ষ। আয়র্লণ্ডের টাকা ছিল না, তাই শুধু হাঁসপাতালের জন্য রাষ্ট্র এই লটারীর বন্দোবস্ত করে দেশের একটা মস্ত বড় অভিযোগ দূর করেছেন। একশ স্কুল খুলতে বা বৎসর বৎসর তার সংখ্যাবৃদ্ধি করতে যে টাকা লাগবে, তার অনেকাংশ লটারী থেকেই তুলতে পারেন রাষ্ট্র—অন্ততঃ রাষ্ট্রের পুঁজিপাটার ওপর চাপটা লাঘব হবে যথেষ্ট পরিমাণে।

ওয়ার্ধা প্রস্তাব কল্পিত পাঠ্যসূচী ও বৃত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে এবার আলোচনা করব। এ বিষয়টী অত্যন্ত অভিনব, জটিল ও দুরূহ। এর বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলেছি ওয়ার্ধা পরিকল্পনার অভিনবত্ব হচ্ছে শিশুর বা কিশোরের সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং কোনো একটী বৃত্তিকে কেন্দ্র করে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা। এর সুষ্ঠু বা সম্যক পরিচয় আমরা পাই ওয়ার্ধার বিস্তৃত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য তালিকা হতে। আমাদের সাধারণ স্কুলকলেজের পাঠ্যতালিকার সঙ্গে জীবনের কোন যোগাযোগ নেই বল্লেই চলে। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিকের কোন ঘটনাবলীর কারণ দর্শাতে পারিনে, এমন কি বাড়ীর চারিদিকের গাছ গাছড়ার নাম পর্য্যন্ত বলতে পারিনে, ঘড়ি ছাড়া সময় বলতে পারিনে, রাতে পথ হারালে দিকজ্ঞানের অভাবে কষ্টের অবধি থাকে না, সৌন্দর্য্যানুভূতি নেই বলে আজ গৃহ আমাদের কদর্য্যতার আকর। কি মানুষ আমরা তৈরী হচ্ছি তা ভেবে দেখতে আমরা শিখি না বা তা ভেবে দেখতে আমাদের শেখানও হয় না। দূর দেশ দেশান্তর বা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যে যোগসূত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন তার চাহিদাও আমাদের শিক্ষায় নেই। স্কুল থেকে বেরিয়ে কি কর্ব্ব, কি হবে আমার জীবিকা, কি আমার নাগরিক অধিকার, কি আমার নাগরিক কর্ত্তব্য, কি আমার নাগরিক দায়িত্ব সমাজের কাছে—রাষ্ট্রের কাছে, সে সব বোধও জন্মাবার জন্য কোন চেষ্টা নেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। এক কথায়, চরিত্র ও শিক্ষায় যে সব গুণের সমন্বয় হলে মানুষ জীবনসংগ্রামে তলিয়ে যায় না, বুদ্ধি—

অভিজ্ঞতার স্পর্শে যে বুদ্ধি ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে, রুচি—সঙ্গীত, চিত্র ও নৃত্যকলার ভেতর দিয়ে যে সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচি গড়ে উঠেছে, সামাজিকতা—অপরের দুঃখকষ্টে সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিকতা গৃহ, গোষ্ঠী, এমন কি রাষ্ট্রের গণ্ডী ছাপিয়ে সমস্ত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, সংযম—যে সংযম প্রতি পদে অসৎপ্রবৃত্তি দমন করে, স্বার্থকে গোষ্ঠী বা দশের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করে ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে মানুষের জীবনে, ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম বিকশিত হয়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবনের শান্ত শুদ্ধ পুণ্যময় প্রতি আচরণে, স্বাস্থ্য—নিয়মিত মাংসপেশী চালনায় ও চারু দেহভঙ্গীতে যে স্বাস্থ্য হয়ে ওঠে দীপ্তিমান্, ভাস্বর, এবং সর্ব্বশেষে, বৃত্তি— যে বৃত্তি কর্ম্মকুশলতার ভেতর দিয়ে এনে দেয় মুখের অন্ন, দেহের বস্ত্র, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় —সে সব গুণাবলীর আদর্শ আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কোথায়ও স্থান পায় নি। বহু শতাব্দী পরে আজ স্থান পেয়েছে তা ওয়ার্ধার পাঠ্য ও কর্ম্মসূচীতে। অন্ততঃ একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে সমস্ত মানুষটাকে গড়বার এ-ই প্রথম প্রচেষ্টা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়। বিশদ আলোচনায় দেখা যাবে ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরিপূর্ণতা যে কিছু কিছু এর না আছে তা নয়; কিন্তু এমন ব্যাপক ও সূক্ষ্মভাবে প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশু ও কিশোরকিশোরীর জীবনকে এই-ই প্রথম দেখা। এটাই হল ওয়ার্ধা পরিকল্পনার অভিনবত্ব,—এর বৈশিষ্ট্য।

এক বৃত্তির কথাই ধরা যাক্ না কেন। বৃত্তি ছিল এতদিন শিক্ষার উপেক্ষিতা। বৃত্তির সঙ্গে যে শিক্ষার কোন সংস্পর্শ থাকত তাকে আমরা শিক্ষার পংক্তিতে স্থানই দিতুম না,—করে রাখতুম তাকে একঘরে, অস্পৃশ্য। শিক্ষার শীর্ষ্মহলে তার স্থান ছিল বাইরের অবজ্ঞাত অবহেলিত আস্তাকুঁড়ের ভেতর। Humanities বা 'Human Studies'—মানুষের যা পাঠ্য, যার পঠনপাঠনের ভেতর দিয়ে প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠতে পারে, তার রুদ্ধ দুয়ারে বহুবার মাথা খুঁড়ে মরেও প্রবেশাধিকার পায় নি এই বৃত্তি শিক্ষা।

কিন্তু আজ ভুল ধরা পড়েছে, মানুষের চোখ খুলেছে, দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। মানুষ দেখছে গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত যে শিক্ষায় নেই সে শিক্ষায় মানুষ গড়া চলে না, হা হুতাশ করা চলে তার কঙ্কাল নিয়ে, আফ্‌শোষ করা চলে সহস্র সহস্র নরনারীর দারিদ্র্যনিষ্পিষ্ট, চূর্ণীকৃত, নৈতিক আর্থিক ও দৈহিক অবস্থা নিয়ে, ধরণীতল নিষিক্ত করা যায় ভাব বা শোকের অশ্রুবিলাসে, কিন্তু মানুষ গড়া যায় না, এমন কি মানুষের প্রতিকৃতিও দাঁড় করান যায় না বিশ্বের দরবারে। তাই আজ দেউলদ্বার খুলেছে, শিক্ষার হরিজন প্রবেশ করেছে তাতে ; ভারতের শিক্ষিত জগৎ সন্দিগ্ধচিত্তে ভয়, শঙ্কা, ব্যঙ্গের রঙ্গীন কাঁচের ঠুলি পরে একটু বিস্মিত চমকিত হয়ে তাই দেখছে। কিন্তু এ জোয়ারস্রোত অনিরোধ্য, এ দাবী অনিবার্য্য, এ যুক্তি অকাট্য। তাই আজ দেশে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় অবহিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীর জীবনের বৃত্তি সম্বন্ধে। বৃত্তির সঙ্গে যে উচ্চশিক্ষারও একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে সে অনুভূতি এসেছে তাদের মনে এবং প্রতিফলিত হচ্ছে তাদের নব নবতম শিক্ষাব্যবস্থায়। আমাদের দেশে শিক্ষাজগতে এ বিপ্লব বা আমূল পরিবর্ত্তন আনবার জন্য দায়ী খানিকটা হচ্ছে বিশ্বের পরিস্থিতি, এবং বেশ খানিকটা মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা।

ওয়ার্ধার সংশোধিত পাঠ্যতালিকায় এই বিষয়গুলো রয়েছে :—

১। মাতৃভাষা

২। স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা

৩। সাধারণ বিজ্ঞান

৪। বৃত্তি

৫। অঙ্ক

৬। সঙ্গীত, নৃত্য ও অঙ্কন

৭। বাগানের কাজ, ব্যায়াম ও রুচির দেহ চালনা

এ পাঠ্যসূচী থেকে ইংরেজী বাদ পড়েছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন তার পরিবর্ত্তে যে সব ভাল ভাল বিষয়ের স্কুলে

আজকাল চর্চ্চা হয় না তা তিনি দিয়েছেন—বৃত্তি, স্বাস্থ্য, সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞান, সঙ্গীত, অঙ্কন, নৃত্য, রুচির দেহচালনা। বৃত্তির মধ্যে নিহিত আছে জীবিকাঅর্জ্জনের কৌশল, সাধারণ ও সমাজ বিজ্ঞানের ভেতর রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পরিচয়, বিশ্বের ইতিহাস বা প্রধান প্রধান ঘটনার প্রভাব আমাদের জীবনের উপরে, বিশ্বব্যাপী সামাজিকতার প্রয়োজন, নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্য ও অধিকার, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলো,—এ সব শেখার কায়দা বা প্রণালী হল দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে—দু ছত্তর বই পড়িয়ে এ বিদ্যে আয়ত্ত করার কোনো প্রয়াস নেই। তার পরে আছে নৃত্য, গীত, বাদ্য, ড্রিল খেলাধুলো ইত্যাদি। অভিনব পন্থায় এসব শেখানো বহু সময়সাপেক্ষ, তাই গান্ধীজী পাঠ্যসূচী থেকে ইংরেজী একেবারে বাদ দিয়েছেন। প্রথম কারণ—ইংরেজীর মত একটী দুরূহ বিদেশী ভাষা আয়ত্ত কর্ত্তে যে পণ্ডশ্রম হয় তাতে আর অন্য নতুন কাজ কর্ব্বার সময় বা উৎসাহ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ কর্ত্তে গিয়ে অক্ষমতা ও দৈন্যের গ্লানি সহ্য কর্ত্তে কর্ত্তে প্রকাশের শক্তি ও উৎসই শুকিয়ে যায়; এটাই হ'ল শিক্ষার দিক থেকে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের দিক থেকে সব চেয়ে বড় ক্ষতি। আপামর জনসাধারণের শিক্ষায় ইংরেজী যে বাদ পড়েছে তাতে কিছু অন্যায় হয় নি, বিশেষতঃ যখন আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আজ।

একথা ভুললে চলবে না যে গান্ধীজী ওয়ার্ধা পরিকল্পনা করেছিলেন স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য, ক্লিষ্ট, নিপীড়িত, পরমুখাপেক্ষী, বৈদেশিক উচ্ছিষ্ট-খাদ্যকণা-লোভাকাঙ্ক্ষী দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ নরনারীর জন্যে নয়। ইংরেজী বাদ দেওয়ায় যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা এ কথা কি কেউ ভেবে দেখেছেন যে স্বাধীন দেশের জনসাধারণ কি কখনো বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে? ইংলণ্ডই হউক, ফ্রান্সই হউক, জার্ম্মাণীই হউক বা আমেরিকাই

হউক—আপামর জনসাধারণ শিক্ষালাভ করে যার যার মাতৃভাষার ভেতর দিয়েই। কাজেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ আপত্তি কর্লে চলবে কেন? তবে একথা বলা যেতে পারে ভারত এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ এখনো তার রয়েছে এবং এদেশে এখনও বহু অফিস, কাছারী, সওদাগরী প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা রয়েছে যেখানে ইংরেজীর কিছু জ্ঞান ছাড়া কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না—এ কথা না মেনে চললে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং এতে দেশের ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।

এ যুক্তি যে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত তা বলা যায় না, বিশেষতঃ যখন ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষারও বেশীর ভাগ নিজ এলাকার ভেতরে নিয়ে এসেছে এবং গ্রাম ও সহরে তা সমান ভাবে চালু হবে। বৃত্তি শেখার সঙ্গে সঙ্গে অফিস, কাছারী, সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কাজ কর্ত্তে হবে না এই ধারণাই নিহিত রয়েছে ওয়ার্ধা পরিকল্পনায়। আর বিশেষ করে গ্রামের লোক গ্রামকে আদর কর্ত্তে শিখবে, আপন বলে গ্রহণ কর্ত্তে শিখবে—এই হচ্ছে রচয়িতার মনের প্রকৃত অভিপ্রায়। কিন্তু গ্রাম বা সহরের ওয়ার্ধা স্কুলে ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যদি কেউ ইংরেজী শিখতে চায় তাতে বাধা কেউ দেবে বলেও মনে হয় না। বম্বের প্রধান ও শিক্ষামন্ত্রী খেরের নেতৃত্বে যে কমিটি ১৯৩৮ সালে নিযুক্ত হয়েছিল তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন যদি কেউ অন্য স্কুলে যেতে চায় তা হলে এগার বার বৎসর বয়সে তারা ছাড়পত্র নিয়ে অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হতে পারবে। আমার মনে হয় এ বিধান তাঁরা দিয়েছেন ইংরেজী শেখার বা উচ্চ শিক্ষার চাহিদার জন্যে। এ সব স্কুলে প্রয়োজন মত ছেলেরা ইংরেজী শিখতে পার্ব্বে, যদিও ওয়ার্ধাপন্থী কারো কারো মত যে যেখানে যেখানে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হবে সে সব পল্লীতে বা অঞ্চলে ইংরেজী-শেখানো স্কুল আর থাকবে না। দেশে যে ইংরেজী-শেখানো মাধ্যমিক স্কুল একেবারে লোপ পেয়ে যাবে একথা কেউ বলছে না—বিশেষতঃ ইংরেজী যখন বিশ্বভাষার

দুটীর মধ্যে একটি। গ্রামের তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেধাবী ছাত্র বা সহরের ইংরেজী শিক্ষাকামী কোন ছাত্রকে বাধা দেওয়ার কোন কথাও এতে উঠছে না। কিন্তু আপামর জনসাধারণের জন্য যে ভারতীয় শিক্ষা তাতে ইংরেজীর কোন স্থান থাকতে পারে না তা সুনিশ্চিত। ভবিষ্যতের ব্যবস্থায় ইংরেজী বাধ্যতামূলক ও অপ্রীতিকর হবে না, অতিরিক্ত জ্ঞানের চাহিদা সে মেটাবে। ইংরেজী যারা শিখবে তাদের সংখ্যা হবে অনেক কম, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাহিত্যিক যশ, রাষ্ট্রিক প্রয়োজন, বিশ্ব-সম্বন্ধ, সওদাগরী বা কলকারখানার তাগিদে যতটুকু শেখা প্রয়োজন ততটুকুনই শেখা হবে, তার বেশী নয়। ভবিষ্যতে যে ইংরেজী শেখানো হবে সেটা হবে দুরকমের, সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক। একটু দূরদৃষ্টি থাকলেই বিষয়টা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হবে। জনশিক্ষায় ইংরেজীর অভাবে জীবনটা দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠবে বা একটা ব্যর্থতার নৈরাশ্যে ডুবে থাকবে, এ কথা ভাবা মোটেই সমীচীন হবে না।

মাতৃভাষা ঃ—

ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ভূত ঘাড় থেকে নেবে যাবার ফলে ছেলে-মেয়েরা মাতৃভাষার মাধ্যমে নানাবিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও সে সম্বন্ধে নিজেদের মনোভাব অতি সহজে প্রকাশ কর্ত্তে সক্ষম হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কথা উঠতে পারে, বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কি কি বিষয় থাকবে? সাধারণতঃ ইংরেজী বা বাংলা পাঠ্যপুস্তকে থাকে প্রতি শ্রেণীর উপযোগী মহাপুরুষ, দেশবরেণ্য নেতা বা শিক্ষাবিদ্‌গণের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, রূপকথা, গল্প, হাস্যকৌতুক, জাতীয় উৎসবাদি, স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার কথা, প্রকৃতিপরিচয়, পারিপার্শ্বিকের ভেতর দিয়ে সমাজচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা, নাগরিক কর্ত্তব্য ও অধিকার, বিজ্ঞানের নবতম দান, নানা রকম কবিতা ইত্যাদি, অর্থাৎ এক কথায় বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে শিশুর মন আকৃষ্ট করে তার নৈতিক, ভাবগত, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য গঠন কর্ব্বার প্রচেষ্টা। অনেকে একথা তুলেছেন, ওয়ার্ধা ব্যবস্থায়

পাঠ্যপুস্তকে বৈচিত্র্যের অভাব হবে, কারণ ওয়ার্ধার শিক্ষা হচ্ছে বৃত্তি-কৈন্দ্রিক শিক্ষা এবং শিক্ষাপ্রণালী হচ্ছে অনুবন্ধ প্রণালী (Method of Correlated Teaching) অর্থাৎ যে কোন বিষয়ে যা কিছু শেখানো হবে তা বৃত্তিকে কেন্দ্র করে শেখাতে হবে। এ অভিযোগ যে সত্য নয় তা বিশদভাবে পরে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। এখানে এটুকু বলে রাখলেই হবে যে ওয়ার্ধার শিক্ষা শুধু বৃত্তি-কৈন্দ্রিক নয়, শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনী বা পারিপার্শ্বিক-কৈন্দ্রিকও বটে। এ জিনিষটা অনেকেই ভুলে যান বা লক্ষ্য করেন না, তাতে বিষয়টা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। শুধু বৃত্তির উপর জোর দিতে গিয়ে, শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর কথা হয়ে যায় তাঁদের দৃষ্টিগোচরের বহির্ভূত, আর এর মধ্যে নিহিত রয়েছে যে চিত্তচমৎকারী তথ্যসম্ভার তাও। গোড়ায় গলদ থাকলে যুক্তি বা সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হবে এ আর আশ্চর্য্য কি? দুঃখের বিষয় অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে ওয়ার্ধা পাঠ্যতালিকার সঙ্গে পরিচিত না হয়ে সমালোচনা কর্ত্তে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক যাতে বৈচিত্র্যময় ও মনোরঞ্জক হয় সেজন্য এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞান এই দু'টী বিষয়ের মধ্যে যে সব তথ্য পঠনীয় বলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সে সব তথ্যেরই কিছু কিছু নির্ব্বাচন করে পুস্তকরচয়িতা শিশুমন আকৃষ্ট করবেন। সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্য তথ্যগুলি কত বৈচিত্র্যময়, জ্ঞান ও ভাবসম্পদে কত সমৃদ্ধ, কী অফুরন্ত এর সম্ভাবনা তা যে কোন শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা থেকেই সহজে বোঝা যাবে। একেবারে প্রথম* শ্রেণীর (1st Grade) পাঠ্যতালিকাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

* অতি হালে সংশোধিত ওয়ার্ধার পাঠ্যসূচী থেকে 'সমাজকথা'র প্রথম তিনটী অনুচ্ছেদ (আদিম মানুষের গল্প, প্রাচীনকালে মানুষের জীবন, দূরদেশ দেশান্তরে মানুষের জীবন) বাদ দেওয়া হয়েছে, আমার মতে এগুলো রাখা উচিত ছিল, নইলে জ্ঞানের দিকটা একরকম বাদ পড়ে যায়। অনেক প্রদেশেই ওয়ার্ধার পাঠ্যসূচী কিছু অদলবদল করে গ্রহণ করা হয়েছে, বাংলাদেশে আমরাও সেরকম করতে পারি। সংশোধিত পাঠ্যসূচীতে 'সাধারণ বিজ্ঞানে'র বিশেষ কিছু বদল

সমাজ কথা (বিজ্ঞান)

প্রথম শ্রেণী

১। **আদিম মানুষের গল্প।**

কি করিয়া সে তাহার অভাব অভিযোগ দূর করিয়া ধীরে ধীরে সভ্যতার আলো দেখিতে পাইল।

(ক) তাহার আশ্রয় স্থান—(পর্ব্বতগুহা, বৃক্ষ, হ্রদাবাসভূমি ইত্যাদি)।

(খ) তাহার পরিধেয় বস্ত্র—বৃক্ষপত্র, বল্কল, চর্ম্ম ইত্যাদির ব্যবহার হইতে ধীরে ধীরে পশম, তুলা ও রেশমের ব্যবহার।

(গ) তাহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায়—শিকার, গোচারণ ও আদিম কৃষিব্যবস্থা।

(ঘ) তাহার অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি—কাষ্ঠ, প্রস্তর, ব্রঞ্জ, ও লৌহ।

(ঙ) আত্মপ্রকাশের উপায়—কথা, আদিম লিখন ও অঙ্কন।

(চ) তাহার সঙ্গীসাথী—ঘোড়া, গোরু, কুকুর ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—আদিম মানুষের এই কাহিনী গল্প ও শিশুর কল্পমানসকে উদ্বুদ্ধ করে এমন কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

২। **প্রাচীনকালে মানুষের জীবন।**

প্রাচীন মিশর, চীন, ও ভারতবর্ষের কাহিনী নিম্নোক্তরূপ গল্পের ভিতর দিয়া শিখাইতে হইবে :—

(ক) মিশরের পিরামিড-নির্ম্মাতা সাধারণ দাসের জীবনকাহিনী।

(খ) প্রথম পঞ্চ চীনসম্রাটের গল্প।

(গ) মহেঞ্জোদারোর বালকের জীবন।

(ঘ) শুনা শেপার গল্প (বৈদিক যুগ)।

হয় নি। নতুন পাঠ্যতালিকায় সমাজশিক্ষার ব্যবহারিক দিকটার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে খুব বেশী, ইতিহাস ও ভূগোল বহুলাংশে বাদ পড়েছে।

৩। দূর দেশদেশান্তরে মানুষের জীবন।

আরবের বেদুইন, এস্কিমো, আফ্রিকার বামন, রেড্ ইণ্ডিয়ান।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই অনুচ্ছেদের বেশীর ভাগ কাজই মাতৃভাষার ঘণ্টায় গল্প ও অভিনয়ের সাহায্যে সুন্দররূপে করা যায়।

৪। নাগরিক জীবনের জন্য শিক্ষা—বিদ্যালয়ে শিশুর জীবন।

নিম্নোক্ত মনোভাব ও অভ্যাস গড়িয়া তুলিবার জন্য নাগরিক দায়িত্বসম্পন্ন কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া নাগরিক শিক্ষা দেওয়া হইবে ঃ—

(ক) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা।

(১) ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকা দেখ)।

(২) কাপড়-চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা।

(৩) মলমূত্র ত্যাগশালার যথার্থ ব্যবহার।

(৪) বাজে কাগজ ফেলিবার ঝুড়ি ও ডাষ্টবিনের ব্যবহার।

(৫) স্কুলে শ্রেণী, আলমারি, তাক, শেল্ফ্ ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা।

(৬) স্কুলে পানীয় জল সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন ও তাহার সদ্ব্যবহার।

(খ) সামাজিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

(১) শিক্ষক ও সতীর্থগণকে যথার্থ অভিনন্দন ও সম্ভাষণ।

(২) ভদ্র ও সঙ্গত ভাষা ব্যবহার।

(৩) বিনীতভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ও উত্তর দেওয়া।

(৪) বলিবার সময় এক জনের পর একজন বলা।

(৫) লাইন বাঁধিয়া বা সারবন্দী হইয়া দাঁড়ানোর অভ্যাস গঠন করা।

(গ) হাতের কাজ ও বৃত্তি শিক্ষা।

(১) শিল্পদ্রব্য ও যন্ত্রপাতির যথার্থ ব্যবহার।

(২) অপরের সহিত এ সকল উপকরণ ভাগাভাগি বা পালা করিয়া ব্যবহার।

(৩) ছোট ছোট দলের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করা।

(৪) নিজের পালার (turn) জন্য অপেক্ষা করা।

(৫) কাজের পর জিনিষপত্র যন্ত্রপাতি যথার্থ স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া শ্রেণীঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করা।

(ঘ) খেলাধুলা।

(১) ন্যায়সঙ্গত খেলা (চোরামি বা অসদুপায় বর্জ্জন করা)।

(২) দুর্ব্বলের উপর অন্যায় সুবিধা না লওয়া বা অত্যাচার না করা।

(৩) লাভ বা জয়ের উপর সত্য ও ভব্যতার স্থান নির্দ্দেশ।

(ঙ) দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করা।

উপরোক্ত কার্য্যাবলী ছাড়াও বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ; এই দায়িত্ব সে ব্যক্তিগত-ভাবে লইতে পারে বা দল ও গোষ্ঠীর সভ্য হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারে। ৭ হইতে ৯ বৎসরের ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট দলের পক্ষে নিম্নোক্ত কার্য্যাবলী উপযোগী ঃ—

(১) শ্রেণী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা।

(২) স্কুলের আঙ্গিনা বা মাঠ পরিষ্কার রাখা।

(৩) স্কুলের পানীয় জল সম্বন্ধে সতর্কতা।

(৪) স্কুল যাদুঘরের জন্য ফুল, পাতা, পাথর, পালক, বাকল, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ।

(৫) উৎসবাদির জন্য স্কুল সাজানো।

(৬) স্কুল ও গ্রামবাসিগণের জন্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা।

(৭) নবাগত ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করা।

শিশুর গৃহজীবন।

(১) গৃহ—নিয়মাজ্ঞাধীন ছোট্ট সমাজ এবং গৃহের প্রতি অধিবাসীর, (ছোট বা বড়োর) এই সমাজে নির্দ্ধারিত অংশ গ্রহণ।

গৃহে পিতা ও মাতার স্থান।

গৃহে ভাই, বোন ও নিকট আত্মীয়ের স্থান।

গৃহে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের স্থান।

গৃহে ভৃত্যের স্থান।

(২) পরিবারে শিশুর স্থান এবং ছোট ও বড়দের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য।

(৩) তাহার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যের যথাযথ সম্পাদনা।

শরীরচর্চ্চা।

(১) মাঠের খেলা এবং যন্ত্র বা সাজসরঞ্জাম-বিহীন গ্রামের সাধারণ খেলা।

(২) আনুকরণিক ও কল্পমানসিক খেলা।

(৩) ছান্দিক লীলায়িত গতি ও ব্যায়াম (Rhythmic Exercises).

(৪) লোকনৃত্য।

এই হল পাঠ্যতালিকার এক অংশ। এবার সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

সাধারণ বিজ্ঞান

প্রথম শ্রেণী

১। পারিপার্শ্বিক বা পল্লী এলাকার প্রধান প্রধান শস্য, গাছ, জীবজন্তু, প্রাণী ইত্যাদির সঙ্গে শিশুর পরিচয়।

২। সূর্য্যের গতির সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় ; বৎসরের ঋতু, ঋতু

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন-গুলির সমবেক্ষণ ; গাছপালা, প্রাণী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ ও মানুষের উপর ঋতুপরিবর্ত্তনের প্রভাব।

ক) বৎসরের বিভিন্ন সময়ে গাছপালার রং ; পাতার পতন ; চারাগাছের প্রধান প্রধান অংশ ; পত্র, মূল ও কাণ্ডের পার্থক্য পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি করা ; ভবিষ্যৎ পুষ্টির আধারস্বরূপ কন্দ (bulb) ; আলু, পেঁয়াজ।

খ) বসন্ত ও বর্ষার তুলনায় শীতে কীটপতঙ্গাদির সংখ্যা-ন্যূনতা ; বর্ষায় সাপের প্রাদুর্ভাব। শীতে উহা কোথায় অদৃশ্য হয়।

গ) ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে কাপড়চোপড়ের পরিবর্ত্তন ; বস্ত্রাদি কি করিয়া শীত বা ঠাণ্ডার হাত হইতে মানুষকে পরিত্রাণ করে।

৩। আমরা সকল সময়ে চারিদিকে বায়ু দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; বায়ু একটী প্রকৃত জিনিষ বা পদার্থ ; মানুষ বায়ুর সাহায্যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালায় ও জীবনধারণ করে ; স্কুলঘরে বা ঝড়বাতাসে বায়ু চলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

৪। জলের উৎস ও সরবরাহ (নদী, নির্ঝর, দীঘি ও কূপ) ; জলের প্রবহন, বাষ্পীকরণ ; সূর্য্য, মেঘ, শিশির ও বৃষ্টি ; বাষ্পী-ভবনের সময় জলের হ্রাসপ্রাপ্তি। (পর্য্যবেক্ষণ)

৫। আগুন বায়ুর সাহায্য ছাড়া জ্বলিয়া উঠিতে পারে না। আগুন সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক ; বস্ত্রাদিতে আগুন লাগা অবস্থায় কদাপি দৌড়াইবে না।

৬। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন করা, দেহ পরিষ্কার রাখা ; হাত, মুখ, দাঁত, নখ পরিষ্কার রাখা ; দাঁতের ব্যবহার ; কাপড়চোপড় পরিষ্করণ ; গ্রামে সহজলভ্য দ্রব্যাদির সাহায্যে বস্ত্রাদি পরিষ্করণ।

৭। আদিমযুগ হইতে মানুষ কী আগ্রহের সহিত চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে ও তাহাদের সাহায্যে সময় ও দিক্‌নির্ণয় করিতেছে তাহার গল্প।

কৃষক, পর্য্যটক, নাবিক ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের গল্প ; কি করিয়া তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা সাহায্যে নিজ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

সূর্য্য ও চন্দ্রের অস্তাচলে গমন। যে তারকাগুলি প্রভাতে অস্ত যায় তাহারাই আবার সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের অল্প পরে আকাশে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠে, ইহা শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে উৎসাহিত করা।

চন্দ্রের কলা : মাসের উজ্জ্বল ও অন্ধকার অংশ ; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সঠিক সময় ও জানালা দিয়া সন্মুখস্থ দেওয়ালে সূর্য্যরশ্মির পতন পর্য্যবেক্ষণ করা ; সূর্য্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন (২২শে ডিসেম্বর ও ২৩শে জুন)

ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাহায্যে উত্তর দিক নির্ণয় করা।

সূর্য্য ও চন্দ্র পর্য্যবেক্ষণ করা।

ছাত্রদের পর্য্যবেক্ষণের উপর জোর দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এই পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সব শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিযান বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মাতৃভাষা ও সুখপাঠ্য পুস্তক :—

সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞানের এই ব্যাপক, চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময় তথ্যাবলী থেকে মাতৃভাষায় টেক্‌সট্ বই রচনা করা যে অতি সহজ সে সম্বন্ধে বেশী বলা বাহুল্য। শিশুদের পক্ষেও যে এসব বই অত্যন্ত উপাদেয় হবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। লেখক যদি শিশুসাহিত্যিক হন তা হলে ত কথাই নেই। এ সম্বন্ধে সরকারের একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আছে। আজকাল টেক্‌সট্ বই যার খুসী সেই লেখে, এটা অনেকটা যেন ব্যবসাদারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সফল কর্ত্তে গেলে মাতৃভাষায় উত্তম শিশুপাঠ্য পুস্তকের একান্ত আবশ্যক। আজ ওয়ার্ধা বুনিয়াদী শিক্ষা রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, সেজন্য সরকারী টেক্‌সট্ বুক কমিটির তরফ থেকে শিশুসাহিত্যিক, প্রসিদ্ধ লেখক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের

একটি প্যানেল বা নামের তালিকা প্রস্তুত করা অত্যন্ত আবশ্যক—শুধু তাঁরাই শিশুদের পুস্তক লিখতে পার্ব্বেন, অন্যে নয়। এতে জুলুম বা জবরদস্তি কিছু নেই, ভবিষ্যতের দিক চেয়ে, জাতির কল্যাণের দিক চেয়ে এ ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। আজকাল বেশীর ভাগ পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পক্ষে উপযোগী নয়। এসব বই পড়ে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মে না, জাগে বিতৃষ্ণা। আজ যে জ্ঞান আহরণ বিষয়ে এত ঔদাসীন্য ছাত্রসমাজে, সে কি খানিকটা আমাদের চলিত পাঠ্যপুস্তকের দোষে নয়? প্রয়োজন হয়, সরকার নিজে এ সকল পাঠ্যপুস্তক ভাল লোক দিয়ে লিখিয়ে প্রকাশ কর্ব্বেন। যে ব্যবস্থাই হোক, নিকৃষ্ট বই ছেলেমেয়েদের হাতে আর দেওয়া যাবে না, একথা ঠিক।

সুলেখক দ্বারা যদি এসব বই লেখানো হয় তা হলে এই নানা প্রকারের গল্প ও তথ্যসম্বলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব্বেই বলেছি যাঁরা সন্দিহান তাঁদের হয়ত চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই ওয়ার্ধার পাঠ্য-বিবৃতির সঙ্গে।

স্বাস্থ্য, সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞান ঃ—

ওয়ার্ধা পাঠ্যতালিকার আরেকটী বিশেষ দিক হচ্ছে প্রথম থেকেই শিশুর জীবনের সঙ্গে এ বিষয়গুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। স্বাস্থ্য, সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞানের যে পাঠ্যবিবরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে এ স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। সব চেয়ে বড় কথা স্বাস্থ্য, তারপর মানুষের ভেতর সমাজবোধ জাগিয়ে দেওয়া ও তার পারিপার্শ্বিকের তাৎপর্য্য খুঁজে পাওয়া। ছোটবেলা থেকেই শিশু যেন বুঝতে শেখে যে সে এই সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ; তার যেমন অধিকার আছে, অন্যের প্রতি তার দায়িত্বও আছে, শুধু স্বার্থের বশবর্ত্তী হয়ে নিজের খেয়ালে চললে জাতির অধঃপতনই হয়, অগ্রগতি হয় না। এ অনুভূতি এনে দেবার চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে 'সমাজ-বিজ্ঞান' পাঠ্য-

তালিকায়। লাইন বেঁধে বা সারিবন্দী হয়ে দাঁড়ানো, অন্যে কথা বলার সময় কথা না বলা, যার যার পালার জন্য অপেক্ষা করা, বাড়ী বা স্কুলের মাঠে সামান্য কাগজের টুকরোও পড়ে না থাকতে দেওয়া, কাজের পর জিনিষ পত্র গুছিয়ে রাখা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হওয়া ইত্যাদি যে সব শিক্ষা এ ব্যবস্থায় রয়েছে তার পূর্ণ অভাব কি বয়স্কদের ভেতরও আজ লক্ষিত হয় না? এগুলো ছোট ছোট বিষয় হতে পারে, কিন্তু এগুলোই জাতীয় মহীরুহের অঙ্কুর। এ সব শিক্ষণীয় বিষয় বাদ পড়াতেই সমস্ত জাতি আজ স্বার্থান্ধ ক্ষীণবল হয়ে পড়েছে, তাই চারিদিকে দ্বেষাদ্বেষি, হানাহানি, চোরা বাজার, জগৎময় বিপ্লব। জগতের সভ্যতা যে অন্যের অধিকারের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে সত্য উপলব্ধি করার ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষায় এতদিন ছিল না, ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় প্রথম আজ তার অবতারণা করা হয়েছে। সে শিক্ষা সফল হবে কিনা সেটা নির্ভর কর্ব্বে যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁদের ঐকান্তিকতার উপর, তাঁদের অনন্যমনা চেষ্টার উপর।

ইতিহাস ভূগোলের আলাদা করে অবতারণা করা হয় নি এ পাঠ্য-বিবৃতিতে, সমাজবিবর্ত্তনের তারা প্রধান অঙ্গ, এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাদের উপস্থাপিত করা হয়েছে গল্প, নাটক ও শিশু মনস্তত্ত্বের সাহায্যে, এতে সময়-তারিখ-সম্বলিত যে ইতিহাস ও বহু সংজ্ঞা ও নামাকীর্ণ ভূগোল চিরদিন শিশুর নিকট অত্যন্ত নীরস ও ভীতিকর হয়ে উঠতো, তা হয়ে উঠেছে সরস, প্রাণবন্ত, হৃদয়গ্রাহী।

বিজ্ঞানশিক্ষায় পর্য্যবেক্ষণ, চিন্তাশক্তি ও অভিযানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কারণ এ ছাড়া জগৎ ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থেকে যায় অত্যন্ত অস্পষ্ট, আব্‌ছা এবং এই প্রত্যক্ষজ্ঞান ও চিন্তাশক্তির স্বল্পতার জন্যই শুধু ভারতেই নয়, জগতের অন্যান্য দেশেও উদ্ভাবনী শক্তির আজ একান্ত অভাব হয়েছে। পাশ্চাত্যের যে সব দেশে সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে বা যাচ্ছে সে সব দেশে প্রথম থেকেই পারিপার্শ্বিকের সম্যক পর্য্যবেক্ষণ ও তাৎপর্য্য

গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। ভারত এক সময় জ্ঞানগরিমায় জগতের শীর্ষদেশে ছিল, তার মূল কারণ ছিল জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও চিন্তা। বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ পড়লে বোঝা যায় কত গভীর ও সূক্ষ্ম ছিল তাঁদের প্রকৃতিপরিচয় ও জীবনদর্শন! সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফলেই তাঁরা এই জড়জগতের ও জীবনের বহু সত্য নির্দ্ধারিত করে গ্রন্থাদি রচনা কর্ত্তে সক্ষম হয়েছিলেন। যদি জাতির সৃজনীশক্তি আবার পুনরুজ্জীবিত কর্ত্তে হয় তা হলে প্রত্যেকের পক্ষেই এ রকম শিক্ষাব্যবস্থার অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও গ্রহনক্ষত্রাদি ও সামাজিক সংস্কারের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং এ পারিপার্শ্বিক প্রভাব ছাড়িয়ে উঠবার ক্ষমতা কি করে আমাদের গড়ে ওঠে সে পথও এ পাঠ্যতালিকায় সুন্দররূপে দেখানো হয়েছে। সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে প্রকৃত মানুষ তৈরী কর্ব্বার চেষ্টা আমাদের দেশে এই প্রথম। সম্প্রতি ওয়ার্ধা বুনিয়াদী শিক্ষার সংশোধিত যে পাঠ্যতালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে 'সামাজিক বিজ্ঞান' কথাটা না থাকলেও, সামাজিক শিক্ষার উপর আরো বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

বৃত্তি :—গান্ধীজী স্থির করেছিলেন—যে বৃত্তি বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হবে সেটী এমন হওয়া চাই যাতে করে তা থেকে নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ সম্ভবপর হয় এবং ছাত্রছাত্রীর মনের ও চারিত্রিক উৎকর্ষ ঘটতে পারে, বিশেষ করে এ বৃত্তির যোগ থাকা চাই গ্রামের বা সহরের জীবন ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে। "সমগ্র গ্রাম সেবা" হচ্ছে ওয়ার্ধা বুনিয়াদী শিক্ষার মূল মন্ত্র, কাজেই যে বৃত্তি শেখাতে হবে তার সঙ্গে পল্লীর যোগসূত্র স্থাপিত না হলে সে শিক্ষা হবে প্রাণহীণ, অন্তঃসারশূন্য। এই মাপকাঠিতে জাকির হুসেন সাহেবের কমিটি কয়েকটী বৃত্তির অনুমোদন করেছেন :—১। সুতোকাটা ও তাঁতের কাজ ২। কৃষি ৩। কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ ও ধাতুর কাজ। সুতো

কাটা ও তাঁতের কাজের ভেতর দিয়ে স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলোর অনেক তথ্য শেখা যায় ও সাধারণ মানুষ ও কৃষকের জীবনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলে, গান্ধীজী এই বৃত্তিকেই বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে অন্যতম স্থান দিয়েছেন। কৃষিকার্য্যও ভারতের শতকরা ৮০ জন গৃহস্থের অন্নসংস্থান করে, কাজেই সে বৃত্তিরও খুবই দরকার। তবে কৃষিকাজ করা খুব অল্প বয়স থেকেই সম্ভব নয় কারণ এখানে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে, ষষ্ঠ-শ্রেণীতে পদার্পণ না করা পর্য্যন্ত (১২ বৎসর বয়স না হলে) কৃষিকার্য্য করা সম্ভবপর নয়, তাই কৃষিবৃত্তিস্কুলে নীচের ক্লাসে বাগান, 'ক্ষেতি' ইত্যাদির হাল্কা কাজ শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবিশ্যি এর মানে এই নয় সুতোকাটা ও কাপড়-বোনা-স্কুলে নিজেদের তরিতরকারির প্রয়োজনে বাগানের বা ক্ষেতের কাজ হবে না, এর তাৎপর্য্য এই যে শুধু এটাকে মূল বৃত্তি করা হবে না। বাগানের কাজ যে কোন বৃত্তি-অবলম্বী শিক্ষালয়েই ছাত্র-ছাত্রীর অবশ্য করণীয়; তাতে শুধু প্রকৃতির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় বা স্বাস্থের উন্নতিই হয় না, নিজের প্রয়োজনের চাহিদা মিটিয়ে স্রষ্টা বা উৎপাদকের গৌরবও উপলব্ধি করবার সুযোগ মেলে।* এই স্বাবলম্বন আজ পুঁথিগত শিক্ষায় একেবারে অবিদ্যমান, ত্বরায় এর বিহিত করা প্রয়োজন। সহরের বা সহরের নিকটবর্ত্তী স্কুলগুলোতে স্থানীয় পরিবেশ বিবেচনা করে কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ বা ধাতুর কাজ বৃত্তি হিসেবে ধার্য্য করা যেতে পারে।

পূর্ব্বেই বলেছি বৃত্তি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু শ্রেষ্ঠ কারিগর তাঁতী বা মিস্ত্রী হয়ে জীবিকা অর্জ্জন কর্ত্তে শেখা এই নয়; বৃত্তি শেখার ভেতর দিয়ে নানাবিষয়ে সহজ নৈসর্গিক উপায়ে জ্ঞান আহরণ করে, বৃত্তির নানা অংশের তাৎপর্য্য ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ

---

* সংশোধিত পাঠ্যতালিকায় বাগানের কাজ আবশ্যিকভাবে প্রতি শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

উপলব্ধি করে ও সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকুশলতা ও উচ্চাঙ্গের সৃজনীশক্তি আয়ত্ত করে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধনই ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বৃত্তি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ আদর্শ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের এবং এতে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ; কিন্তু এ আদর্শ অনুসরণ কর্ল্লে খানিকটা যে উপকার হবেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই এ পরিকল্পনায় অনুবন্ধ (Correlated teaching) শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যথাসম্ভব বৃত্তিগত শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে অন্যান্য স্কুল-পাঠ্য বিষয়ের তথ্যাবলী ছাত্রছাত্রীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয় (যেমন সুতোকাটা ক্লাসে তুলো কোথা থেকে আসে, কি অবস্থায় হয়, কতটা তুলোয় কতটুকু সুতো হয়, তুলোর জন্য ইতিহাসে কি কি সংগ্রাম হয়েছে, তুলো থেকে জামা বস্ত্রাদি কিভাবে তৈরী হয়, এসব আলোচনা ও তুলোর বীজকোষ ইত্যাদির ছবি আঁকা)। একটা আপত্তি এতে তোলা হয় এই যে ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, সমাজবিজ্ঞান, অঙ্কন ইত্যাদি এ থেকে শেখা হয়, তার গণ্ডী হয়ে পড়ে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং শিক্ষনীয় বিষয়ে অনেক বড় বড় ফাঁক থেকে যায়। এ যুক্তি সমীচীন হ'ত যদি অনুবন্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে যতটুকুন শেখানো যায় তার বাইরে জ্ঞান আহরণের জন্য যাওয়ার বাধা থাকতো। বস্তুতঃ তা নেই, প্রত্যেক প্রধান বিষয়ে (অঙ্ক, মাতৃভাষা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে) স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী আছে এবং তাতে অনুবন্ধ প্রণালীতে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে যা আনা যায় তার চাইতে অনেক বেশী তথ্যরাশি রয়েছে। হয়ত সাধারণ স্কুলের পাঠ্যসূচীর মত অত বিশদভাবে নেই, কিন্তু তাতে ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হচ্ছে। জ্ঞানের ভারে অর্থাৎ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই না বুঝে মুখস্থের চাপে আমাদের ছেলে মেয়েরা একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে পড়ছে, যদি কাজের ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী আহরণ কর্ব্বার একটী ব্যবস্থা

করা হয়ে থাকে, তাতে আপত্তি আমাদের না হয়ে হও
আনন্দ। অন্ততঃ একে একবার পরীক্ষা করে দেখা উচি
ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে এটা কেউ কল্পনাও করে না যে সব
স্কুলে একই ভাবে, একই প্রণালীতে শিক্ষা হবে, তা হলে হয়
একটা প্রাণহীন সমতার চাপে ছাত্রছাত্রীর বিশেষত্ব ও স্বকীয় প্রতি
বিনষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালিত বেশ কিছু সংখ্যক স্কুলে
এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় তা নিয়ে বাগবিতণ্ডা করা চলে
একথা ঠিক এই অভিনব প্রণালীতে শিক্ষা দিতে গেলে সেবাব্রতী
উঁচুদরের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর একান্ত প্রয়োজন এবং সে দি
আমাদের অবিলম্বে তৎপর হওয়া উচিত। নঈ তালিমের প্র
অন্তরায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।

বৃত্তিশিক্ষা বিষয়ে ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় আরেকটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়—সেটি হচ্ছে কাজের প্রতি শ্রদ্ধা। যে কাজটি ছেলেমেয়ে কর্ব্বে সে সেটিকে সুষ্ঠুরূপে কর্ব্বে, কাজেই বৃত্তির কাজ বালকবালিকা, কিশোরকিশোরী অতি শীঘ্র অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং তাে কর্ম্মকুশলতা ও পারদর্শিতা লাভ করে; অন্ততঃ তারা এ কাজ দাসত্বপ্রথার নামান্তর বলে যে ঘৃণা করে না সেকথা অতি সা কারণ তা যদি হোত তাহলে স্কুলের নিয়মিত কর্ম্মসূচীর বাই ছেলেমেয়েদের বৃত্তির কাজ কর্ত্তে এতটা উৎসুক হতে দেখা যেত ন

ওয়ার্ধা বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আরেকটী আপত্তি ওঠে বৃত্তির কাজে বড় বেশী সময় দেওয়া হয়; দৈনিক ৫½ ঘণ্টা কাে ভেতর বৃত্তিশিক্ষায় ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাখা হয়েছে। এর প্র কথা হচ্ছে বৃত্তিশিক্ষার মূল স্বরূপটী যাঁরা বুঝতে পেরেছেন তাঁর জানেন যে এসময় শুধু বৃত্তিশিক্ষায় দেওয়া হয় না, বৃত্তিকে কেন্দ্র করে যা কিছু শেখানো হয় তাতে অর্থাৎ পঠনীয় বিষয়ে, খানিকটে দেওয়া হয় এবং খানিকটে দেওয়া হয় হাতেকলমে কাজ শেখায়। দ্বিতীয় কথা, বৃত্তিগত বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার বিধি দেওয়া হয় নি—এই সময়কে ভেঙ্গে সকালে কিছু বিকেলে কিছু করে

জিনিষটা একঘেয়ে হবার কোন আশঙ্কা থাকে না—বিশেষ
অনুবন্ধ প্রণালী অনুসরণ কল্লে জিনিষটা সব সময়ই জীবন্ত
রস হয়ে ওঠে। তৃতীয় কথা, এই ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ধরে বৃত্তির
াজ যে কর্ত্তেই হবে তার কোন নির্দ্দেশ দেওয়া নেই। এই সময়টা
বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষার চরম সীমা অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম্। এর কম
দিলে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতার ফলে
গেছে যে বহু স্কুলে বৃত্তিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট দিয়েও বেশ
সুফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ে নিছক জ্ঞানের দিকটাও
অবহেলিত হয়নি। কাজেই এ নিয়ে মিছে মাথা ঘামানো
হয় ঠিক নয়।

কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে সত্যিকারের যেটা আপত্তি হতে
পারে সেটা হচ্ছে এত অল্প বয়সে একটা বিশেষ বৃত্তি ছেলেমেয়েকে
বেছে নিতে হবে কেন? সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় তাই বার বছরের
াগে কোন বিশেষ বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, ছোট বয়সটা বিবিধ
তের কাজ করে নিজের সুপ্ত সৃজনীশক্তিকে জাগ্রত করে
কারের তার কি ভাল লাগে সেটা স্থির কর্ব্বার একটা সুযোগ
দেওয়া হয়েছে। 'থিওরির' দিক থেকে হয় ত এর কোন উত্তর
উত্তর হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মনীতির আনন্দের দিক্ থেকে।

চারুকলা :—সমবেত সঙ্গীত, চারু অঙ্গ চালনা, নৃত্য, গান,
া ইত্যাদি শান্তিনিকেতনের মত ওয়ার্ধার পাঠ্যসূচীতে অন্যতম
ন অধিকার করেছে। আনন্দের ভেতর দিয়ে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা
বেদের এই মূলমন্ত্র ওয়ার্ধায় মূর্ত্তরূপ ধারণ করেছে। সঙ্গীত যে
নুষের আত্মাকে তার কামনার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ভগবানের
সাথে মিলিত কর্ত্তে সক্ষম হয় সে স্বীকৃতি ওয়ার্ধা-ব্যবস্থায় আছে
এবং গ্রীক শিক্ষাবিদ্ প্লেটোর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।
মহাত্মা গান্ধী তাই বলেছেন "আমি হয়তো সাধারণ স্কুলে যা পড়া
হয় তার সবটা দি নাই, কিন্তু এমন অনেক ভালো জিনিষ দিয়েছি
যার স্বাদ সাধারণ স্কুলের ছেলেমেয়ে কোনদিন পায়নি।"

ধর্ম্ম ও সমগ্র গ্রাম সেবা—এ জিনিষটা সবচেয়ে বড় এবং সে জন্য একে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে এর অবমাননা করা হয়নি —ধর্ম্ম ও সেবা হোল নঈ তালিমের ভিত্তি এবং স্কুলের দৈনন্দিন কাজে এবং স্কুলের জীবনের পরেও এর প্রভাব এ ব্যবস্থায় অপরিসীম। ধর্ম্ম, সেবা ও সমবায়প্রণালীর ছাপ স্কুলের প্রতি কাজে; দিনের কাজ শুরু ও শেষ হয় উপাসনা করে, যা কিছু করা হয় সবই যৌথ ও সমবায় প্রণালীতে সম্পন্ন করা হয় এবং শুধু স্কুলকেই সেবা নয়, স্কুলের আশে পাশে গ্রামের সেবা করাই ওয়ার্ধার প্রধান উদ্দেশ্য।

যে সেবাধর্ম্ম ভারতকে একদিন সভ্যতার উচ্চশিখরে স্থান দিয়েছিল তারই একান্ত অভাব হওয়াতে আজ ভারতে এত স্বার্থের হানাহানি। আমাদের ঐতিহ্য আমরা ভুলে গেছি, পাশ্চাত্যের ব্যক্তিত্বের গরল গিলে যার যার সুখ সুবিধে নিয়ে অত্যন্ত উন্মত্ত হয়ে পড়েছি। প্রতিবেশী বা সমাজের অন্য দশজনার কি হোল তা তাকিয়ে দেখবার সময়টুকু আজ আমাদের নেই। এর প্রকৃষ্ট প্রতিষেধক হচ্ছে সমাজ ধর্ম্মের, সেবা ধর্ম্মের আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। নঈ তালিমে সেই আদর্শেরই অবতারণা করা হয়েছে, গ্রহণ করবার অভিরুচি, শক্তি, সাহস বা স্বার্থত্যাগ হয়তো আমাদের আজ নেই, কিন্তু জাতিকে উন্নত কর্ত্তে হলে এ আদর্শকে আমাদের গ্রহণ কর্ত্তেই হবে।

সাত বছর নঈ তালিম * চালানোর ফলের কথা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ কর্ব্ব। সম্প্রতি সেবাগ্রাম থেকে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তা থেকে দেখা যায় বম্বে, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর, উড়িষ্যা এবং ওয়ার্ধা ও জামিয়া মিলিয়া, দিল্লী, প্রভৃতি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এ প্রণালীতে সাত বৎসর ধরে শিক্ষা চলেছে এবং শিক্ষাবিদ্‌গণের মতে আশাতীত সুফল লাভ

---

* নঈ তালিমের রোজ-নামচা পরিশিষ্টাংশে দ্রষ্টব্য

করেছে। বিহারের অনুন্নত চম্পারণ জেলায় পর্য্যন্ত যে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে প্রত্যেক শিক্ষাবিদের মনেই আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। চম্পারণে নঈ তালিমের এই গুণগুলো বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—

১। বৃত্তিশিক্ষায় উঁচুদরের পারদর্শিতা।

২। কর্ম্মের ভেতর দিয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলাজ্ঞান লাভ।

৩। পড়াশুনোর ভেতর দিয়ে ধীশক্তির সন্তোষজনক বিকাশ।

৪। উৎসাহ ও কর্ম্মানুরক্তি; আলস্য ও ঔদাস্য ত্যাগ; স্বাবলম্বন।

৫। একটানা কাজ করবার ক্ষমতা, (আরও অগ্রগতি হওয়া দরকার)।

৬। কাজকে কাজ হিসেবে ভালবাসা 'work for work's sake.'

৭। কৌতূহল ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি; (আরও অগ্রগতি হওয়া দরকার)

৮। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যোগস্থাপন।

৯। সমবায় প্রণালীতে কাজ করা ও সেবাধর্ম্ম।

১০। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও স্বাবলম্বন (চাকর ইত্যাদি না রাখা)-গ্রামের নোংরা ইত্যাদি পরিষ্কার কর্ব্বার জন্য 'শ্রম সপ্তাহ'।

১১। কাজের পর জিনিষপত্র পরিপাটিরূপে গুছিয়ে রাখা।

১২। নাটক, সঙ্গীত ও বিতর্কের ভেতর দিয়ে নিজকে প্রকাশের ক্ষমতা।

১৩। সমগ্র ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের দিকে আশাপ্রদ অগ্রগতি।

বিহারের সাধারণ স্কুলের ও বুনিয়াদী স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তা নিয়েও গবেষণা করা হয়েছে। এথেকে আমরা দেখতে পাই যে পঠন, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞান (ইতিহাস ও ভূগোল) এই বিষয়গুলোতে বুনিয়াদী

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ স্কুলের ছেলেমেয়েদের চাইতে অনেক ভাল করে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও দেখা যায় খরচখরচা বাদ দিয়ে স্কুলের বাৎসরিক আয় দাঁড়ায় (দুবৎসর কাজের পর) এক হাজার একশো পঁচিশ টাকা। যে দিক্ দিয়েই দেখা যাক্, ওয়ার্ধার নঈ তালিম শিক্ষাজগতে যে এক অভিনব বিপ্লবের সৃষ্টি করে আলোকবর্ত্তিকা তুলে ধরেছে তা অত্যন্ত মন্দবুদ্ধিও অস্বীকার কর্ব্বেন না।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন

সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা

প্রত্যেক বড় যুদ্ধের পর মানুষের মনে স্বতঃই এ প্রশ্নটা জাগে :— কেন এত দ্বন্দ্ব, কেন এই হানাহানি, কেন এই নিরর্থক নৃশংস বিরাট হত্যাকাণ্ড, প্রশ্ন জাগে, মানুষের নির্লজ্জ স্বার্থ কি মানবতাকে আজও ছাপিয়ে উঠতে পারে? যদি পারে, তাহলে মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ তার দিগ্বিজয়ী জ্ঞানের সঙ্গে চলতে পারেনি সমান তালে পা ফেলে, আছে শুধু তার বাইরের জলুস, ভেতরে নেই তার সংস্কৃতির স্নিগ্ধ আলো। তাই মনে জাগে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সমস্ত মানব জাতিকে পুনর্গঠন কর্ত্তে, তাকে নবজন্ম দিতে, তাকে অসত্যের পথ থেকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে। এ প্রয়াস, এ আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় শিক্ষা ও জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে, কারণ একমাত্র শিক্ষাই যে প্রকৃত মানুষ গড়ে তাকে তার গৌরবময় চরম পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারে তা অবিসংবাদিত। তাই দেখতে পাই 'নেপোলিয়নিক মহাযুদ্ধে'র পর সমস্ত ইউরোপের পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন। ১৯১৪—১৮ মহাযুদ্ধের পর দেখতে পাই ইংলণ্ডে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের আন্তরিক প্রচেষ্টা (ফিশার আইন ১৯১৮), আর এই দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পর দেখতে পাই ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ দুই দেশেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্ত্তন করার ব্যগ্র প্রয়াস— ইংলণ্ডে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন, ভারতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বা সার্জ্জেণ্ট শিক্ষাপরিকল্পনা।* যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শঙ্কাগ্রস্ত

---

* সংক্ষিপ্ততা ও সুবিধার জন্য এই পরিকল্পনাকে সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের মনীষী ও শিক্ষাবিদ্‌গণের, পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার অধ্যায় বিশেষভাবে

স্তম্ভিত মানব আজ শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরেছে তাকে নতুন জীবনাদর্শ দিতে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যেতে।

ভারতের পক্ষে সার্জেণ্ট পরিকল্পনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর আগে যে শিক্ষা-সংস্কারের কোন প্রচেষ্টা এ দেশে হয়নি তা নয়, চেষ্টা নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু তা ব্যাপকভাবে হয়নি; কোন কোন প্রদেশ সংস্কার-মুখীন হয়েছে বা শিক্ষার এক একটা বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে সংস্কারের চেষ্টা করেছে, তাতে ফল হয়নি শুভ; কারণ জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় শিক্ষার সম্পূর্ণ চেহারাটা আমরা কোন দিনই দেখতে পাইনি। সমস্ত ভারতব্যাপী, শিক্ষার প্রতি স্তর আবেষ্টন করে জাতীয় শিক্ষা বলে এতদিন কোন ব্যবস্থা কেন, কোন পরিকল্পনাও ছিল না; বহু চিন্তা-প্রসূত, ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌গণের মানসোদ্ভূত সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রথম সে অভাব দূরীভূত হয়েছে। নার্সারি স্কুল থেকে নিরক্ষর বড়দের ও হীনবুদ্ধি ক্ষীণ-শক্তি শিশুদের শিক্ষা পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্তরের সমস্যা দূরীকরণের খরচ-খরচা সমেত এই প্রথম দলিল বলে এর মূল্য খুব বেশী। এর মূল্য আরও বেড়ে গেছে আমাদের চোখে কারণ এমন অনেকগুলো বিষয় নিয়ে এতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে যা আমাদের দূরদৃষ্টির অভাবে ছিল এতদিন শিক্ষার গণ্ডীর বাইরে কিন্তু যা আজ আমরা শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই ধরে নিয়েছি যেমন ডাক্তার দিয়ে স্কুলে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা, তাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যায়াম ব্যবস্থা, অবসর সময় বিনোদনের জন্য সামাজিক আমোদ-প্রমোদ ও চারুকলার প্রবর্ত্তন, বেকার সমস্যা মোচনের জন্য "কর্ম্ম দপ্তর" খোলা ইত্যাদি। ✓সার্জেণ্ট পরিকল্পনা খুবই ব্যাপক ও বিরাট এবং এজন্যই পূর্ব্বগত বহু আংশিক ও বিভিন্ন সময়ে লিখিত

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার নিকট ঋণী, এবং ওয়ার্ধার মূল আদর্শ নিয়েই রচিত। সার্জেণ্ট সাহেব ভারত সরকারের শিক্ষোপদেষ্টা ছিলেন, এ পরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁর হাতও যথেষ্ট ছিল, তবে ভারতের অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌গণের বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে এই ব্যাপক রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না।

রিপোর্ট, পরিকল্পনা ও দলিলদস্তাবেজকে ছাপিয়ে উঠেছে এর বিশেষত্ব ও তাৎপর্য্য। ভারতবর্ষে বহুদিন এ শিক্ষাজগতের খোরাক যোগাতে সমর্থ হবে।

সার্জ্জেন্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমস্ত জীবনের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা। তাই এ শিক্ষা শুরু হয়েছে খুব ছোট বয়স থেকেই; রাষ্ট্রঅর্থচালিত নার্সারী ও শিশু স্কুলের প্রস্তাব আমাদের দেশে একেবারে নতুন। তিন বছর থেকে পাঁচ বছর বয়সের গ্রাম ও শহরের শিশুদের জন্য উপদেষ্টা কমিটি এ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন যাতে করে তারা পরবর্ত্তী আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য (৬ থেকে ১৪ বৎসর) তৈরী হতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্য,—শিক্ষার মূল ভিত্তি,—গড়ে উঠতে পারে। যে সব শহরে সাধারণ লোকের থাকবার বাড়ী ঘর অত্যন্ত নোংরা ও স্বল্পপরিসর এবং শিশুর জননীকেও দিনের বেলা কাজে বেরুতে হয়, সে সব জায়গায় মাঠ ও উদ্যানসম্বলিত ঝক্ঝকে তক্তকে বাড়ীতে আনন্দময় নাচগান, উপযুক্ত বিশ্রাম ও খাদ্য এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিচয়ের ভেতর দিয়ে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর হাতে শিক্ষার যে বিশেষ দরকার আছে সে বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। এ শিক্ষা অবৈতনিক কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়, তবে অভিভাবক ও শিক্ষাকর্ম্মীদের যাতে ছেলেমেয়েরা এ সব স্কুলে আসে সে বিষয়ে বিশেষ তৎপর হওয়া দরকার। সমস্ত ভারতে এই বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ, তাদের এক তৃতীয়াংশের কিছু কমের জন্য (দশ লক্ষের জন্য) কমিটি সম্প্রতি এ ব্যবস্থা করেছেন এবং ব্যয়ের হার ধার্য্য করেছেন তিন কোটি আঠারো লক্ষের কিছু ওপরে।

এ টাকা ব্যয় করা নেহাৎ দরকার যদিও এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কমিটি এ ব্যবস্থা করেছেন শিশুর স্বাস্থ্য ও পরবর্ত্তী শিক্ষার জন্য; আমার মতে ঠিক জিনিষটার ওপর তাঁরা জোর দেন নি, দিলে হয়তো এ কথা উঠতো না যে নার্সারি ও শিশু স্কুল শুধু শিক্ষার বিলাস মাত্র, এ বড়লোকের চলে, গরীব দেশের এ সাজে না,

আরো কত কী! বরং জিনিষটা ঠিক উল্টো, রাশিয়াতেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে। শিশু ও নার্সারি স্কুলের অন্যতম প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে শিশুজীবনের চাহিদার ভেতর, তাই এ ব্যবস্থা অতি আধুনিক মনস্তত্ত্বসম্মত। মনোবিদ্‌দের জীবনদর্শন ও বিশ্লেষণ থেকে আমরা আজ একথা জানি যে এক থেকে পাঁচ বছর অবধি শিশু যে নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা বা স্বাস্থ্য লাভ করে তারই প্রভাব তার জীবনে অনপনেয় ভাবে চিরদিনের মত বিস্তৃত হয়ে পড়ে, পরবর্ত্তী শত ভাল শিক্ষাও তার এই প্রথম পাঁচ বছরের খারাপ শিক্ষাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না বা খুব কম ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়। অর্থাৎ শিক্ষার বীজ এই প্রথম পাঁচ বৎসরেই উপ্ত হয়, ভবিষ্য জীবনে তারই ঘটে চরম পরিণতি, সে বীজের প্রাণশক্তিকে তার গতিপথ থেকে অন্য পথে পরে চালনা করা অত্যন্ত শক্ত, এমন কি অসম্ভব, তাই প্রথম পাঁচ বছরে শিশু পরে কি রকম মানুষ হবে তা প্রায় বিধাতার ললাটলিখনের মতই অনিবার্য্যভাবে নির্ধারিত হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের একথা মেনে নিলে শিশু ও নার্সারি স্কুল সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ থাকে না।

✓পরবর্ত্তী শিক্ষার জন্য সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার নিরঙ্কুশ বিধি :—ছ থেকে চোদ্দ বৎসর বয়স অবধি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ; ৬ থেকে ১১ বছর পর্য্যন্ত পাঁচ বছর নানারকম হাতের কাজের ভেতর দিয়ে নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলে [Junior Basic (Primary) School] শিক্ষা এবং ১১ থেকে ১৪ অবধি তিন বছর উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলে [Senior Basic (Middle) School] বৃত্তিমূলক শিক্ষা। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সঙ্গে এর প্রভেদ হচ্ছে ওয়ার্ধা প্ল্যানে প্রথম থেকেই বৃত্তিকৈন্দ্রিক আত্মসিদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় নানারকম হাতের কাজের ভেতর দিয়ে প্রথম পাঁচ বছর শিশুর হাত, পা, চোখ ও মস্তিষ্কের সমন্বয় করে তার চিত্তকে সরস ও সতেজ করে তোলা এবং শেষের তিন বছরে (১১ থেকে ১৪ বছর) তাকে তার মনোমত যে কোন

একটী বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে উদ্দেশ্য। প্রথম থেকেই শিশুদের তৈরী জিনিষ বিক্রি করে শিক্ষার কিছু ব্যয় সংস্থান করা ওয়ার্ধার এই প্রস্তাবটী সার্জ্জেণ্ট কমিটি পরিত্যাগ করেছেন কিন্তু তাঁরাও এ কথা মেনে নিয়েছেন যে উচ্চ-বুনিয়াদী স্কুলে (১১ থেকে ১৪ বছর) ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজের ভেতর থেকে বেছে নিয়ে এমন একটী বৃত্তিকে অবলম্বন করে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষালাভ কর্ব্বে যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রি করে শিক্ষালয়ের অন্ততঃ কথঞ্চিৎ ব্যয় সঙ্কুলান হবে। অর্থাৎ ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মূল ভিত্তি —শিল্পাদর্শ শিক্ষা—সার্জ্জেণ্ট কমিটি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছেন, তফাৎ শুধু এ পরিকল্পনায় শিল্পকেন্দ্রিক ও অর্থাগমী শিক্ষাটা একটু পরে শুরু হবে। ব্যয় সম্বন্ধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ওয়ার্ধা ব্যবস্থায়ও নীচু ক্লাশের দিকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি করবার তেমন তাগিদ থাকবে না কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা উচিত ওয়ার্ধার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ৭ থেকে ১১ বৎসরের শিশুরাও বেশ আনন্দের সঙ্গে তাদের বৃত্তির কাজ করে এবং অনেক সময় স্কুলের আগে ও পরে সে কার্য্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রত থাকে। তাদের উৎপন্ন জিনিষ যদি ভাল উৎরায়, তাহলে সেটা বাজারে বিক্রিই বা হবে না কেন? এও মনে রাখা উচিত যে জিনিষটা করা হয় সেটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত হয় সেটা যেমনি বড়দের বাসনা, তেমনি শিশুদেরও। কেন আমরা এ কথা ভেবে মর্ম্মপীড়া অনুভব করি যে শিশুরা এ কাজ দুর্ব্বিষহ বলে মনে করে? অভিজ্ঞতা ও মনস্তত্ত্বের নির্দ্দেশ অন্যপ্রকার।

তবে ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশে নিশ্চয়ই দু ধরণের বুনিয়াদী শিক্ষালয় (ওয়ার্দ্ধা ও সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনানুযায়ী) স্থাপন কর্ব্বার অবকাশ আছে, অন্ততঃ পরীক্ষা হিসাবে দুরকম স্কুলই পরখ করে দেখা উচিত—যে অঞ্চলে যে রকম খাটে। এ নিয়ে বিরোধ করা চলে না। অনেকস্থলে উভয় পরিকল্পনার সামঞ্জস্য হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

শিল্পশিক্ষা একেবারে নিখুঁত কর্ব্বার জন্য সার্জ্জেণ্ট রিপোর্টে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর ১৪ থেকে ১৬ বছর পর্য্যন্ত নিম্ন টেকনিকাল বা শিল্পবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরেকটী বিষয়ে সার্জ্জেণ্ট কমিটি ওয়ার্ধার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন—প্রাথমিক শিক্ষার প্রবুদ্ধ নব জাগ্রত ধারণা। গান্ধীজীর সঙ্গে কমিটি একমত যে কিঞ্চিৎ পঠন পাঠন, হাতের লেখা শেখা ও সামান্য আঁক কষা যা এতদিন প্রাথমিক শিক্ষা বলে অভিহিত হোতো তাকে আজ এ বিশ্বজাগরণের দিনে নাগরিক জীবনের গভীর দায়িত্ব পালনের উপযোগী শিক্ষা বলে মেনে নেওয়া চলে না। তাই হাতের কাজ ও বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেকগুলো বিষয় পৃথকভাবে ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে যাতে তাদের মনে সমাজবোধ ও সুকুমার বৃত্তিগুলো সম্যকভাবে বিকশিত হতে পারে। তাই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে খেলাধুলো, বিতর্ক, গান, আঁকা, সমাজসেবা ও স্বাবলম্বন ইত্যাদি শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইংরেজী শিক্ষা ব্যাপারে সার্জ্জেণ্ট কমিটি এরূপ মত প্রকাশ করেছেন—নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরেজী থাকবে না কিন্তু উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষায় [Senior (Middle) Basic Schools] স্থানীয় চাহিদা ও অবস্থা অনুসারে, প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের নির্দ্দেশে, থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু কমিটি এর বিশেষ পক্ষপাতী নন। ১৯৪৪ সালে রচিত এই রিপোর্টের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে, কাজেই ইংরেজীর প্রয়োজন ও কদর আপামর জনসাধারণের শিক্ষায় আর থাকবে না। সার্জ্জেণ্ট কমিটির প্রথম উপকমিটি (Sub Committee) অবিশ্যি আগাগোড়া মাতৃভাষাই বহাল রেখেছেন এবং সর্ব্বজনীন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দ্দু ও হিন্দি এই দুই হরফে লেখা হিন্দুস্থানীর অনুমোদন করেছেন। বলা বাহুল্য, ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ইংরেজী শিক্ষা স্রেফ্ বাদ পড়েছে।

আবশ্যিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ওয়ার্ধার নিকট

সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার ঋণ যে অপরিশোধ্য তা বোধ হয় এই সামান্য আলোচনা থেকেই প্রতীয়মান হবে। কমিটির মতে বুনিয়াদী শিক্ষা চালু কর্ত্তে যে সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক প্রয়োজন চল্লিশ বছরের আগে তা পাওয়া যাবে না, সম্পূর্ণ চালু হলে এর খরচ হবে বাৎসরিক প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও দৃষ্টিভঙ্গী নতুনতর। হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা সব ছেলেই কিছু আপন ধীশক্তি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার মত উপযোগী নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা পাশ করে, তার অর্দ্ধেক ছেলেমেয়ে কলেজে ভর্ত্তি হয় এবং তার এক চতুর্থাংশ মুখস্থ ক'রে অতি কষ্টে পাশ করে, তাও বেশীর ভাগ একবারে পাশ কর্ত্তে পারে না। এই ত উচ্চ শিক্ষার মোটামুটি চেহারা, কাজেই এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। সব ছেলেরই হাইস্কুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, বিশেষ করে উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলে যখন চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় বলা হয়েছে এগার বার বছর বয়সে (১১+) নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে যারা হাই স্কুলে যাবার উপযোগী বলে গ্রাহ্য হবে (শতকরা কুড়ি জন) তারাই শুধু হাই স্কুলে যেতে পারবে। এ হাই স্কুল চলবে ছয় বছরের জন্য এগার বার বয়স থেকে সতের পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এখানকার ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত, কারণ সতের আঠার বছরের আগে সম্যক মনোবিকাশ হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু তথ্যসম্ভার ছাত্র ছাত্রীরা উপলব্ধি করতে পারে না, শুধু মুখস্থ করে শিক্ষার ভারকে দুর্ব্বিষহ করে তোলে।

কমিটি এ বিস্তৃততর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য (১১ থেকে ১৭ পর্য্যন্ত) নানা প্রকারের হাই স্কুলের ব্যবস্থা করেছেন, কারণ কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্রছাত্রীর আসক্তি, অনুরক্তি, ও মনস্বিতা যে সমান নয় তা বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রকট হয়ে পড়ে, তাই বিভিন্ন রুচি, শক্তি ও ভবিষ্যৎ জীবনে বৃত্তির চাহিদা মেটাবার জন্যে

চাই বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষায়তন, আমাদের বর্ত্তমানে প্রচলিত একঘেয়ে মামুলী সাহিত্যিক বা তোতাপাখী প্রতিষ্ঠান নয়। এই নানা রকম প্রতিষ্ঠানের ভেতর দুটো বিশেষ ধরণের শিক্ষায়তনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, জ্ঞানমুখী (Academic High School) ও শিল্পমুখী হাই স্কুল (Technical High School)।

এ দু রকম হাই স্কুলেই মাতৃভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজী (আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষারূপে), অন্যান্য আধুনিক ভাষা, সঙ্গীত, চারুকলা, শরীর চর্চ্চা, কৃষি (গ্রামের স্কুলে) ইত্যাদি সমান ব্যবস্থা থাকবে ; তফাৎ হবে, অযান্ত্রিক হাই স্কুলে থাকবে পুরাণো দিনের সংস্কৃত আরবী ফার্সী ভাষা ও নাগরিক বিজ্ঞান আর যান্ত্রিক হাই স্কুলে থাকবে ব্যবস্থা নানারূপ শিল্প ও সওদাগরী শিক্ষার যথা দারুশিল্প, ধাতুশিল্প, প্রাথমিক পূর্ত্তকার্য্য শিক্ষা (Elementary Engineering), জরিপ, ড্রয়িং, শর্টহ্যাণ্ড, খাতাপত্র ও হিসাব রাখা (Book Keeping, Accountancy) টাইপ রাইটিং, সওদাগরী চিঠিপত্র লেখা ও আদানপ্রদান ইত্যাদি। এ বিষয়গুলোর ভেতর মাতৃভাষা, ইংরেজী, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত, অঙ্কন, শরীরচর্চ্চা হবে আবশ্যিক, অন্যগুলো হবে বৈকল্পিক। শিল্পমুখী বা যান্ত্রিক বিদ্যালয়ে চারুকলা ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটার উপর জোর দেওয়া হবে যেমন জ্ঞানমুখী বা অযান্ত্রিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে জ্ঞানের উপরে। তবে কমিটি এ কথা স্পষ্টই বলেছেন যে অযান্ত্রিক হাই স্কুলেও শেষের দিকে অনেকের একটা বৃত্তি বা ব্যবসায় শিখতে হবে বা তাদের ভেতর কোনো বৃত্তির দিকে আসক্তি জন্মাতে হবে কারণ বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না এবং অনেকের পক্ষে এখানেই হয়তো নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার শেষ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কাজেই তাদের শিক্ষা স্বয়ংসিদ্ধ বা আত্মসিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কমিটির মতে গ্রামে দু রকম হাই স্কুলেই কৃষিকার্য্য শেখা অতীব বাঞ্ছনীয়। কমিটি দ্বিমুখী ও বহুমুখী (Bilateral and

Multilateral) স্কুলের কথা আলোচনা করেন নি, কিন্তু আমাদের দেশে তাও কিছু কিছু থাকা দরকার। সমস্ত জিনিষটাই পরীক্ষা-সাপেক্ষ, পরীক্ষার নিকষে যা ভাল উৎরায় তাই আমরা গ্রহণ করব। একই স্কুলে যাতে বিভিন্ন রুচি ও অনুরক্তি চরিতার্থ হতে পারে তারও ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষগণের করা উচিত। নতুন ধরণের হাইস্কুল শিক্ষার বাৎসরিক ব্যয় হবে আটাত্তর কোটি টাকা (শিক্ষকের উন্নততর বেতন-সমেত)।

যারা যান্ত্রিক হাই স্কুল ত্যাগ করে আরও উঁচুদরের কারিগর বা সওদাগরী আফিসে উন্নততর কর্ম্মী হতে চায় তারা তিন বছরের জন্য (১৭ বছর থেকে ২০ বছর পর্য্যন্ত) যাবে উচ্চতর শিল্প প্রতিষ্ঠানে (Higher Technical Institutes)। এখানে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে। এর পরেও যারা আরো শিখতে চায় তাদের দু বছরে (২০ বছর থেকে ২২ বছর পর্য্যন্ত) উচ্চতর ডিপ্লোমা (Advanced Diploma) দেওয়া হবে। নানাস্তরের শিল্প, সওদাগরী ও কলা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাৎসরিক ব্যয় ধার্য্য হয়েছে মোটামুটি দশ কোটি টাকা।

হাই স্কুল থেকে যারা লেখাপড়া না ছেড়ে দিয়ে বা উচ্চতর শিল্প প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে তাদের সংখ্যা কমিটির মতে এখনকার অনুপাতে অনেক কম হবে—হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর (দু রকম হাই স্কুল থেকেই আসতে পার্ব্বে) ১৫ জনের ভেতর ১ জন আসবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর (Ist Grade) কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীগুলো বা শুধু ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষায় (মেডিকাল, টেকনোলজিকাল ইত্যাদি ডিগ্রি বাদ দিয়ে) অন্ততঃ তিন বছর লাগবে। উনিশ কুড়ি বছরেই ডিগ্রী পাওয়া যাবে তবে এক বছর দেরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শুরু হওয়াতে উচ্চাঙ্গের বিদ্যা আয়ত্ত কর্ব্বার পক্ষে এ ব্যবস্থা যোগ্যতর সন্দেহ নেই।

আশা করা যাচ্ছে এ ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষায় এক বৎসরকাল

সময়ও বাঁচবে কিন্তু দেশের বর্ত্তমান কলেজগুলোর আর্থিক ক্ষতি হবে বলে এ ব্যবস্থা অনেকের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতশিক্ষার দিক থেকে এর প্রয়োজন আছে। 'টিউটোরিয়াল' প্রথা, (Tutorial System) ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ, স্নাতকোত্তর উচ্চাঙ্গের শিক্ষা (Post-graduate Studies), অধ্যাপকের বেতন, যথাসম্ভব দেশের আর্থিক সমস্যা সমাধান ও মৌলিক গবেষণার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ঠিক মতই জোর দেওয়া হয়েছে। এ জিনিষগুলোর অভাবে দেশে উচ্চ শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নি। ইংলণ্ডের মত ভারতবর্ষেও "বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় মঞ্জুর কমিটি" নামে একটী কমিটি প্রতিষ্ঠা এই রিপোর্টে বিশেষ ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। যাতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভেতর অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা না হয়, যাতে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই বহুব্যয়সাপেক্ষ একই জিনিষ বা বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করেন, অকারণে বা স্বল্প প্রয়োজনে যেন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব না হয়, দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা যেন যথাসম্ভব এ প্রতিষ্ঠানগুলো মেটাতে পারেন এবং যার যার প্রয়োজনানুসারে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কমিটির হাত দিয়ে অর্থসাহায্য করতে পারেন এজন্য "ব্যয়মঞ্জুর কমিটি" গঠিত হয়েছে। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবেন না, মোটামুটি একটা খবরাখবর করবেন এবং যাতে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর যশ ও উপকারিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন। ইচ্ছা হলে, প্রাদেশিক সরকারও তাঁদের অর্থসাহায্য "বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় মঞ্জুর কমিটি"র হাত দিয়ে দিতে পারবেন। আমার মনে হয় আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এরূপ একটী কমিটির বিশেষ দরকার, কিন্তু এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়েছে, স্বাধীনতা হারাবার অমূলক আশঙ্কায় একটী সত্যিকারের ভাল প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা।*

* ১১২ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দেশের সমৃদ্ধির জন্য উচ্চাঙ্গের শিল্প, পূর্ত্ত, যান্ত্রিক ও সওদাগরী শিক্ষা ব্যাপারে কমিটি বিশেষ ভাবে কলকারখানা ও সওদাগরি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার ওপর জোর দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করেছেন, এবং গবেষণা যেন শুধু গবেষণার বিলাসই না হয়, কাজে লাগে বা অর্থকরী হয় এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন। আমাদের শিক্ষায় এ সতর্কবাণীর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নাই। কমিটির পরিকল্পনা মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নতি সাধনে বাৎসরিক ব্যয় ছ কোটি বাহাত্তর লক্ষ (৬,৭২লক্ষ) টাকা ধার্য্য হয়েছে; বর্ত্তমানে ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজ ও ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীগুলোর ব্যয় সমেত উচ্চ শিক্ষায় খরচ হয় প্রায় চার কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা (১৯৪১-৪২ সালের ভারত সরকারের রিপোর্ট)।

এ পর্য্যন্ত সার্জ্জেণ্ট রিপোর্টের কাঠামোটা যা দাঁড়াল তা নীচুতে সুবিধের জন্য দেওয়া হল, চোখের সামনে একটা ছবি থাকা দরকার :—

নার্সারি ও শিশু স্কুল	৩ — ৫	বছর
নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল	৬ — ১১	”
উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল	১১ — ১৪	”
নিম্ন টেক্‌নিকাল স্কুল (শিল্প, যান্ত্রিক ও সওদাগরী)	১৪ — ১৬	”
জ্ঞানমুখী (Academic) হাই স্কুল	১১ — ১৭	বছর
শিল্পমুখী (Technical) হাই স্কুল	১১ — ১৭	”
উচ্চ টেক্‌নিকাল প্রতিষ্ঠান (ডিপ্লোমা)	১৭ — ২০	”
উচ্চতর টেক্‌নিকাল প্রতিষ্ঠান (উচ্চতর ডিপ্লোমা)	২০ — ২২	”
বিশ্ববিদ্যালয়	১৭ — ২০	”

কমিটি দুটো বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন যার যৌক্তিকতা অবিসংবাদিত। শিক্ষার যে নানা স্তর ধার্য্য করেছেন ওঁরা ছাত্র

ছাত্রীর স্বাভাবিক শক্তি, অনুরক্তি ও রুচি অনুযায়ী, তাতে যেন তাদের গতিপথ (শুধু একই স্তরের ভেতরে নয়, এক স্তর থেকে অন্য স্তরেও) থাকে অপ্রতিহত সেজন্য প্রতি স্তরে গরীব ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর জন্য বহু ষ্টাইপেণ্ড, স্কলারশিপ্, ফ্রী শিপ, ভাতা ইত্যাদি নানা প্রকারের বন্দোবস্ত করেছেন। এতে কোন উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী অর্থের অভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না, রাষ্ট্রের সাহায্যে স্বভাবগত শক্তি ও অনুরাগ অনুসারে জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা সফল কর্ত্তে সক্ষম হবে। এসব ষ্টাইপেণ্ড, ফ্রী শিপ্ ইত্যাদির খরচ প্রতি স্তরের শিক্ষার ব্যয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই সেই স্তরের মোট ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়েছে।

আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হোল "শিক্ষক" নিজে—তাঁর শিক্ষা, শিক্ষণশিক্ষা, তাঁর সম্মান, পদগৌরব ও বেতন। যেমন ছেলেকে তাঁর ইচ্ছা না থাকলে পড়ানো যায় না, তার পড়া হয় শুধু লোক দেখানো, তেমনি শিক্ষককে অভাবের তাড়নায় ক্লিষ্ট বা জনসমাজের তাচ্ছিল্যের পাত্র করে রাখলে বা তাঁকে তার প্রয়োজন মত শিক্ষা না দিলে তাঁর শিক্ষাদানটা হয়ে ওঠে একটা মস্ত বড় প্রহসন। কাজেই শিক্ষায় আসে না শ্রী, গড়ে যাই আমরা এক ছাঁচে ঢালা মুখস্থসর্ব্বস্ব পড়ুয়া ছেলেমেয়ে, জীবনের কাজে তাদের মূল্য নেই কিছু, জীবন-সংগ্রামে যায় তারা পিছিয়ে, জাতীয় চরিত্রের ঘটে অবনতি, জাতীয় সম্পদের দ্বার থেকে যায় চিররুদ্ধ, শিক্ষা হয়ে ওঠে একান্ত বাইরের, অন্তরকে করে না স্পর্শ। কমিটি শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীরই মত শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র করে কল্পনা করেছেন। এর বিশেষ দরকার ছিল, আজও দেশের লোক শিক্ষকের দিকে দৃষ্টি দেয় নি, অথচ নিশ্চিন্ত আরামে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে—কোন্ ঐন্দ্রজালিক পারলৌকিক শক্তিতে ছাত্রছাত্রী মানুষ হবে তারা একবার ভেবেও দেখেন না, বা দেখবার অবসরও তাঁদের নেই। এ পরিস্থিতির ভেতরও তুচার জন শিক্ষক যে শিক্ষার কাজে আত্মোৎসর্গ করছেন

না তা বলছিনা, তবে সাধারণ শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপই কমিটি বলেছেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি স্তরে যদি সঙ্গতবেতনতৃপ্ত, শিক্ষিত, ট্রেনিং বা শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থাৎ শিক্ষাদানে সুনিপুণ, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, সন্তুষ্টচিত্ত, কর্ম্মোৎসাহী শিক্ষক না থাকে, তাহলে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সফল হওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গত বেতন না হলে উপযুক্ত লোক শিক্ষকতার কাজে আসেনা, (বর্ত্তমান অবস্থা তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন) আর শুধু ভাল বেতন হলেই কর্ম্মোদ্দীপনা ও নিরলস পরিশ্রম প্রত্যাশা করা যায়না, (বর্ত্তমানে বহু প্রতিষ্ঠান তারও নিদর্শন)—চাই দুটোরই সমন্বয়। তবে প্রথমটী না হলে, দ্বিতীয়টী শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে যে হবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমান জীবনযাত্রার দুঃসহ চাপের নিষ্পেষণ তো আছেই, তার উপরে যদি গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থকষ্ট ঘটে, তাহলে মানুষের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটা অসম্ভব নয়, ঘটছেও তা অনেকক্ষেত্রে। কল-কারখানার কাজ যারা সামান্য কিছু জানে তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু যেখানে সরকারী বেসরকারী চাপরাশীরও ভাতা শুদ্ধ মাইনে প্রাথমিক এবং অনেকস্থলে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর বেতনের চাইতে অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আমরা শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে নবজাতি সৃজনে কি স্নেহ, কি কর্ম্মতৎপরতা, কি নিঃস্বার্থ দান প্রত্যাশা কর্ত্তে পারি? প্রত্যাশা করা শুধু অন্যায়ই নয়, অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এ জিনিষটা যতদিন দেশবাসী বা দেশ নেতাগণ না বুঝবেন, ততদিন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি পরিকল্পনা, মুসাবিদা বা সভা সমিতির বাগবিতণ্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বাস্তবে পরিণত হবে না।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় (শিক্ষকের বেতন ২৫৲ টাকা ধার্য্য হয়েছিল) দারিদ্র্যকে বরণ করে নেবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাধারণ শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষকের প্রতি সুবিচারের ইঙ্গিত

করা হয়েছে—স্কুলে শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভারের (দু-শ আশী কোটি টাকা) শতকরা সত্তর ভাগ শুধু তাঁদের বেতনের জন্য রাখা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সাধারণ শিক্ষকের সর্ব্বনিম্ন বেতন যথাক্রমে ৩০৲—৫০৲, ও ৭০৲—১৫০৲ (গ্রাজুয়েট ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের জন্য) ধার্য্য করা হয়েছে, তাঁদের বাড়ীভাড়া লাগবে না বা বাড়ীর সংস্থান না কর্ত্তে পারলে শতকরা দশ টাকা মাইনে বেশী দেওয়া হবে ; বড় বড় সহরে যেখানে আহার ও বাসস্থানের খরচ খুব বেশী, সেখানে শিক্ষকেরা এ হারের চেয়েও শতকরা ৫০ ভাগ বেশী মাইনে পাবেন এবং বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকেরা সরকার থেকে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের স্থবিধাও কিছু পাবেন। কিন্তু এ যুদ্ধ-পূর্ব্বকালীন বেতনের হারে বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও মহার্ঘ দ্রব্যাদির দিনে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের পক্ষে উদার আত্মত্যাগী দৃষ্টির অভাব হলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার আশঙ্কা আছে।

শিক্ষণ-শিক্ষার বন্দোবস্ত মোটামুটি ভালই রিপোর্টে করা হয়েছে, এতে আশা করা যায় (অবিশ্যি এ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হলে) শিক্ষিত গুণী শিক্ষকের দেশে অভাব হবে না। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাৎসরিক টাকার অঙ্ক ধরা হয়েছে চার কোটি সাতান্ন লক্ষ। আজ দেশের শতকরা ৪২ জন শিক্ষক ট্রেনিং পান নি বা শিক্ষণের কার্য্য শিক্ষা করেন নি, তাঁদের স্কুল কলেজের বিদ্যাও অনেকক্ষেত্রে অতি সামান্য, কাজেই বিস্ময়ের বিশেষ কোন কারণ নাই যে জাতির ধীশক্তির দিন দিন উন্নয়ন না হয়ে উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল প্রত্যেক দেশে শিক্ষাদানে সুনিপুণ শিক্ষকের উদ্ভব যাতে খুব শীঘ্র হয় সেজন্য নানা পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

বয়স্কদের শিক্ষা (Adult Education) সম্বন্ধে কমিটি ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে এটা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাত্র আরেকটা দিক—দেশের নিরক্ষরতা কিছুতেই দূর হবে না যতদিন না ছোটদের

আবশ্যিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের নিরক্ষতা দূর করা হয় ও তাদের নিয়মিত শিক্ষা ও বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ দান করে চিত্তের সম্প্রসারণ করা হয়। গ্রামোফন, রেডিয়ো, বই, খবরের কাগজ, বক্তৃতা, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি দ্বারা বড়দের প্রাথমিক শিক্ষাকে কায়েম করা দরকার। মহাযুদ্ধের ঠিক আগে প্রাদেশিক কংগ্রেস গভর্মেণ্টগুলি এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, হয়তো গণনিরক্ষরতা কিছু পরিমাণ দূরও হয়েছিল, কিন্তু এ 'সাক্ষরতাকে' কায়েম কর্ব্বার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না, সেজন্য কোন স্থায়ী সুফলও ফলে নি। রুশের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। সে দেশে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয় যে সাক্ষর আর নিরক্ষর হয় না। কমিটি ডেনমার্কের লোকশিক্ষা স্কুলগুলোর কথা (Danish Folk High Schools) উল্লেখ করেন নি, সে সব স্কুল বড়দের শিক্ষা, লাইব্রেরী, আমোদপ্রমোদ ও এক সঙ্গে থাকার ব্যবস্থাই শুধু করে না, তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের কাজেও যাতে সুবিধে হয় এমন শিক্ষা দেয় অর্থাৎ যে যা কাজ কর্চ্ছে সে বিষয়ে আরও উন্নততর জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতা তাকে দেওয়া হয়। যে দেশে দশ থেকে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক চোদ্দ কোটি ছিয়াশী লক্ষের ভেতরে বার কোটি সত্তর লক্ষ লোক নিরক্ষর, সে দেশের পক্ষে আজ না সম্ভব হলেও, ভবিষ্যতে এ রকম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা বলা বাহুল্য। প্রতি বৎসর ৬৭ লক্ষ লোককে লেখাপড়া শেখালে ২০ বছরে নিরক্ষরতা দূর হবে, কমিটি এরূপ আশা কর্চ্ছেন, ততদিনে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষাও শেকড় গেড়ে অজ্ঞানতার বিষকে জাতীয় জীবনের ছোট্ট উঠন্ত চারাগাছটীকে আর নষ্ট হতে দেবে না। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য কমিটি বাৎসরিক তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

তারপর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাদ্যের কথা। এ দুটো জিনিযের অভাবে বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যর্থতা সবাইর অবিদিত না হলেও বহুলাংশে অনিরোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেই পুরানো যুক্তি—অর্থের অভাব।

যে কয়েকটি প্রদেশে স্কুল-স্বাস্থ্যসেবাবিভাগ (School Medical Service) খোলা হয়েছিল, ব্যয়সঙ্কোচের কথা যখুনি উঠেছে তখুনি তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটী প্রদেশের বেলা তিন তিন বার খোলা আর বন্ধ করা হয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন হৃদয়হীন খেলা চলতে পারেনা। আজ পর্য্যন্ত স্কুলে স্বাস্থ্যসেবা শুধু ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষাতেই শেষ হয়, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা গরীব অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেজন্য কেন্দ্রীয়-শিক্ষা-উপদেষ্টা-বোর্ড ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বোর্ডের যুক্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে সার্জ্জেণ্ট-রিপোর্টে অমোঘ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং ডাক্তার, কিয়দংশে ওষুধপত্র, স্কুলক্লিনিক, ও টিফিনের ব্যবস্থা প্রতি স্কুলের জন্য করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের জন্য শুধু খাদ্য ও ওঁষুধই প্রয়োজন নয়, চাই প্রীতিকর পরিবেষ্টন, খেলার মাঠ, ও আলো-হাওয়া-ভরা স্কুলগৃহ। শেষোক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড নিযুক্ত স্কুলগৃহ কমিটির (School Buildings Committee) নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করতে কমিটি প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলোকে অনুরোধ করেছেন। শিক্ষার প্রতি স্তরে স্কুলের স্বাস্থ্য-সেবাবিভাগের খরচ স্কুলের খরচের শতকরা দশ ভাগের মধ্যে কমিটি ধরে নিয়ে একে ব্যয়সঙ্কোচের কুঠারাঘাত হতে নিষ্কৃতি দিয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তাই এর জন্য আলাদা করে খরচ ধরা হয় নি।

এই একই কারণে আরেকটী দরকারী জিনিষের খরচও স্কুলের খরচের শতকরা ঐ দশ ভাগের মধ্যেই কমিটি ফেলেছেন—সেটী হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরণের স্কুল। যদিও উপযুক্ত পরিসংখ্যান আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয়নি, তবুও একথা ঠিক যে অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, শিক্ষাবিষয়ে শৈথিল্য, আধুনিক জীবনসংগ্রামের নিষ্পেষণ ও অন্যান্য কারণে দিন দিনই ব্যাধি ও আধিগ্রস্ত ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এই শ্রেণীর ভেতর পড়বে যারা মূক,

অন্ধ, খঞ্জ, বধির বা অন্য প্রকারে বিকলেন্দ্রিয় শুধু তারাই নয়, পড়বে তারাও যারা ক্ষীণশক্তি, বাগ্‌দোষগ্রস্ত (তোৎলা ইত্যাদি), ক্ষীণহৃদ্ ও হীনবুদ্ধি (মনস্বিতার মাপে)। অবিশ্যি জড় বা হীনবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের যথাসম্ভব সাধারণ স্কুলে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার, যদিও তাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলোর জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত থাকবে। যে সব ক্ষেত্রে মানসিক বুদ্ধিহীনতা এত বেশী যে সাধারণ স্কুলে তাদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না, সে সব ক্ষেত্রেই একেবারে আলাদা স্কুলের বন্দোবস্তের কথা কমিটি বলেছেন। প্রত্যেকেই জীবনে যাতে একটা বৃত্তি বা কোন কাজ শিখে সুষ্ঠুভাবে নাগরিক জীবন যাপন কর্ত্তে পারে সে ভাবে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। হীনবুদ্ধিদের প্রতি ব্যাপকভাবে ভারতের এই প্রথম দৃষ্টিপাত (শুধু বাংলাদেশে ঝাড়গ্রাম ও কার্সিয়ংএ এদের জন্য দুটী প্রতিষ্ঠান আছে), সমাজ-বিবেক এ বিষয়ে শীঘ্রই জাগ্রত হয়ে উঠবে এ আশা করা অন্যায় হবেনা। ভারতবর্ষে মনস্বিতার মাপের আরও বহুল প্রচার প্রয়োজন, এ জিনিষটাকে জনপ্রিয় করে চালু না কর্ত্তে পার্লে সমাজব্যবস্থায় অনেক গলতি ও অসঙ্গতি থেকে যাবে।

স্কাউটীং, ব্রতচারী, বালসেনা ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠান দেশে থাকা সত্ত্বেও এগুলো ঠিক কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় কারো নির্দ্দেশে কাজ করেনা। এদের সংহতি হওয়া দরকার। ছেলে-মেয়েদের ক্লাবও খুবই কম। যুবশক্তি সন্দীপন (Youth Movement) বলেও আমাদের দেশে বিশেষ কিছু নেই, এ সবের জন্য কমিটি মোটামুটি এক কোটি টাকা খরচের নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

আমাদের দেশের আরেকটী বড় গলতি হচ্ছে স্কুল থেকে যে সব ছেলেমেয়ে বেরোয়, শিক্ষা সমাপনান্তে তারা কি কর্ব্বে, তারা কি কর্ব্বার যোগ্য, সে বিষয়ে না হয় কোন গবেষণা, না হয় কোন পরীক্ষা বা পরামর্শ দান। এটা একটা অত্যন্ত অসন্তোষজনক অবস্থা। যাদের এতদিন হাতে ধরে মানুষ করা হল, নির্ম্মম প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল

জীবন-সমুদ্রে তাদের এমন কাণ্ডারীহীন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেওয়া যে বিশেষ বিপজ্জনক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তাই অনেক ছেলেমেয়ে যুবকযুবতী যায় তলিয়ে এর অতল তলায়। তাদের মানসিক শক্তি, অনুরক্তি ও পরিবেশ পরীক্ষা করে তারা কোন পথে গেলে জীবন সংগ্রামে দাঁড়িয়ে যুঝতে পার্ব্বে সে পরামর্শ তাদের ও তাদের অভিভাবককে দিতে হবে। কোথায় কি কাজের চাহিদা আছে. স্কুলে সেই বরাবর কি কাজ হবে, কোন ছেলে কি কর্ব্বে এ সবই "কর্ম্ম দপ্তরের" (Employment Bureaux) গুরু দায়িত্ব। এতে মনস্তত্ববিদ্ ও বৃত্তি-বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে, আনুষঙ্গিক খরচ তো আছেই। এর জন্য কমিটি রেখেছেন ছেষট্টী লক্ষ টাকা।

কমিটি সর্ব্বশেষে বলেছেন যাঁরা এই বিরাট শিক্ষাব্যবস্থাটীকে চালু করবেন তাঁদের কথা। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে আমাদের দেশের রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে একটা অদ্ভুত অভাবনীয় ছেলেমানুষি আছে। তারা বড় বড় শিক্ষাব্যবস্থা কল্পনা করেন, হয়তো প্রবর্ত্তনও করেন কিন্তু সে ব্যবস্থাকে পরিকল্পনানুযায়ী রূপ দিতে গেলে যে সব শিক্ষাকর্ম্মচারী ও শিক্ষাসচিবদের প্রয়োজন তাঁরা সে সবের ব্যবস্থা করেন না, অনেক সময়ই স্কুলবোর্ড, লোকালবোর্ড বা ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, সাম্প্রদায়িক দোষ-দুষ্ট লোকের ওপরে এই গুরুভার ছেড়ে দেন। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এর বহু নিদর্শন মিলবে। এই বিরাট পরিকল্পনানুযায়ী যে বহু সংখ্যক শিক্ষাকর্ম্মচারীর প্রয়োজন তারও খরচ প্রতিস্তরে স্কুলকলেজের খরচের মধ্যেই কমিটি ধরেছেন, খরচের শতকরা পাঁচ ভাগ শিক্ষা চালনার জন্য রাখা হয়েছে।

বারোটী সারগর্ভ অধ্যায়ে বর্ণিত বার দফা শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার ফিরিস্তি মোটামুটি দেওয়া গেল, এতে বাৎসরিক ব্যয় হবে তিনশ তের কোটি টাকা (দেশীয় রাজ্য বাদ দিয়ে)। বর্ত্তমানে ফি ইত্যাদি থেকে শিক্ষার আয় (পঁয়ত্রিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ) বাদ দিলে মোট

খরচ হবে ২৭৭½ কোটি অর্থাৎ ধরে নেওয়া যাক দু শ আশী কোটি টাকা প্রায়। অবিশ্যি এত টাকা আজই দরকার হবে না, কমিটি চল্লিশ বৎসরে এ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ কর্ত্তে চান, আটটী পাঁচ বছর মেয়াদী প্ল্যানে কাজ চলে চল্লিশ বৎসরে বাৎসরিক এই ব্যয়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

রিপোর্টের ভালমন্দ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আগে কিছু আভাষ দিয়েছি, এখন একটু বিস্তৃতভাবে দু একটী বিষয় আলোচনা কর্ব্ব।

সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে এ রিপোর্টে প্রথম স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে প্রতি নাগরিককে তার শক্তি, অনুরক্তি ও প্রয়োজন হিসেবে আবশ্যিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সেজন্য অর্থসংগ্রহ করাও ঠিক তেমনি। জাতির ভবিষ্যতের জন্য এ স্বীকারোক্তির তাৎপর্য্য যে কত গভীর তা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই একটী স্বীকারোক্তিই ভারতকে নিয়ে এসেছে অন্যান্য সভ্য দেশের গণ্ডীর ভেতর। এগারটী প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা-উপদেষ্টা ও শিক্ষাসচিব ও অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌রা এ রিপোর্ট সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গ্রহণ করেছেন, কমিটির সভ্যদের ভেতর মতান্তর যে কিছু না হয়েছিল তা নয় কিন্তু তাতে রিপোর্টে স্বাক্ষর দিতে বাধে নি। কংগ্রেসী দলের শিক্ষামন্ত্রীরা অবিশ্যি তখন গদীতে সমাসীন ছিলেন না, কিন্তু অন্তবর্ত্তী গভর্মেণ্ট ও পরে জাতীয় গভর্মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মোটামুটি সার্জ্জেণ্ট রিপোর্ট অনুসারেই দেশে শিক্ষার কাজ শুরু হবে এ আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করা যায় দেশে একটু শৃঙ্খলা স্থাপিত হলেই সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার আশু প্রবর্ত্তন হবে। একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আমাদের খুব কিছু গৌরবান্বিত কর্ব্বে না, শুধু পৌঁছে দেবে প্রগতিশীল জাতিগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কুড়ি লক্ষ সঙ্গত-বেতন-তৃপ্ত শিক্ষাদানে-সুনিপুণ, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, নবজাতি-সৃষ্টি-মহাব্রতে-দীক্ষিত, প্রবুদ্ধ

শিক্ষকের সমাজ যে দেশে গড়ে উঠবে সে দেশ কোনদিনই পেছিয়ে পড়ে থাকবে না। এতে যে গ্রামবাসিগণের মানসিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থারও বিশেষ উন্নতি হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

তৃতীয়তঃ একঘেয়ে মামুলী সাহিত্যিক শিক্ষা বর্জ্জন করে বহুমুখী, ও বিশেষ করে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন শিক্ষাসংস্কারের একটী মূল কথা, (যদিও বহুদিন আগেই এর মেয়াদ অতীত হয়ে গেছে, তবু কথা ছাড়া এতদিন কিছু হয় নি), এ রিপোর্টে তাকে অপরিহার্য্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় ত বটেই পরন্তু হাই স্কুলশিক্ষারও শেষদিকে একটী বৃত্তি শিক্ষার উপরেই বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রামের জ্ঞানমুখী (অ্যাকাডেমিক) হাই স্কুলেও কৃষিকার্য্য শেখানো দরকার কারণ সকল ছেলেই কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না এবং এদের অনেকেই বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষকতা কর্ব্বে। কৃষিবিদ্যাটা কাজে লাগবে দু দিক থেকেই—যদি নিজে চাষবাস করে তা হলে নিশ্চয়ই আর যদি বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষকতা করে তা হলেও—ছেলেদের বাগানের কাজ, কৃষির কাজ শেখাতে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য যে পুঁথিগত বিদ্যে এতদিন হাই স্কুলে দেওয়া হয়েছে এবং যার নিষ্পেষণে সুকুমারমতি বালকবালিকা ও কিশোরকিশোরীরা পিষে মরেছে তাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দেবার বন্দোবস্ত করে কমিটি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন সন্দেহ নেই। হাই স্কুলে শিক্ষার পরও অর্থাৎ ১৭ বৎসরের পরেও নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমিটি আরেকটী কাজ করে দেশের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। এদেশে একটা বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে যে সংস্কৃতি বা কৃষ্টির আবাসস্থল হল আর্টস্ বিষয়গুলো, বিজ্ঞান, শিল্প ও যান্ত্রিক শিক্ষার সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই। এ ভ্রান্ত ধারণা আজ অন্য দেশে দূরীভূত হয়েছে এবং পাঠ্যসূচীতে কৃষ্টিগত ও ব্যবহারিক বিষয়গুলোর ভেতর একটা

সামঞ্জস্য করা এখন আর অসম্ভব বলে মনে হয় না। তাই টেক্‌নিকাল হাই স্কুলেও গানবাজনা, আঁকা, সাহিত্য ও ইতিহাস ইত্যাদি শেখার বন্দোবস্ত করে কৃষ্টি ও যান্ত্রিক শিক্ষা পরস্পর বিরোধী এ অন্ধ সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। সকল মানুষেরই যে কৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন জীবনের নিজের তাগিদে এবং সে জিনিষটা যে শুধু যারা সাহিত্য ইতিহাস পড়ে তাদেরই একচেটিয়া নয়, তা কমিটি বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এবার রিপোর্টের বিরুদ্ধে কি বলা যেতে পারে তা বিবেচনা করে দেখা যাক, কারণ একথা সত্যি যে রিপোর্টের মধ্যে অনেক অপূর্ণতা, ফাঁক, এমন কি অসঙ্গতিও আছে। সবচেয়ে আগে যে জিনিষটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এ পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ হতে চল্লিশ বৎসর লেগে যাবে। দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী বসে থাকার পর দেশের লোক অন্য প্রগতিশীল দেশের লোকের সামিল হবে এ বরদাস্ত করা কোনো স্বদেশ-প্রেমিকের পক্ষেই সহজ নয়, দেশের জনসাধারণও এতে দেশে যে স্বাধীনতা এসেছে তা উপলব্ধি করতে পার্ব্বেনা। সমাবস্থ তুরস্ক রুশ আঠারো থেকে কুড়ি বছরে যে কাজ পেরেছিল সে কাজ ভারতের পক্ষে চল্লিশ বছর লাগবে কেন তার যুক্তিযুক্ত উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। জাতির একাগ্র শক্তি ও অর্থ যদি এই জেহাদে নিয়োজিত হয়, তা হলে কেনই বা লাগবে এ দীর্ঘকাল ?

উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক আমাদের হাতে নেই একথা সত্যি, তাঁদের তৈরী কর্ত্তে হবে একথাও ঠিক কিন্তু এত দীর্ঘ সময় এতে ব্যয়িত হবে না। খুব বেশী হলে ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে তিনটী কি চারটী পাঁচবছর-মেয়াদী প্ল্যানে যে কাজ আজ জাতির জীবনমরণ সমস্যার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে তা সমাধা কর্ত্তেই হবে। রুশ, তুরস্ক, চীন এসব প্রতিদেশেই জনজাগরণে যুবশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে, এদেশেও নিশ্চয় করা উচিত। ছয়মাসকালীন ট্রেনিং দেবার পর আবশ্যিক ভাবে প্রতি শিক্ষিত যুবকযুবতীকে যদি এক বৎসর শিক্ষাদান কার্য্যে নিয়োজিত করা যায় তা হ'লে প্রাথমিক

বা বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষকসমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত হবে, সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা শিক্ষকতাকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা স্থির করেছেন তারাও ট্রেনিং পেয়ে তাঁদের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার কর্ব্বেন। এক বৎসর কাল প্রত্যেক যুবকযুবতীকে দেশের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে, ধরে নিতে হবে দেশে সংগ্রাম-অবস্থা বর্ত্তমান, যতদিন না নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ শেষ হয় ততদিন এ আত্মোৎসর্গ করতে দেশের যুবশক্তি কখনও পিছপাও হবেনা। এতে খরচ বেশ কিছু কমবে এবং উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব হবেনা। হিটলারের জার্ম্মানীতে যুবশক্তিকে দেশের কাজে খাটিয়ে নেবার জন্য একজন স্বতন্ত্র যুবমন্ত্রী ছিলেন। তেমনি ভাবে আমাদের দেশের যুবশক্তিকে খাটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বছরে পাঁচমাস অনায়াসে শিক্ষকতার কার্য্যে সহায়তা করতে পারে, বিধিবদ্ধভাবে তাদের নাম স্বেচ্ছাসেবক বা শিক্ষাসেনা বাহিনীতে রেজেষ্ট্রী করা হবে, যুবমন্ত্রীর আদেশে ছুটীর সময় যথাসম্ভব যার যার গাঁয়ে বা নিকটবর্ত্তী পল্লীতে তাদের কাজ দেওয়া হবে। শিক্ষাসেনা বাহিনীতে সকার ও বেকার বয়স্করাও যোগ দিতে পারেন, তবে ঠিক কতটুকুন সময় এবং কতদিন পর্য্যন্ত তা দেওয়া সম্ভব সে সবের বিস্তৃত তালিকা থেকে যাঁদের সাহায্য নেওয়া সম্ভব তাঁদের সাহায্য নিতে হবে। শিক্ষিত জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে এ গড়ার কাজ চলতে পারে না, যত শীঘ্র এ সত্য উপলব্ধি হয় এবং সুচিন্তিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হয় ততই মঙ্গল। দেশের নিকট, বিশেষ করে দেশের যুবশক্তির নিকট আবেদনের মূল্য সার্জ্জেণ্ট কমিটি সম্যক উপলব্ধি কর্ত্তে পারেন নি এটাই আমার অভিযোগ। দেশের জনশিক্ষায়, রুশ, জাপান, চীন, তুরস্কের যুবশক্তি আপ্রাণ সাহায্য করেছে, শুধু কি কর্ব্বেনা ভারতের যুবশক্তি ? এত বড় অপবাদ দেওয়ার হৃদয় কার আছে আমি জানি না ; তবে এ প্রচণ্ড শক্তিকে ব্যবহার না করে যে অবহেলা করে তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না একথা জানি ঠিক।

এখন দেখা যাক খরচের দিকটা। বর্ত্তমানে যা সমস্ত ভারতের রাজস্ব তা প্রায় সবটাই খরচ হবে শিক্ষায়, স্বতঃই মনে হয় এত টাকা আসবে কোত্থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় দেশ যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন যেমনি করে যুদ্ধের খরচা যোগান হয়, ঠিক তেম্নি করেই। যুদ্ধের টাকা মেলে, শুধু নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও তাদের গোষ্ঠীগোত্র—দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অনাচার, রোগ, দুঃখ, অস্বাস্থ্য, সাম্প্রদায়িক হলাহলের বিরুদ্ধে জেহাদের অর্থ মিলবে না? জাতীয় ঋণ বলে যে একটা জিনিষ আছে সেটা কি আমরা একেবারে ভুলে গেছি না শিক্ষা ব্যাপারে তার উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত? এ পরিকল্পনা সংক্রান্ত বাড়ী ঘরদোর ইত্যাদি অপৌনঃপুনিক খরচ যা হবে তা জাতীয় ঋণ থেকেই হবে এটা কমিটির মত। শিক্ষায় যে টাকা ঢালা যায় তা সহস্রগুণ ফিরে আসে জাতির উন্নততর স্বাস্থ্যে, সম্পদে, সুখে ও শান্তিতে। একথা সবাই জানে, তাই যখন জার্ম্মাণ বোমা এসে পড়ছিল লণ্ডনের প্রাসাদে প্রাসাদে, হাউস অব্ কমন্স পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত, ইংলণ্ড মুক্তহস্তে টাকা খরচের বন্দোবস্ত করে যাচ্ছিল তার নতুন শিক্ষা-আইনের বিচিত্র ব্যবস্থার জন্যে, সে অর্থের ভয় করে নি, ঋণের ভয় করে নি, সে জানতো এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাই গড়ে দেবে ধ্বংসস্তুপের উপর সুরম্য অট্টালিকা, নৈরাশ্যের কালিমার ভেতর এনে দেবে আশার দীপ্তি, বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অনিরোধ্য সাহস, লোহাকে সোনা করে তোলবার আকাঙ্ক্ষা, মুমূর্ষু মানবের আর্ত্তনাদে অনাগত দিনের আনন্দগীতি। ঋণ কর্ত্তে ভারতই শুধু ভয় পাবে? আমার ব্যক্তিগত মত "বুনিয়াদীশিক্ষা লটারী" করে বহু অর্থ সংগ্রহ করা, বছরে চারবার পর্য্যন্ত এ লটারী হতে পারে, আইরিশ হাঁসপাতালগুলো আজ পৃথিবীর ঈর্ষা ও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এরই প্রসাদে। তারপর বিলাস-দ্রব্যাদির ওপর নতুন ট্যাক্স, সরকারী অন্যান্য বিভাগের খরচ কমান, সামরিক খরচের স্রোত এদিকে একটু ফিরিয়ে দেওয়া এবং দেশে

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর শিল্প-বাণিজ্য মারফত পর্য্যাপ্ত ধনরত্ন আহরণ ইত্যাদি নানা উপায়ে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা সম্ভব।

আরেকটী কথা। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় অর্থের মাত্রাটা কতকগুলো বিষয়ে বেশী ধরা হয়েছে, বেশ কিছু ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভব। পূর্ব্বেই বলেছি বাধ্যতামূলক শিক্ষাসেনা বাহিনী তৈরী করলে শিক্ষকতার খরচ অনেক কমে যাবে আর শিক্ষকতার খরচই হোল একশ ভাগের সত্তর ভাগ। বয়স্কদের শিক্ষায় প্রায় ষাট কোটি টাকা শেষ পর্য্যন্ত (কুড়ি বছরে) খরচ ধরা হয়েছে কিন্তু আট বছর ধরে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক বুনিয়াদী শিক্ষা দেশে চললে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাবে, এবং এত খরচের প্রয়োজন হবে না। তারপর শিল্প ও বাণিজ্যিক শিক্ষা বিষয়েও বিশেষজ্ঞদের মত যে এ বিভাগেও খরচ অনেক কমান যায় যদি দেশের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠান গুলোকে প্রয়োজন মত এক আধটুকুন বাড়িয়ে কার্য্যোপযোগী করে নেওয়া হয়।* এ রকম আরো অনেক ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভব।

সুতরাং মোট খরচের টাকার মাত্রাটা কমিয়ে একটা ন্যূন সংখ্যা ধরে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের অবিলম্বে এ বিষয়ে একটী কমিটি নিযুক্ত করা উচিত যাতে ব্যয়সঙ্কোচের মাত্রাটা নির্দ্ধারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হয়। আরেকটা কথাও মনে রাখা উচিত। সার্জ্জেণ্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর চার বছর কেটে গেছে, এ চার বছরে শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নানাদিকে নানা ভাবে কাজ খানিকটে এগিয়ে গেছে, কাজেই এ চার বছরের খরচ অন্ততঃ খানিকটা লাঘব হবে। এ সামান্য কথাটা মনে রাখা উচিৎ আজ ইংলণ্ডে মাথা পিছু শিক্ষার জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ টাকা, আর ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে খরচ হবে এ রিপোর্ট অনুসারে মাথা পিছু দশ টাকারও কম। এতেও আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না? এ বিষয়ে

* Vide Educational Re-organization In India. A. N. Sen. (1944) p. 62

আমরা দেবাদিদেব মহেশ্বরকেও হারিয়েছি! ব্রিটিশ ও ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌রা অবিশ্যি এ বিষয়ে একমত যে ভারতে শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যদি সুচিন্তিত নীতি অনুসৃত হয় এবং দেশে জাতীয় শিক্ষা চালু হয়, তাহলে দেশে যে সম্পদের জোয়ার বইবে তাতে পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ও চরম ব্যয়ভারের নৌকোও অবলীলাক্রমে চলতে পার্ব্বে, তার গতিপথে কোন বাধাই তাকে আটকাতে পার্ব্বে না।

কিন্তু আমরা তো এই সুদূর অনাগত ভবিষ্যতের আশাপথ চেয়ে বসে থাকতে পারি না। কবে কোন্ সুপ্রভাতে কোন্ শুভলগ্নে অভাবনীয় উপায়ে হঠাৎ রাজকোষে আশাতীত অর্থাগম হবে, তখন সর্ব্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হবে, ইতিমধ্যে যেম্নি কায়ক্লেশে কোনমতে খুঁড়িয়ে চলছি, তেম্নি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা যাক, এ ব্যঙ্গ জাতির পক্ষে অসহনীয়, অপমানজনক। দেশ-নেতাগণ জাতিকে এ নিষ্ঠুর পরিহাস কর্ব্বেন না এ আশা করা অন্যায় হবে না।

তৃতীয়তঃ বুনিয়াদী স্কুল থেকে এগার বার বছরে হাই স্কুলে ভর্ত্তি হবার পদ্ধতি নিয়ে বেশ একটা ক্ষোভ ও শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। পরিকল্পনা মোতাবেক বুনিয়াদী স্কুল থেকে শতকরা মাত্র কুড়ি জন যাবে হাই স্কুলে এবং সেখান থেকেও বাছাই হয়ে দেশের সেরা ছেলেমেয়েরা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভোজে যাতে সত্যিকারের জীর্ণরসে পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে তাদের মন, চিন্তাশক্তি ও মৌলিক গবেষণা। আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেই উদ্ভূত হবেন ভবিষ্যতের বড় কর্ম্মচারী, ব্যবহারজীবী, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, ব্যবসায়ী অর্থাৎ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায় সবই। অথচ এখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই, একটা বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই এখানে ঢোকা সম্ভব। কাজেই এ মনোনয়ন প্রণালীর ওপর দেশের সুতীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি পড়েছে। এক কথায় বলতে গেলে যে মনোনয়ন-পদ্ধতি রিপোর্টে খাড়া করা হয়েছে তা মোটেই সন্তোষপ্রদ নয়। এ পরীক্ষায়

ছেলেমেয়ের বুদ্ধি ও ভাবী প্রতিভার সূচনা বা আভাষ যাচাই করা হবে, তারা এতদিন স্কুলে কি শিখল বা জানল তা নয়। এর ঠিক কী যে তাৎপর্য্য তা স্পষ্ট করে কমিটি বলেন নি, তবে বস্তুতঃ কার্য্যক্ষেত্রে এ গিয়ে দাঁড়াবে মনস্বিতার মাপ কাঠিতে (Intelligence Testing). মনস্বিতার মাপ জিনিষটা বিলেতের পক্ষে হয়তো ভাল কারণ সেখানে এ জিনিষটা বহু পরীক্ষা দ্বারা একটা মান বা ষ্টাণ্ডার্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সেখানেও শুধু মনস্বিতার মাপের ওপর নির্ভর করে সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য ছেলেমেয়ে বাছাই হয় না, স্কুলের বিষয়ও থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে মনস্বিতা পরীক্ষা জিনিষটা একেবারে নতুন এবং আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের জন্য কোন মান নির্দ্ধারিত হয় নি। সুতরাং শুধু মনস্বিতা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী মনোনয়ন করা অত্যন্ত অন্যায় হবে। নতুনত্ব ও অনভ্যস্ততার দরুণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীও এতে ফেল্ করে বসবে, অন্যে পরে কা কথা। মনোনয়ন পরীক্ষায় শতকরা ত্রিশ নম্বর মনস্বিতায় ও সত্তর নম্বর পাটিগণিত ও ভাষাজ্ঞানে নির্দ্ধারিত করলে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা বলে একে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কমিটি আরেকটা কথা ভুলে গেছেন বা বিশদভাবে আলোচনা করেন নি—সেটা হচ্ছে বিলম্বিত-বুদ্ধিদের (late bloomers) কথা। অনেক ছেলেমেয়ের এগার বার বছরের পরে বুদ্ধি খোলে, তাদের হাই স্কুলে যাবার কোন ব্যবস্থা কমিটি রাখেন নি, সেটা দূরদৃষ্টির অভাব ; অন্ততঃ চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত এ পরীক্ষা চলতে পার্ব্বে এরূপ বিধান থাকা দরকার। হাডো (Hadow Report) কমিটির যে নীতি অনুসৃত হয়ে এগারো বারো বছরে হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী মনোনয়ন করা ঠিক হয়েছে সেই নীতিও আজ আর ইংলণ্ডে সর্ব্ববাদিসম্মত নয়, এ কথা বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই। আমাদের দেশে অন্য দেশে যে নীতি পরিত্যক্ত হতে চলেছে তা চালাবার সার্থকতা খুঁজে পাই না।

চতুর্থতঃ যদিও কমিটি ভবিষ্যতে নার্সিং, ডাক্তারী ও শিক্ষকতার কাজে স্ত্রীশিক্ষার গুরু দায়িত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার সমস্যাগুলো সম্বন্ধে কোন গবেষণা বা গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না এ রিপোর্টে। বুনিয়াদী স্কুলে বা হাই স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠ্যসূচী এক হবে কিনা, একই বয়সে তারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে কিনা, খেলাধুলো, ব্যায়াম কি রকম হবে— এ সব সম্বন্ধে কোন কথাই নেই, শুধু একটী লাইনে বলা হয়েছে হাই স্কুলে মেয়েরা গৃহবিজ্ঞান (Domestic Science) শিখবে। এ বিষয়ে রিপোর্টে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। রিপোর্ট থেকে এও বোঝা যায় না ছেলেমেয়েরা কি সহশিক্ষ স্কুলে যাবে না ছেলে-মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল থাকবে। সহশিক্ষ স্কুল হলে খরচ অনেক কমবে বা স্বতন্ত্র স্কুল হলে খরচ বাড়বে তাও কমিটির বিবেচনাধীন ছিল কিনা জানা যায় না। মোট কথা স্ত্রীশিক্ষার মত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টার কমিটির কাছে যে পরিমাণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল তা কিছুই করে নি।

পঞ্চমতঃ শিক্ষণ-শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েটদের মাত্র এক বছর ট্রেনিং নিতে হবে অথচ প্রাক্‌বুনিয়াদ, নিম্ন বুনিয়াদ ও উচ্চ বুনিয়াদ শিক্ষকের জন্য যথাক্রমে দু ও তিন বৎসরের ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গ্রাজুয়েট শিক্ষণশিক্ষা কাজে যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের মতে এক বছরের ট্রেনিং মোটেই কার্য্যকরী হয় না, বিশেষ করে যখন নতুন প্রণালীতে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার কার্য্য চালাতে হবে। একটু আগেই বলেছি গণশিক্ষায় ব্যয়সংক্ষেপ ও আশু ফল লাভের জন্য আপাততঃ ছ মাস ট্রেনিং দিয়েও শিক্ষিত যুবকযুবতীকে শিক্ষকতার কার্য্যোপযোগী করে নেওয়া যায়; গণনিরক্ষরতা বহুলাংশে দূর হলে বৎসরাধিক ট্রেনিং দিতে কোন অসুবিধা হবে না। ছয় মাসের ট্রেনিং খুব সন্তোষপ্রদ হতে পারে না কিন্তু জাতি যখন ব্যাধিগ্রস্ত, তখন আতুরে নিয়মো নাস্তি এই নীতি অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। তবে আশা করি অর্থের এতটা অভাব আমাদের

হবে না যাতে বহুদিন ধরে নিকৃষ্টতর পন্থা অবলম্বন কর্ত্তে আমরা বাধ্য হব।

তারপর ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা, দ্বিতীয়া শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, গণশিক্ষায় উপস্থিতি কমিটি, ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর দাবী ইত্যাদি সম্বন্ধেও কমিটি কোন সুচিন্তিত নির্দ্দেশ দেন নাই। এ সব বিষয়ে নতুন কমিটি নিযুক্ত করে স্পষ্টভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌দের মনোভাব ব্যক্ত করা উচিত।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলে এ প্রবন্ধ শেষ কর্ব্ব। এ ক্ষেত্রেও প্রবেশাধিকার নিয়মিত করা ও ব্যয়মঞ্জুর কমিটির প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, এমন কি সেজন্য ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কমিটির মন্তব্যগুলো অনুমোদন করেন নি। কমিটির মতে হাই স্কুল থেকে ১৫ জন ছেলেমেয়ের ভেতর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে বা যাবার উপযুক্ত অর্থাৎ শতকরা ছ সাত জন। বিলেতে যায় শতকরা দশ জন কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের হাই স্কুল থেকে অনেক বেশী সংখ্যক ছেলেমেয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যায়—এক বাংলা দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের ভেতর শতকরা পঁয়ত্রিশ (৩৫) জন বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। অবিশ্যি শতকরা ছ সাত জন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেও, বর্দ্ধিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দরুণ সমগ্র ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রী হবে অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ। কিন্তু তাহলেও শিক্ষিত জনমত হঠাৎ এতটা সংখ্যা হ্রাস বরদাস্ত কর্ত্তে প্রস্তুত নয়, শতকরা ৩৫ জন থেকে ছ সাত জন হয়ে যাওয়ার কথাতেই বাংলা দেশে প্রবল বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কিছু কমা উচিত এ কথা ঠিক কিন্তু যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে তাদের বেশীর ভাগই (শতকরা ৮০ জন) বরবাদ হয়ে যাবে বা সেখানে যাবার অযোগ্য একথা শিক্ষাক্ষেত্রে ঘূর্ণীবাত্যার সঞ্চার কর্ব্বে এ আর আশ্চর্য্য কি? জিনিষটাকে আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে হবে, নইলে শত যুক্তিযুক্ত সংস্কারও মানুষের হৃদয়ে স্থান পাবে না। ইণ্টারমিডিয়েট

কলেজগুলো বন্ধ করে দিতে কমিটি বলেছেন, শিক্ষার দিক দিয়ে সে হয়তো ভাল, কিন্তু সেগুলোর এবং অধ্যাপকদের কি দশা হবে সে সম্বন্ধে কমিটি কোন নির্দ্দেশ দেন নি। এতেও কমিটি শ্লাঘার পাত্র না হয়ে জুগিয়েছেন শুধু বিদ্রূপবহ্নির ইন্ধন। সবচেয়ে বিরাগভাজন হয়েছেন ব্যয়মঞ্জুর কমিটি প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা মনে করেন এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন জীবনের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হবে। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে জিনিষটা ভেবে দেখলে দেখা যাবে এ ধারণা ভ্রান্ত। ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মত বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এই কেন্দ্রীয় ব্যয়মঞ্জুর কমিটির হাত থেকেই জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করেন, কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁরা এ অভিযোগ করেন নি যে ব্যয়মঞ্জুর কমিটি তাঁদের স্বাধীনতা বা দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের ওপর অসঙ্গত হস্তক্ষেপ করেছেন। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের চাইতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিক স্বাধীনতা-অভিলাষী এ কথা ভাবা কঠিন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবার এ জিনিষটা স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখা উচিত।*

এ কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা কল্লু'ম বলে এ কথা যেন একবারও মনে না হয় রিপোর্টের মন্তব্যগুলো অগ্রাহ্য, পরন্তু রিপোর্ট অনুসারে কিছু অদলবদল করে কাজ আরম্ভ করা একান্ত প্রয়োজন। আজ কথার দিন চলে গেছে, কাজের দিন এসেছে, নিশ্চয়ই এ শুভ লগন বয়ে যাবে না—অন্ততঃ বয়ে যেতে আমরা দেব না। গণ-প্রতিনিধিগণ ও দেশনেতাদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপক সভা

* সুখের বিষয় স্বাধীন ভারতে পুনর্গঠিত ব্যয়মঞ্জুর কমিটিকে অতি হালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মেনে নিয়েছেন এবং কমিটির মারফৎ ভাল অর্থ সাহায্যও পাচ্ছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ বৎসর ব্যবহারিক পদার্থ-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক রসায়ন-বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার দু লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করেছেন এবং ছাত্রাবাসের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনা সুদে ধার দিয়েছেন।

ইত্যাদিতে নির্ব্বাচনের আগে আমরা এ প্রতিশ্রুতি নেব যে সর্ব্বাগ্রে তাঁরা শিক্ষার কাজে ব্যাপকভাবে হাত দেবেন, শুধু মেরামতি বা একচোখো কাজ নয়, শিক্ষার নানাক্ষেত্রে একই সময়ে নবমন্ত্রে দীক্ষিত, প্রবুদ্ধ শিক্ষিত সমাজের হবে জয়যুক্ত অভিযান। শুধু বুনিয়াদী শিক্ষা, বা শুধু টেকনিকাল শিক্ষায় হবে না, একই সঙ্গে হাত দেওয়া চাই মাধ্যমিক শিক্ষায়, মেয়েদের শিক্ষায়, শিক্ষণ-শিক্ষায়, উচ্চশিক্ষায়, প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষায় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে। আমরা বহুদিন বহুবর্ষ ধরে আবেদন নিবেদনের পসরা মাথায় বয়ে গণপ্রতিনিধিদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি, কোথাও বা মিলেছে অস্বীকারের অপ্রসন্ন কটাক্ষ, কোথাও বা কৃপাকণা মিশ্রিত তণ্ডুলকণা আর কোথাও আন্তরিক সহানুভূতির দুটী স্নিগ্ধ অসহায় কথা। কিন্তু পরিণামে কার্য্যতঃ কিছুই ঘটে নি। এতদিন বাধা ছিল, অন্তরায় ছিল কিন্তু সে অমানিশা কেটে গেছে, আজ দেশনেতাদের কাছে আমাদের দাবী জানিয়ে বিফল হলে মনস্তাপের অন্ত থাকবে না।

দাবীর পশ্চাতে যদি কোন শক্তি না থাকে, তবে এ দাবীও হয়তো পরিণামে ভিক্ষুকের ব্যর্থ যাচ্ঞাতেই পর্য্যবসিত হবে। তাই আমাদের আজ প্রয়োজন শক্তিশালী শিক্ষিত জনমত বা শিক্ষিত সঙ্ঘ সৃষ্টি করা। আমাদের মনে রাখা উচিত আজ শুধু বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নিয়ে শিক্ষার নানাস্তরে দেড়লক্ষের উপরে শিক্ষক রয়েছেন, এঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিক্ষিত জনমত গঠন করুন ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভা ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটী ইত্যাদিতে নির্ব্বাচন যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করুন। এ সব প্রতিষ্ঠানে সদস্য হতে হলে বহুমুখী শিক্ষার একই সঙ্গে আশু প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঢুকতে হবে। এ ব্যবস্থা অবলম্বন কর্লে শিক্ষার দাবী কারও পক্ষে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করা সহজ হবে না। প্রদেশে প্রদেশে এরূপ শিক্ষিত সঙ্ঘ সৃষ্টি করা মনে হয় বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা। তাই আজ

যখন দেখি শিক্ষা বিষয় নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে, বক্তৃতা বাগবিতণ্ডা হচ্ছে, শিক্ষাবিদ্ ছাড়াও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি এতে যোগ দিচ্ছেন, তখন মনে আনন্দই হয় বেশী বিস্ময়ের চেয়ে। মানুষের মনে যে আলোড়ন শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা

মামুলীধরণের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার চাইতে বুনিয়াদী শিক্ষার উৎকর্ষ সম্বন্ধে দেশে আজ দ্বিমত নেই, কাজেই আবশ্যিক ও অবৈতনিক ভাবে যে শিক্ষা আমরা চালু করতে চাই তা হবে বুনিয়াদী শিক্ষা। এখন একে কার্য্যকরী করে তোলার কি উপায় আমরা উদ্ভাবন কর্ত্তে পারি সেটা বিশেষ করে চিন্তা করে দেখা দরকার। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ বঙ্গদেশ দ্বিধা-বিভক্ত, সমগ্র বাঙ্গলার ছবি চোখে ভাসলেও এ পরিকল্পনা কর্ব্বার সময় ভাবতে হচ্ছে শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথা, যদিও পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষেও আপন পরিসংখ্যানানুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন কর্ত্তে কোন বাধা থাকবে না।

আমার মনে হয় চারটী পাঁচবছর-মেয়াদী প্ল্যানে অর্থাৎ কুড়ি বছরের ভেতর রুশ ও তুরস্কের মত দেশে নিরক্ষরতা দূরীকৃত হবে এই স্থির করে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া দরকার। এ প্ল্যান বা পরিকল্পনার প্রথম দু তিন বছর কেটে যাবে বুনিয়াদী শিক্ষক তৈরী করার কাজে, সুতরাং ছেলেমেয়েদের এই নতুন ধরণের শিক্ষা ব্যাপকভাবে শুরু হবেনা তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসরের আগে। এতে অধীর হলে চলবে না। সুচিন্তিত পরিকল্পনা মাফিক্ কাজ শুরু হতে দেরী হয়। কিন্তু একবার শুরু হলে, পরে পাঞ্জাবমেলের বেগে না হলেও অন্ততঃ বেশ দ্রুত নিরঙ্কুশভাবে চলতে থাকে। একথা ঠিক, প্রথমাবস্থায় দেখে তাক্ লেগে যায় এমন কিছু ঘটবে না (শিক্ষায় তাক্-লাগানো জিনিষের কারবার আমরা করিনে) তবে কয়েক বৎসরের ভেতর দেশের জনতার ভেতর যে একটা অভাবনীয় কল্যাণকর পরিবর্ত্তন আসবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পরিকল্পনার গোড়ার কাজ হোল নির্দ্ধারণ করা আবশ্যিক ভাবে কত সংখ্যক ছেলেমেয়েকে কতদিন ধরে শিক্ষা দিলে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকৃত হয়ে নাগরিক কর্ত্তব্যাধিকারসম্বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ সত্যিকারের

মানুষ সৃষ্টি হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ৬ থেকে ১৪ পর্য্যন্ত কিন্তু অর্থের অভাব, নতুন ধরণের শিক্ষিত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি নানাকারণে প্রথমেই শিক্ষালয়গুলোকে পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভবপর হবে না, অথচ পাঁচ বছরের কম হলে, শিক্ষা নামমাত্র হয় শুধু, এমন কি নিরক্ষরতাও ভালভাবে দূর হয়না। তাই অন্ততঃ পাঁচটী শ্রেণী সম্বলিত স্কুলের ব্যবস্থা আমাদের কর্ত্তে হবে প্রথম থেকেই যাতে ৬ থেকে ১১ বৎসরের ছেলেমেয়েরা আবশ্যিক ও অবৈতনিক ভাবে শিক্ষালাভ কর্ত্তে পারে এবং পরে সেগুলোকে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে একটী একটী করে শ্রেণী বাড়িয়ে অষ্ট শ্রেণী সম্বলিত শিক্ষালয়ে পরিণত করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা প্রায় দু কোটি পঁচিশলক্ষ (২,২৫,০০,০০০), সুতরাং ছ বছর থেকে এগার বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার সংখ্যা ধরে নেওয়া যেতে পারে বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (২২, ৫০,০০০) অর্থাৎ পূর্ণ লোকসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। পঞ্চশ্রেণী সম্বলিত স্কুলগুলোর প্রতি শ্রেণীতে যদি ত্রিশ জন করে ছেলেমেয়ে নেওয়া হয়, (এর বেশী হলে ক্লাশ হাটের মত হয়ে দাঁড়ায় ও ব্যক্তিগত নজর রাখা সম্ভব হয় না, অর্থের অভাব না হলে শ্রেণীতে কুড়ি জনের বেশী নেওয়া উচিত নয়), তাহলে প্রতি স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হবে $৫ \times ৩০ = ১৫০$ একশ পঞ্চাশজন। সুতরাং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ৬—১১ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য আমাদের দরকার হবে মোট পনর হাজার বুনিয়াদী স্কুলের ($\frac{২২,৫০,০০০}{১৫০} = ১৫,০০০$)

এখন দেখা যাক শিক্ষকের সংখ্যা সেই অনুপাতে কি প্রয়োজন হয়। পঞ্চশ্রেণী-সম্বলিত স্কুলে কমের পক্ষে অন্ততঃ ছ টি করে শিক্ষক থাকা প্রয়োজন, সুতরাং শিক্ষকের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় নব্বই হাজার (৯০,০০০)। বঙ্গচ্ছেদের পর পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণের সংখ্যা প্রায় ৩২,০০০ কিন্তু এঁদের যদি বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্ত্তে হয়, তা হলেও ট্রেনিং দিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ প্রায় নতুন শিক্ষকের সামিল করে তৈরী

করে নিতে হবে। এঁদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাঁদের নিশ্চয়ই এ কাজে নিয়োজিত কর্ত্তে হবে, পুরোনো দিনের শিক্ষক বলে তাঁদের ঠেলে ফেলে দিলে চলবে না। যা হোক, তা হলে দেখা যাচ্ছে নব্বই হাজার শিক্ষককেই ট্রেনিং দেওয়া দরকার, অর্থাৎ কুড়ি বছর ধরে প্রতি বৎসর আমাদের ৪৫০০ করে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক তৈরী কর্ত্তে হবে। কিন্তু আমরা প্রথম দুতিন বৎসর বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষক তৈরী কর্ত্তে পার্ব্বো না কারণ তাঁদের যাঁরা তৈরী কর্ব্বেন তাঁদের (অর্থাৎ তাঁদের অধ্যাপকদের) তৈরী কর্ত্তে হবে আগে এবং বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকদেরও ট্রেনিং সম্ভব হলে এক বছর দিতে হবে। কাজেই বস্তুতঃ সতের আঠার বছরের বেশী আমরা পাচ্ছিনা এই নব্বই হাজার শিক্ষক তৈরী কর্ত্তে, সুতরাং বছরে অন্ততঃ ৫০০০ থেকে ৫৩০০ বুনিয়াদী শিক্ষক তৈরী কর্ত্তে হবে।

একশটি ট্রেনিং স্কুলে দু বছর বা এক বছর ট্রেনিংয়ের পর যদি পঞ্চাশ জন করে শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী তৈরী হন, তাহলে আমাদের বাৎসরিক পাঁচহাজার শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী যাঁরা দেশকে, দেশের মনকে সত্যিকারের মুক্ত কর্ব্বেন, তাঁদের পেতে কোন বিশেষ বেগ পেতে হবে না। অনেকে মনে করেন শিক্ষকের সংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়াতে হলে এবং ব্যয়সংক্ষেপ কর্ত্তে হোলে দু দফায় যদি ট্রেনিং স্কুল-গুলোতে কাজ করা হয় তা হলে অনেক সুবিধে হয়। কিন্তু ট্রেনিং স্কুলগুলো নতুন ধরণের শিক্ষা দেবে, তাদের কাজ যেমন ব্যাপক হবে ও শিক্ষাক্ষেত্রের সকল দিক আবেষ্টন করবে, তাতে তাঁদের দিবারাত্রই 'সাফাই', লেখাপড়া থেকে শুরু করে প্রার্থনা সভা পর্য্যন্ত কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে, কাজেই এ ধরণের শিক্ষালয়ে দু দফায় শিক্ষার কথা উঠতেই পারেনা। বরং নেহাৎ প্রয়োজন হলে ছ মাস দিবারাত্রি ট্রেনিং দিয়ে শিক্ষক তৈরী করে নেওয়া ভাল।

শিক্ষার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে হলে প্রত্যেকটী বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে বা ট্রেনিং স্কুলে অন্ততঃ ছজন করে শিক্ষক থাকা দরকার, এখনকার গুরুট্রেনিং স্কুলের দু তিনজন শিক্ষক নিয়ে একাজ

চলবে না। নই তালিমের মূল প্রকৃতি, শিশু মনস্তত্ত্ব, আধুনিক শিক্ষা প্রণালী, সমাজ ও সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্ক, অঙ্কন, নাচ, গান, বিভিন্ন রকমের বৃত্তি ইত্যাদি নানাধরণের বিষয়ের জন্য ছজন শিক্ষকের কমে কিছুতেই হতে পারে না। কাজেই অন্ততঃ তিনজন সাধারণ শিক্ষক, একজন সঙ্গীত ও চারুকলা শিক্ষক ও তুজন বৃত্তিশিক্ষক প্রয়োজন। সুতরাং একশটী ট্রেনিং স্কুলের ছয়শত শিক্ষকের ভেতর ৩০০ সাধারণ শিক্ষক, একশ সঙ্গীত ও চারুকলা শিক্ষক, ও তুশ বৃত্তিশিক্ষক প্রয়োজন। যদি ধরে নেওয়া যায় চারুকলা শিক্ষক আর্ট স্কুল বা শান্তিনিকেতন থেকে এবং বৃত্তিশিক্ষক গ্রাম বা শহরে তাঁতী, জেলে, ও কারিগরের ভেতর থেকে পাব অর্থাৎ সরকার থেকে তাঁদের শিক্ষার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে না, তবু তিন শ জন বুনিয়াদী শিক্ষকের শিক্ষণের ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। যদি ওয়ার্ধা বা অন্য কোন বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রয়োজন সংখ্যক শিক্ষক ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসা যেতো, তা হলে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের এ দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রয়োজন হত না, শুধু শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যয় ভার গ্রহণ করলেই চলতো। কিন্তু ওয়ার্ধা বা অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র ১০ জন ১২ জনের বেশী বাঙ্গলাদেশ থেকে নিতে স্বীকৃত হচ্ছেন না কারণ তাঁদের অন্যান্য প্রদেশের চাহিদাও মেটাতে হচ্ছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে তুটী বুনিয়াদী ট্রেনিং কলেজের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার মনে হয় মেদিনীপুর অন্তর্গত বলরামপুর ও ২৪ পরগণা অন্তর্গত ধামুয়াতে এ তুটী ট্রেনিং কলেজ অনায়াসে স্থাপিত হতে পারে। বলরামপুর বাংলায় বুনিয়াদী শিক্ষার পথ প্রদর্শক এবং তুর্দ্দিনের জলঝড়ের ভেতরও এর ক্ষীণ আলোকবর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত হতে দেয় নি, আজ সে আলোকবর্ত্তিকার পূর্ণ ভাস্বর দীপ্তিতে বাংলাদেশ উদ্ভাসিত করার সময় এসেছে। ধামুয়াতে কৃষি, মৎস্য-পালন, কাপড়-রঙ্গান, সূতো-কাটা ও তাঁত ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে এবং নীলাকাশের তলায় এর সুবিস্তীর্ণ উদ্যানে মন স্বতঃই মুক্ত উদার হয়ে

ওঠে—ধামুয়া শিক্ষোপযোগী স্থান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলকাতার অতি নিকটবর্ত্তী বলেও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এর মূল্য যথেষ্ট।

প্রত্যেকটী ট্রেনিং কলেজে দেড় শ করে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বছরে তৈরী কর্ল্লে ট্রেনিং স্কুলের তিন শ সাধারণ শিক্ষক আমরা পেয়ে যাব এক বছরের ভেতর, না হয় খুব বেশী হলে দু বছরই লাগবে। বলরামপুর ও ধামুয়াতে আরো অল্পবিস্তর ইমারৎ তৈরী করে নিতে হবে একথা ঠিক কিন্তু সেটা মোটেই কোন প্রতিবন্ধক নয়। হুগলী নর্ম্মাল বা ট্রেনিং স্কুলেও (সেখানে মাধ্যমিক স্কুলের নিম্নশ্রেণী গুলোর জন্য শিক্ষক তৈরী হয়) অনায়াসে একটী বুনিয়াদী ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা যায়। এটী সরকারের হাতেই। পূর্ব্বেই বলেছি ট্রেনিং স্কুলগুলোর আর তিন শ শিক্ষক আসবে আর্ট স্কুল, শান্তিনিকেতন, সুরুল, এবং গ্রাম ও সহরের কর্ম্মজীবিগণ থেকে। এ ব্যবস্থা হলে আমাদের এক শ ট্রেনিং স্কুলে বাৎসরিক পাঁচ হাজার বা ততোধিক বুনিয়াদী শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী তৈরী করার কাজ নির্ব্বিঘ্নে চলতে পারে এবং বৎসরে আমরা ৮৩০টীর ওপর বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলতে পারি। এ হিসেবে সতের বছরে পনর হাজার বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের ভেতর দিয়ে পশ্চিম বাংলার নিরক্ষরতা দূর করে কিশোরকিশোরীদের কর্ম্মক্ষম, সমাজচেতন, স্বাধীনচেতা, স্বাবলম্বী নাগরিক করে তুলতে সক্ষম হব।

সম্প্রতি যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে অগ্রসর শম্বুকগতিতে চলবে, এতে আমাদের খুশী বা নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়। ওয়ার্ধা শিক্ষাপ্রাপ্ত বারজন অধ্যাপক অধ্যাপিকা হয়ত একটী ট্রেনিং কলেজ খুলতে নিদিষ্ট হবেন এবং বলরামপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত ৫০ জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর ভেতর কুড়িজন হবেন বুনিয়াদী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী ও আর ত্রিশজন হবেন সহকারী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী। এতে এক বছর পর মাত্র দুশ্রেণী-সম্বলিত ষোলটী বুনিয়াদী প্রাথমিক স্কুল বা মাত্র আটটী পাঁচ শ্রেণী সম্বলিত বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষালয় খোলা সম্ভব কিন্তু দরকার হচ্ছে প্রতি বৎসর

অন্ততঃ ৮৩০টী পাঁচশ্রেণী-সম্বলিত বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষালয় খোলা, যদি সতর বছরের ভেতর আমরা মোছাতে চাই দেশের নিরক্ষরতা-কলঙ্ক-কালিমা। কাজেই এ ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়।

এখন টাকার দিকটা দেখা যাক। এটা মোটামুটি ঠিক হয়েছে বুনিয়াদী স্কুলের গ্রাজুয়েট প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর বেতন হবে মাসিক ৭৫৲—১৫০৲ এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ সহকারী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর বেতন হবে মাসিক ৪৫৲—৮০৲। সুতরাং প্রত্যেকটী ছ শিক্ষক সম্বলিত বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির খরচ বাৎসরিক হবে ৫০০০৲ টাকা, * সুতরাং ৮০০ স্কুলের পৌনঃপুনিক বাৎসরিক খরচ হবে ৪০,০০,০০০ লক্ষ টাকা এবং শেষ পর্য্যন্ত পনের হাজার স্কুলের খরচ হবে বাৎসরিক সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এটা একটা জাতির পুনর্গঠন বা পুনর্জ্জন্মের জন্য অতি সামান্যই খরচ। আমি স্কুল স্থাপনার অপৌনঃপুনিক এককালীন খরচটার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছিনা কারণ সেটা সাধারণতঃ জাতীয় ঋণ বা "ন্যাসান্যাল ডেট" থেকেই সব দেশে আসে। দ্বিতীয়তঃ আমরা একেবারে নিঃসম্বল নই, আমাদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের চোদ্দ পনর হাজার প্রাথমিক স্কুল ও তাদের ইমারৎ ইত্যাদি আছে; অবিলম্বে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো সংশোধনযোগ্য সেগুলো সংশোধন করে কার্য্যোপযোগী করে তোলা যায়, তাতে স্কুল স্থাপনার খরচ অনেক কমে যাবে। নতুন স্কুল স্থাপনার অপৌনঃপুনিক এককালীন খরচ হিসেব করে দেখা গেছে দু ধরণের স্কুলের জন্য দুরকম :—তাঁত, কাঠ ও লোহার কাজ ইত্যাদি বৃত্তিগত স্কুল স্থাপনা খরচ, জমির দাম শুদ্ধ হচ্ছে ৫৫০০৲ টাকা এবং কৃষি-শেখানো স্কুল স্থাপনার খরচ হচ্ছে ৮০০০৲ টাকা। আশা করি বর্ত্তমান প্রাথমিক স্কুলগুলোকে ব্যবহার কর্ল্লে অপৌনঃপুনিক খরচের অংশটা খুবই কমে যাবে তবে যতদিন না

---

* ৬১ পৃষ্ঠায় যে খরচের কথা বলা হয়েছে তা ওয়ার্ধা বেতন-হার সম্মত।

একটী শিক্ষা জরীপ (Educational Survey) হচ্ছে ততদিন কোথায় কি ধরণের স্কুল হবে এবং এক একটী স্কুলের অপৌনঃপুনিক খরচ কি হবে ঠিক বলা যাবে না।

তারপর কথা ওঠে ট্রেনিং স্কুলগুলোর খরচের কথা। বাৎসরিক পাঁচ হাজার বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে ট্রেনিং দিতে পারে আমাদের এমন একশত বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষালয় বা শিক্ষণকেন্দ্র প্রয়োজন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে সাঁইত্রিশটী গুরু ট্রেনিং স্কুল ও গুরু ট্রেনিং কেন্দ্র আছে। এগুলোকে ব্যবহার করলে খরচ অনেকাংশে কমে যাবে তা বলা বাহুল্য। অবিশ্যি পূর্ব্বেই বলেছি এ ট্রেনিং স্কুলগুলোর শিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়ে অন্ততঃ ছটী করে শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী প্রতি ট্রেনিং স্কুলে রাখতে হবে। বর্ত্তমানে যাঁরা সেখানে শিক্ষকতা কর্চ্ছেন তাঁদেরও ট্রেনিং কলেজে একবছর বা ছমাস ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া দরকার। বর্ত্তমানের গুরু ট্রেনিং স্কুল ও গুরু ট্রেনিং কেন্দ্র গুলোকে ব্যবহার কর্লে আরেকটী বিশেষ স্থবিধে হবে খরচের দিক দিয়ে। ট্রেনিং স্কুল বা কেন্দ্রের সঙ্গে একটী করে প্রাথমিক বিত্থালয় সংশ্লিষ্ট থাকে যাতে ট্রেনিং প্রার্থী শিক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষকগণের চোখের সামনে অধীত বিদ্যার ফল ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় প্রয়োগ কর্ত্তে পারেন এবং সে প্রয়োগে অন্তরায় ঘটলে তাঁদের শিক্ষকদের উপদেশে তা দূর কর্ত্তে পারেন। বর্ত্তমান গুরু ট্রেনিং স্কুল বা কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে একটী করে স্কুল সংশ্লিষ্ট আছে, গুরু ট্রেনিং স্কুল ও কেন্দ্রগুলো ব্যবহার কর্লে আমরা সে স্কুল গুলোর সহায়তাও পাব, ব্যয়ের ভারও অনেকটা লাঘব হয়ে যাবে। অবিশ্যি যেখানে একেবারে নতুন ট্রেনিং স্কুল খুলতে হবে সেখানে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটী বুনিয়াদী স্কুলও খুলতে হবে। যদি এই সাঁইত্রিশটী ট্রেনিং স্কুল কাজে লাগানো যায় কিছু অদলবদল করে, তা হলে আর বাটটী ট্রেনিং স্কুল স্থাপন কর্লেই আমাদের প্রায় এক শ ট্রেনিং শিক্ষালয় ও কেন্দ্র মোটামুটি পাওয়া যায়। সম্প্রতি পঞ্চাশটী ট্রেনিং

স্কুল ও কেন্দ্র নিয়েও কাজ শুরু করা যেতে পারে।* প্রধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর বেতন ১৫০৲—৩৫০৲ টাকা ও অন্যান্য শিক্ষকের বেতন ১০০৲—২০০৲ ধরে ছ শিক্ষক সম্বলিত ট্রেনিং স্কুলের অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচাসমেত বাৎসরিক পৌনঃপুনিক ব্যয় হবে বার হাজার টাকা এবং পঞ্চাশটীর বাৎসরিক খরচ হবে ছ লক্ষ টাকা। কারিগর, তাঁতী, চাষী ইত্যাদি যদি আংশিক কাজ করেন তবে সম্পূর্ণ বেতন না পেয়ে আংশিক বেতনই পাবেন, তাতে অবিশ্যি খরচের লাঘব হবে। অপৌনঃপুনিক খরচ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যা বলেছি তা এ ক্ষেত্রেও খাটবে।

ট্রেনিং কলেজ দুটীর খরচের কথা আমি বিশেষ করে বলতে চাইনে কারণ এ জিনিষটী হবে অতি সাময়িক ব্যাপার। দু এক বছরের ভেতর আমাদের ট্রেনিং স্কুলের প্রয়োজন সংখ্যক (৩০০) শিক্ষক তৈরী করার পর এদের আর কোন কাজ থাকবে না। ট্রেনিং কলেজের বার্ষিক খরচ প্রায় ৫০, ০০০ হাজার টাকা, দুটীর হবে প্রায় একলক্ষ টাকা কাজেই সম্প্রতি বাৎসরিক পৌনঃপুনিক খরচ দাঁড়াচ্ছে :—

আটশত বুনিয়াদী শিক্ষালয়	৪০,০০,০০০
পঞ্চাশটি শিক্ষণ শিক্ষালয়	৬,০০,০০০
দুটী ট্রেনিং কলেজ	১,০০,০০০
	৪৭,০০,০০০

অপৌনঃপুনিক খরচের অঙ্ক ফেলা শক্ত কারণ আমাদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলো কি পরিমাণে কাজে লাগানো যাবে এবং কি ধরণের স্কুল কতগুলো করে হবে তার ওপরে সেটা নির্ভর কর্ব্বে, তবে মোটামুটি এ রকম একটা ধরা যেতে পারে :—

* আটশত বুনিয়াদী শিক্ষালয়	৫৬,০০,০০০
পঞ্চাশটি শিক্ষণ শিক্ষালয়	২,৫০,০০০
	৫৮,৫০,০০০ বা ষাট লক্ষ

* প্রতি স্কুলে এক শ জন করে ট্রেনিং দিলে ফল একই দাঁড়াবে।

* শতকরা ৩০টী কৃষি ও ৭০টী অন্যবৃত্তি-মূলক স্কুল। এ ছাপান্ন লক্ষ টাকা অবিশ্যি দশ বার বছর ধরে বার্ষিক ব্যয় হবে। শিক্ষা জরীপের (Educational Survey) সাহায্যে এ বিষয়টী পরে আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

শুরু হিসেবে এক কোটি টাকা প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য খরচ করা কোন প্রগতিশীল গভর্মেণ্টের পক্ষে কঠিন হতে পারেনা ; সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী ইত্যাদি ব্যয় কর্চ্ছেন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, কাজেই আর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা মোটেই দুঃসাধ্য হবে না।

আমি আজ প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটী লটারী খোলবার কথা নানাস্থানে নানা সংসদে বলে এসেছি আয়ারলণ্ডের হাঁসপাতাল লটারীর নজির দেখিয়ে কিন্তু কোন ফল হয়নি, কিন্তু এর প্রয়োজন আজ হয়েছে। অনেকের বোধ হয় একথা জানা নেই যে প্রায় দুশ বৎসর আগে লণ্ডনে "বৃটীশ মিউজিয়েম" (The British Museum) স্থাপনায় অর্থের অভাব হওয়াতে রাষ্ট্র লটারী খুলে মণ্টাগু হাউস ক্রয় করবার অর্থ সংগ্রহ করেন এবং সে অট্টালিকায় এই পৃথিবীবিখ্যাত পাঠাগার স্থাপন করেন। অবিলম্বে 'বুনিয়াদী শিক্ষা লটারী' বলে একটী লটারী সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটবে এ আশঙ্কা অত্যন্ত অমূলক, যাঁরা অন্যভাবে অর্থের ব্যয় বা অপব্যয় কর্ত্তেন তাঁদেরও একটা পথ খুলে দেওয়া হবে জাতির ভবিষ্যৎ গড়বার। কোন যুক্তিতেই বুনিয়াদী শিক্ষা লটারীকে ঘায়েল করা যাবে না এই আমার বিশ্বাস। জাতির জীবন মরণ যে কাজের ওপর নির্ভর কর্চ্ছে; সে কাজের জন্য লটারী প্রবর্ত্তন কর্ত্তে ইংলণ্ড বা আয়ারলণ্ডের বিবেকে যদি না বাধে, তা হলে আমরা এমন কি বিবেকচেতন হয়ে উঠলুম যে রাষ্ট্র পরিচালিত লটারীর অর্থে দেশে জ্ঞান ও স্বাস্থ্যের সম্পদ ছড়িয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ কর্ব্ব ?

স্বল্পব্যয়ী শিক্ষা

বাংলাদেশে স্কুলগুলির অবস্থা আজ অতি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ; ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে বটে কিন্তু স্কুল থেকে যে জিনিষগুলো তাদের পাওয়া উচিত—স্বাস্থ্য, চরিত্র, জ্ঞান, গুরুভক্তি, লোকসেবাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সেগুলো তারা পায় না। আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসেছে যে বহু অর্থব্যয় ব্যতীত স্কুলগুলোর উন্নতি অসম্ভব। একথা সত্য যে অর্থ থাকলে হয়তো স্কুলগুলোর উন্নতি অনেকটা সহজ হয়ে আসতো ; কিন্তু একথাও বোধ হয় আরো বেশী সত্য—শিক্ষায় অর্থের চাইতেও অনেক বেশী মূল্য হচ্ছে—শিক্ষক ও ছাত্রের ঐকান্তিক চেষ্টার। আমাদের হাতে টাকা নেই ; কিন্তু তা বলেতো হাত গুটিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না ; বিশেষ করে যখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে টাকা ছাড়াও বা অতি স্বল্প ব্যয়ে শুধু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে শিক্ষার ধারায় একটা নতুন যুগ এনে দেওয়া যায়। এই প্রবন্ধে কোন্ পথে এগুলে আমাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সেই কথারই অবতারণা করব।

১। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য—খেলাধুলো, ব্যায়াম ঃ—

স্বাস্থ্যই জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ; কিন্তু বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য এত শোচনীয় যে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও জীবনে তারা অনেক সময়ই কিছু করে উঠতে পারে না। হয়তো পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আছে, কিন্তু নিয়মিত ব্যায়ামের অভাব তার চাইতে যে অনেক বেশী আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ছেলেমেয়েদের নিয়মিত ব্যায়ামের দিকে।

ড্রিল বা অন্য কোনরূপ ব্যায়াম ছেলেমেয়েরা বেশী পছন্দ করে না—তাদের ঝোঁকটা থাকে খেলাধুলোর উপরেই। কিন্তু খেলাধুলোর সুবন্দোবস্ত স্কুলগুলোতে নেই। যাতে সকল ছেলেমেয়েই দলে দলে বিভক্ত হয়ে পালা করে সপ্তাহে অন্ততঃ চারদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খেলার সুযোগ পায়—সে ব্যবস্থা প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর করা খুবই দরকার। এ ব্যবস্থা করতে গেলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদেরও পালা করে স্কুলের পর খেলার মাঠে থাকতে হয়। কাজটা দূরূহ মোটেই নয়—কারণ গড়পড়তা সপ্তাহে একদিন করেও তাঁদের থাকতে হয় না। স্কুলের খেলারশিক্ষক (Games Teacher) সর্ব্বদা মাঠে উপস্থিত থাকলেও অন্যান্য শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীর পালা করে থাকা দরকার—এই জন্যে যে তা হলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ তাঁরা পাবেন, তারাও তাঁদের আপন করে নিতে শিখবে।

সময় ও সুযোগ অনুসারে দেশী ডন, বৈঠক, সূর্য্যনমস্কার, চারু দেহভঙ্গী, যৌগিক আসন ইত্যাদি ছেলেমেয়েদের শেখানো দরকার, এগুলো একেবারে নিয্‌খরচ কিন্তু স্বাস্থ্য দানে সেরা।

২। ব্রতচারীর ব্রতে লোক বা সমাজ সেবা ঃ—

খেলাধুলোর সম্পর্কে ব্রতচারীদের কথা মনে স্বতঃই জাগে, কারণ ব্রতচারীদের নাচগানটাই এখন পর্য্যন্তও লোকের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ কর্চ্ছে। এ নাচগানের যথেষ্ট মূল্য আছে স্বাস্থ্য ও আনন্দের দিক দিয়ে—কিন্তু ব্রতচারীর ব্রত যাতে নাচগানেই শেষ না হয়, তাও শিক্ষকমহাশয় ও ছেলেদের সবারই দেখা উচিত। ব্রতচারীর জীবনের উদ্দেশ্য শুধু লোহার মত শরীর গঠন করা বা মনে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেওয়াই নয়, তার জীবনের সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে—মানুষ হওয়া, সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা। তাই "জঙ্গল পানা নির্ব্বাসন" শুধু তাদের গানেরই অঙ্গ না হয়ে, কাজেরও অঙ্গ হয়, সে দিকে তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

ব্রতচারীর একটী সঙ্কল্প হচ্ছে সভাসমিতিতে বক্তৃতা ইত্যাদি চুপ করে শোনা—

"একে যবে কথা কয়
অন্য সবে মৌন রয়"

ব্রতচারীদের চেষ্টায় এই নিয়মের যে কত বড় উপকারিতা তা ছেলেরা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে। এটা একটা অতি লজ্জার বিষয় যে আমাদের স্কুলে প্রাইজ-বিতরণ বা অন্য কোন সভার সময় গোলমালে আবৃত্তি বা বক্তৃতাগুলো ভাল করে মোটেই শোনা যায় না। ব্রতচারীর নানা পণে সাম্প্রদায়িক ঐক্য,সমাজ সেবা বা আত্মোন্নতি সম্বন্ধে যে সুন্দর কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো কবে ছেলেমেয়েরা কাজে ফুটিয়ে তুলে নিজেদের জীবনকে গৌরবময় করে তুলবে—আমাদের শুধু সেই স্বপ্ন দেখলে চলবে না—সে স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে তুলতে হবে।

৩। নিঃশব্দ প্রার্থনা—ধর্ম্ম বিষয়ক পাঠ ঃ—

সমাজ সেবা বা পরার্থপরতা নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাপেক্ষ ; ধর্ম্মবিবর্জ্জিত শিক্ষায় নৈতিক চরিত্রের বিকাশ হওয়া যে কত সুকঠিন —তা আমরা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কর্চ্ছি। অথচ এদেশে নানা ধর্ম্মাবলম্বী ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনও বিশেষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব নয় ; কিন্তু নিঃশব্দ প্রার্থনার প্রবর্ত্তন করলে সে সব আপত্তি কিছুই থাকে না ! স্কুল আরম্ভ হবার আগে শিক্ষক মহাশয় ও ছাত্রগণ সকলে একসঙ্গে নতজানু হয়ে দু মিনিটের জন্যও যদি মনে মনে ভগবানকে ডাকতে পারেন, দিনের কাজে ও সৎপথে চলবার জন্য শক্তি ভিক্ষা করতে পারেন, তা হলে ছেলেদের জীবনে যে মস্ত বড় একটা পরিবর্ত্তন আস্‌বে এটা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। কোন সম্প্রদায়ের মনে যাতে আঘাত না লাগে এ ভাবে শিক্ষক মহাশয় ও ছাত্রগণ নিজেরাও মধ্যে মধ্যে নতুন নতুন প্রার্থনা রচনা করে নিতে পারেন। সবাক বা নির্ব্বাক প্রার্থনা যখন যে রকম

মনঃপূত হয়, তখন সে রকম চলতে পারে। ভারতের নানা ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জন্মাবার আরেকটী প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে নানা ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ হতে মনোনীত পাঠ। বাইবেল, কোরাণ, বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে তাদের অমর উপদেশাবলী সুন্দর করে আবৃত্তি বা পাঠ করলে ও পরে এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করলে ছেলেদের নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরধর্ম্মে শ্রদ্ধাও জেগে ওঠে। গান্ধীজীর প্রার্থনাসভার আদর্শ প্রতি বিদ্যায়তনে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুকরণীয়।

এই সকল গ্রন্থ থেকে পাঠ মনোনীত করবার ভার উপরের ক্লাশের ছেলেরা যদি নিতে পারে, তাহলে আরো ভাল হয়।

৪। সাধারণ জ্ঞান—হালের খবর :—

দুঃখের বিষয় আমাদের স্কুলগুলোতে শুধু নৈতিক উন্নতিই যে হয় না তা নয়, মানসিক উন্নতিও খুবই কম হয়। আমাদের যা কিছু বিদ্যে সবই পুঁথি মুখস্থ করা—পুঁথি মুখস্থ করা আমাদের এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে পুঁথির বাইরের কোন খবর আমরা রাখি না বা অন্য কোন বিষয় চিন্তাও করি না। তাই আমাদের ছেলেদের সাধারণ জ্ঞান এত কম এবং আই-সি-এস, বি-সি-এস, হতে আরম্ভ করে অন্যান্য ছোট চাকুরীর পরীক্ষায়ও এই বিষয়ে তারা অতি সামান্য নম্বর পায়। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান না থাকলে যে জগতে আমরা বাস কর্চ্ছি সে জগতটাকেই আমরা বুঝতে পারিনে—আমাদের চারপাশে যে নানারকম আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটছে তা আমাদের কাছে একটা দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালীই থেকে যায়। ধরা যাক—এরোপ্লেন বা বেতারবার্ত্তার কথা। আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞান না থাকলে এ আশ্চর্য্য জিনিষ কি করে সম্ভব হল বোঝা অসম্ভব। আবার আমাদের ছেলেরা খবরের কাগজ পড়ে না বলে, হালের কোন খবরই রাখে না—জগতের কোথায় কি হচ্ছে,

অন্য দেশের তুলনায় দেশের কি অবস্থা, আমরা কতটা পেছিয়ে পড়ে আছি,—কোন্ বিষয়ে আমাদের উন্নতি হয়েছে, এ সকল খবরও তারা রাখে না, এ বিষয়ে চিন্তাও করে না। আমরা যারা শিক্ষকতার কাজ করি নিজেরাই অতি কদাচিৎ নিয়মিত ভাবে খবরের কাগজ পড়ি—কাজেই এ বিষয়ে ছেলেদের দোষ দিলে চলবে কেন? আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ছেলেদের হাতে তাদের পাঠোপযোগী কতগুলো বই দেওয়া যা থেকে তারা নানা বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান আহরণ করতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি শ্রেণীর উপযোগী করে নানা বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নাবলী ক্লাসে আলোচনার জন্য তৈরী করে নেওয়া দরকার। খবরের কাগজও যাতে ছেলেরা নিয়মিত ভাবে পড়ে এবং পড়ে বুঝতে পারে সে ব্যবস্থাও করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি ক্লাসে একটী "হালের খবরের বোর্ড" (Current Events Board) রাখা দরকার—এতে ছেলেরা খবরের কাগজ থেকে ছবি, বিশেষ খবর বা প্রবন্ধ ইত্যাদি কেটে পিন দিয়ে এঁটে রাখতে পারে। এই বোর্ড কেনবার দরকার নেই, ছেলেরা নিজেরাই তৈরী কর্ত্তে পারে। উঁচু ক্লাসে খবরের কাগজের ভেতর দিয়ে স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্ফুরণ খুব সুন্দর ভাবে হতে পারে। অনেক সময় একই ঘটনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কাগজে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ বা মত প্রকাশ করা হয়। শিক্ষকমহাশয় যদি এরকম দু তিনখানা কাগজ নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করেন, তা হলে কোন্ বিবরণ কতটা সত্য হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের মাথা ঘামাতে হয়, চিন্তা করতে হয় এবং খবরের কাগজের সব মতগুলোই যে মেনে নিতে হবে তাও আর মনে হয় না। স্কুলে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা অনেকের মত নেই, কিন্তু উপরের দিকের ক্লাশগুলোতে কেন করা যাবে না তা আমি বুঝতে পারিনে, বরং না করারই বিপদ অনেক বেশী। ছেলেরা বাইরে বা ঘরে রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক মিথ্যা বা অর্দ্ধ সত্য খবর শোনে, স্কুলের আলোচনায় যদি সেগুলো মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়—অন্ততঃ ছেলেরা

বুঝতে পারে এর অন্য একটা দিকও আছে—সেটাও কি একটা মস্ত বড় লাভ নয়? ছেলের স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্ফুরণ হলে সে বিচার না করে কারো কথা বা কোনও মত মেনে নিতে চাইবে না, এতে যে কত রকম বিপদ থেকে সে ভবিষ্যতে উদ্ধার পাবে তা না লিখলেও চলে বোধ হয়।

একটা কথা হতে পারে এই 'সাধারণ জ্ঞান' ও 'হালের খবরাখবরের' জন্য স্কুলের সময় তালিকার মধ্যে কোন স্থান আছে কি? সম্প্রতি নেই, কিন্তু অনায়াসেই করে নেওয়া যায়। ত্রিশ মিনিটের একটী ক্লাস, এর জন্য করে নেওয়া দরকার, সপ্তাহে তিন দিন 'সাধারণ জ্ঞান' আর তিন দিন 'হালের খবরাখবর'। এগারটায় স্কুল শুরু না করে ১০½ টায় করলেই আমরা এ আধ ঘণ্টা পেতে পারি, অথবা প্রতি ঘণ্টা থেকে চার মিনিট করে কেটে নিলেও হতে পারে, তাতে কারো কোন অসুবিধে হয় না। কতকগুলো প্রগতিশীল স্কুলে এ ব্যবস্থা এ ভাবে করা হয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগ শিক্ষালয়ে এর কোন বন্দোবস্ত হয়নি। আজ এই নিয়ে কথা হতে পারে, কিন্তু দুদিন পরে এর জন্য সময় কর্ত্তেই হবে, কারণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় না হলেও জীবনের পরীক্ষায় কর্ত্তব্যাধিকারসন্বুদ্ধ নাগরিকের পক্ষে সাধারণ জ্ঞান অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫। আলোচনা ও বিতর্ক (Debates) :—

ছেলেদের চিন্তাশক্তির স্ফুরণ হতে পারে বিশেষ করে আলোচনা ও বিতর্কের ভেতর দিয়ে। মধ্যম মানগুলো হতে আরম্ভ করে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীতেই একটী একটী এবং সমস্ত স্কুলের জন্য ভিন্ন একটি 'আলোচনা সমিতি' থাকা উচিত। এর সভাপতি শিক্ষকমহাশয়রা হতে পারেন, কিন্তু যতদূর সম্ভব ছেলেদেরই কার্য্যনির্ব্বাহভার গ্রহণ করা উচিত—শিক্ষকমহাশয়দের পরামর্শ অনুসারে এবং কোন্ দল কোন্ বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে তাও শিক্ষকমহাশয়দেরই ঠিক করে দিতে হবে। দুই দলের

তর্ক বিতর্কের ঘাত প্রতিঘাতে যে কোন বিষয়ে সত্যের স্বরূপ ধরা ছেলেদের পক্ষে সহজ হয়ে আসে, এবং যে সিদ্ধান্তেই তারা আসুক না কেন, সে সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয় তাদের চিন্তাশক্তির ভেতর দিয়ে। ছেলেরা এসব সভা সমিতি ভালও বাসে খুব কারণ এতে তারা একটা নতুন জিনিষের স্বাদ পায়, কাজেই এ দিকে তাদের উৎসাহিত করাও খুব সহজ?

৬। **ক্লাশ লাইব্রেরী**:—

আগেই বলেছি চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য নানারকম বই পড়ে ছেলেদের তথ্যসংগ্রহ করা দরকার, কিন্তু পুস্তক পাঠে অনুরক্তি না থাকলে তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে আগ্রহ থাকবে না এ বেশ বোঝা যায়। এই পুস্তকানুরক্তিও অভ্যাসগত; যদি অল্প বয়স হতেই নানাবিষয়ে সুন্দর সুন্দর গল্পের বই হাতে পড়ে, তাহলে স্বতঃই বইয়ের দিকে মন যায়, এবং পরে কঠিন বই পড়ে তথ্যসংগ্রহ কর্ত্তেও কষ্ট হয় না বরং ভালই লাগে। এই পুস্তকানুরক্তি ছোটবেলা থেকেই যাতে ছেলেমেয়েদের হয় সেজন্য প্রতি ক্লাসে একটী আলমারীতে (ছেলেমেয়েদের-তৈরী-করা আলমারীতে) সেই ক্লাসের উপযোগী ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, সাহিত্য ইত্যাদি নানাবিষয়ক গল্পের বই রাখা হবে—সুন্দর ছবিওয়ালা বইগুলো চোখের সামনে দেখলে ছেলেমেয়েদের পড়বার লোভ হবেই, আর ভাল বই পড়ার মত আনন্দও জগতে বোধ হয় আর কিছুই নেই। স্কুলে যদি বই পড়বার অভ্যেস না গড়ে ওঠে, তাহলে আর কোন দিন হবে না। চিরজীবনের এই অমূল্য সম্পদ থেকে ছেলেমেয়েরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টিত হওয়া উচিত। স্কুল লাইব্রেরী সাধারণতঃ খুব বড় হয় এবং প্রতি শ্রেণীর উপযোগী হিসেবে সেখানে বই সাজিয়ে রাখা হয় না, সেজন্য স্কুল লাইব্রেরীর ব্যবহারও খুব কম হয়। ক্লাসে ক্লাসে শ্রেণীর উপযোগী লাইব্রেরী থাক্‌লে ছেলেমেয়েদের একটা মস্ত বড় অভাব দূর হয়।

প্রশ্ন উঠবে এ সব বই আসবে কোত্থেকে? কলকাতার অনেক বড় বড় পুস্তকের দোকান বই পাঠ্য করবার জন্য বহু সুন্দর সুন্দর বই স্কুলে পাঠায়—সেগুলোর মধ্যে বাছাই করে অনেকগুলো অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে। তারপর প্রাইজ ও 'ঘরে পড়বার' বইও আজকাল নমুনা হিসেবে বিনামূল্যে স্কুলে স্কুলে পাঠানো হয়—সেগুলো এই ক্লাস লাইব্রেরীর জন্য বিশেষ উপযোগী। তারপর যে সকল পুস্তক-বিক্রেতার প্রকাশিত পুস্তক স্কুলে পাঠ্য করা হয় তাঁদের কাছে অনুরোধ করে লিখ্‌লে তাঁরা সানন্দচিত্তে তাঁদের প্রকাশিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেন। আবার অভিভাবক ও শিক্ষকমহাশয়রাও নিজেদের বাড়ী থেকে কিছু বই দিতে পারেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌তে পারি এ জিনিষটা আরম্ভ করলেই সোজা হয়ে যায়, আরম্ভ কর্ব্বার আগ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনে হয় এর যেন কত অন্তরায়—জগতের সব জিনিষ সম্বন্ধেই অবিশ্যি একথাটা খাটে।

৭। ছবি আঁকা, সঙ্গীত চর্চ্চা, ডাকটিকিট সংগ্রহ, বাগান করা ইত্যাদি সখ (Hobbies) :—

বইয়ের উপরে ঝোঁক যেমন একটা খুব ভাল জিনিষ এবং যাতে এই ঝোঁকটা হয় তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা দরকার তেমনি আঁকা, সঙ্গীত চর্চ্চা, ফটো তোলা, নানারকম ডাকটিকিট, প্রজাপতি, শঙ্খ ইত্যাদি সংগ্রহ করা এসব বিষয়ে ছেলেদের স্বাভাবিক আগ্রহকে আমাদের সজীব করে রাখতে হবে। এসব সখ থাকলে ছেলেরা নানা বিষয় শুধু শেখবার সুযোগ পায় তা নয়, তাদের চোখের সামনে এক নতুন স্বপ্নরাজ্য খুলে যায়, একদিনের জন্যও তাদের কাছে জীবনটা নীরস বলে বোধ হবে না—আশে পাশে মন বসাবার মত অনেক জিনিষ থাকবে তাদের, এতই মগ্ন হয়ে থাকবে তারা যে অবসর সময় কি করে কাটছে তা তারা টেরও

পাবে না। প্রথম থেকেই যাতে এই সখগুলো পরিপুষ্টি লাভ করে সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

৮। স্কুল ও ক্লাস সাজানো ; স্কুলের বাগান ঃ—

স্কুল আজ আমাদের গৃহের স্থান অধিকার কর্চ্ছে, সুতরাং লোকের বাড়ীঘর যে রকম সুন্দর করে সাজানো থাকে, স্কুলকেও সেরকম করে সাজিয়ে রাখা দরকার—তাহলে ছেলেদের মন পড়ে থাকবে এই সুন্দর জিনিটীর উপরেই, বিশেষতঃ জিনিষটী যদি তাদের নিজের হাতের গড়া হয়। আমাদের দেশের স্কুলের বারান্দা ও ক্লাসের দেয়ালগুলো একেবারে খালি থাকে, কিন্তু বিলিতি স্কুলগুলোতে সেগুলো নানা রকম সুন্দর ছবি (বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েদের আঁকা), ফুল ও গাছপালার টবে ভর্ত্তি থাকে ; তাতে দেখতেও সুন্দর লাগে, দেয়ালগুলো থেকে শেখাও যায় অনেক—স্কুলের কথা ভাবতেই অন্ধকার স্যাঁত্ স্যেঁতে চিত্রবিহীন ঘরের কথা মনে হয় না। প্রতি ক্লাসে ছেলেদের আঁকা ছবিতো থাকবেই, তাছাড়া স্বাস্থ্য, সাহিত্য, ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ক সুন্দর সুন্দর ছবি রাখা উচিত। সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস কর্ল্লে সৌন্দর্য্যবোধ স্বতঃই জেগে ওঠে। ভাল ভাল স্কুলে ক্লাস ও বারান্দায় মহাপুরুষগণের উক্তিগুলোও সুন্দর করে দেয়ালে চিত্রিত করে রাখা হয়—চোখে দেখতে দেখতে এসব কথা মনে গাঁথা হয়ে যায়।

স্কুল গৃহটী যত সুন্দর করেই রাখা যাক্ না কেন, স্কুল প্রাঙ্গন ও তার আশে পাশে চারদিকে বাগান না থাক্‌লে তাতে যেন প্রাণের অভাব হয়। এই বাগানও ছেলেমেয়েদের হাতের তৈরী জিনিষ হওয়া উচিত—তাদের বিভিন্নদলের উপর বাগানের বিভিন্ন অংশের ভার অর্পণ কর্‌লে তিনচার মাসের ভিতরেই সমস্ত স্কুলটি ফুলের হাসিতে ভরে ওঠে।

৯। হাতের কাজ :—

ছেলেরা নিজের হাতের কাজ দিয়ে স্কুল সাজাবে—এর চাইতে আনন্দের বিষয় আর কিছুই হতেই পারে না—প্রাইজ বিতরণ বা অন্য কোন উৎসবের দিনে স্কুল সাজানোর কথা মনে করে দেখলেই একথা অতি সহজে বোঝা যায়।

এখন যে হাতের কাজের কথা বল্‌ব সেটা একটু অন্য রকমের—সেটা সাজসজ্জার জন্য ততটা নয় যতটা প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনের তাগিদে। আমাদের আজ এ দুরবস্থা হয়েছে যে নিজের হাতে আমরা কোন জিনিষই তৈরী কর্ত্তে পারিনে। কাপড়, গামছা, মগ, বালতি, বই বাঁধা, পুতুল, জামা, চেয়ার টেবিল, কাঠের শেল্‌ফ্ বা তাক্, মোড়া—এ রকম নিত্য ব্যবহারের জিনিষ একটু দেখিয়ে দিলেই ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে অতি অল্প আয়াসে তৈরী করতে শিখতে পার্‌বে —এর জন্য সব সময় আলাদা হাতের কাজের ক্লাস খোল্‌বার প্রয়োজন নেই; একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার লোক থাক্‌লে আপনি আপনিই ছেলেমেয়েরা এগুলো কর্ত্তে পারে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে বছরে অন্ততঃ তিনটি জিনিষ নিজের হাতে তৈরী কর্ব্বে এই প্রতিশ্রুতি মাষ্টারমহাশয়রা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে নেবেন এবং বৎসরের শেষে যে জিনিষগুলো ভাল উৎরেছে সেগুলোকে স্কুল প্রদর্শনীতে স্থান দেবেন। যদি কারো সখ হয় এ ফিরিস্তির বাইরে অন্য কাজ করবার, তাহলে তাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে একথা বলা বাহুল্য। সৃজনীশক্তির অপূর্ব্ব আনন্দের স্বাদ ছেলেমেয়েদের স্কুলে না দিলে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এজন্যই আমাদের শিক্ষার নতুন পরিকল্পনায় এ হাতের কাজের জন্য সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। ভাল কাজ হলে এ থেকে অর্থাগমও যথেষ্ট হয় দেখা গেছে।

১০। আবৃত্তি, কথকতা ও অভিনয় ঃ—

এ কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার কর্ত্তে হয় আমাদের স্কুলের জীবন আনন্দ বা বৈচিত্রময় মোটেই নয়, যাতে ছেলেরা তাদের একঘেয়ে জীবনে আনন্দের সাড়া পেয়ে অন্য দেশের ছেলেরই মত চোখমুখ হাসির দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুল্‌তে পারে আমাদের সে চেষ্টা করা সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য। আমরা জানি ছেলেরা আবৃত্তি করতে ভালবাসে, তারচেয়ে আরো বেশী ভালবাসে অভিনয় কর্ত্তে। এর উপকারিতাও ঢের—উচ্চারণ স্পষ্ট হয়, পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহস আসে, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে জড়তা কেটে যায়। আবৃত্তিগুলো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী থেকে মনোনীত করা উচিত; মধ্যে মধ্যে ছেলেদের নিজেদের রচনা আবৃত্তি করালে তাদের উৎসাহ আরো বাড়ে। আরেক রকম আবৃত্তির কথা এখন বলব—কথকতা ও পাঠ। অবিশ্যি এ ছেলেদের আবৃত্তি নয়, কিন্তু এ শুন্‌তে ছেলেরা ভালবাসে, এবং এ থেকে অনেক জিনিষ তারা শিখতেও পারে। কথকতা ও পাঠ এক সময় আমাদের দেশে খুবই চল ছিল, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ এক জায়গাতেই বসে এই কথকতা শুনে একসঙ্গে হেসেছে কেঁদেছে, তাদের ভেতরে সামাজিক বন্ধনটাও দৃঢ়তর হয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কথকতা ও পাঠ—আমাদের বাংলার যা একান্ত নিজস্ব জিনিষ—তা একেবারেই লোপ পেতে বসেছে। প্রতি স্কুলে অবিলম্বে আবার কথকতা ও পাঠের প্রবর্ত্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন—সে বন্দোবস্ত হলে স্কুলগুলো আবার সামাজিক কৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠবে।

ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে আজকাল অনেক সুন্দর সুন্দর বাঙ্গলা নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু তার চাইতে সাহিত্য থেকে বা নিজেদের মনগড়া কোন গল্প ঠিক করে তারা যদি নিজেদের বিভিন্ন-দলের উপর নাটকের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্ক লেখবার ভার দেয় তা হলে আরো ভাল হয়। তারপর সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ বাঁধা, সিন খাটানো,

প্রোগ্রাম তৈরী করা—এ সবই ছেলেমেয়েদের কাজ আর এ থেকে তারা শেখেও অনেক কিছু। স্কুল অভিনয় বছরে অনায়াসে দুবার হতে পারে—পূজো ও গ্রীষ্মের ছুটীর আগে। অভিনয়ের দিকে ছেলেমেয়েদের একটা স্বাভাবিক টান আছে; আর তা থেকে যখন এত শেখবার আছে, তখন এর সমুচিত ব্যবহার না করাই ভুল।

১১। নানাস্থান ও প্রতিষ্ঠান দর্শন (Education at Visits & Excursions) :—

প্রতি গ্রামে বা সহরে বা তার নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখবার মত অনেক জিনিষ থাকে—ঐতিহাসিক কীর্ত্তি, প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক দৃশ্য, দেবমন্দির, মসজিদ, আদর্শ বিদ্যালয়, যাদুঘর, কারখানা ইত্যাদি। এ সব জিনিষ দেখতে ছেলেরা যে রকম আনন্দ পায় শিক্ষাও পায় বোধ হয় তার চেয়ে বেশী। কারণ আনন্দ ও ঔৎসুক্যের ভেতর দিয়ে যে শিক্ষা হয় সে শিক্ষার ছাঁপ কোনদিন মন থেকে মুছে যায় না। শিক্ষকমহাশয়ের সঙ্গে কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে যাবার আগে তিনি যদি এ সম্বন্ধে ছেলেদের কিছু বলে নেন, তারা সেখানে গিয়ে বিশেষ করে কি লক্ষ্য করবে সে বিষয়ে উপদেশ দেন এবং পরে ক্লাশে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয় বা প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়, তাহলে এইরূপ দর্শনাদি হতে সম্পূর্ণ সুফল আশা করা যেতে পারে। মধ্যে মধ্যে ছেলেরা শিক্ষকমহাশয়ের সঙ্গে বাইরে কোন জায়গায় গিয়ে নিজেদের তাঁবু খাটিয়ে ছুটীর দিনটা আমোদ প্রমোদ করে কাটিয়ে আসতে পারে। যাতায়াত হেঁটে, সাইকেলে, বাস বা নৌকোয় হতে পারে।

১২। স্কুল দিবস ও উৎসব (School Days and Festivals) :—

একঘেঁয়ে জীবন যাতে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠে, আনন্দের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা হয় সে জন্য কতকগুলো স্কুল 'দিবস' বা উৎসবের অনুষ্ঠান করা বিশেষ প্রয়োজন। দুএকটি উদাহরণ দেওয়া

যাক—যেমন প্রতিষ্ঠাতা দিবস, বিদ্যাসাগর দিবস, স্বাধীনতা দিবস, গান্ধী দিবস, বসন্ত বা নবান্ন উৎসব ইত্যাদি। যিনি বহু অর্থ ব্যয়ে ও পরিশ্রমের ফলে স্কুলটী স্থাপন করেছিলেন তাঁর স্মৃতিকে সকল ছেলেরই সম্মান করা উচিত ; তাই "প্রতিষ্ঠাতা দিবসের" উদ্‌যাপন। সে দিন তাঁর জীবনী সম্বন্ধে ছেলেদের বলা হবে, তাঁর বিষয়ে গান ও কবিতা পাঠ করা হবে, স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'বার পর থেকে সেই গ্রাম বা সহরের কি কি উন্নতি হয়েছে এ সব আলোচনা করা হবে। সে রকম বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন, মহম্মদ মহসীন, স্যার আশুতোষ, গান্ধীজী ও আরো বড় বড় লোকের নামে 'দিবস' উদ্‌যাপিত হতে পারে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ উৎসবের ব্যবস্থা ভারতে চিরদিনই ছিল ; ফলফুলসম্ভারে সাজিয়ে প্রকৃতিদেবী বাংলাকে যে অপূর্ব্ব সম্পদ দিয়েছেন, কথায়, গানে, কবিতায় সে আনন্দ প্রকাশ করে বোলপুরের ছেলেরা নানা ঋতু উৎসব করে। গ্রামে সে সব উৎসব তো হতে পারেই, বিশেষ করে হতে পারে নবান্ন উৎসব। এ উৎসব উপলক্ষে খাওয়া দাওয়া, নৃত্য সঙ্গীতাদির আগে খুবই চল ছিল।—আবার এর প্রবর্ত্তন করা দরকার—এবং যে ধান থেকে এই আনন্দের উৎস বইছে, সে ধান কি করে জন্মাতে হয়, সে সম্বন্ধে এই সঙ্গে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা থাক্‌লে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষাও হয়।

এ পর্য্যন্ত স্কুল খোলা অবস্থায় ছেলেমেয়েরা কি করতে পারে তাই বলেছি, এখন দেখা যাক্ বন্ধের ভেতরও খুসী হয়ে তারা করবে এমন কাজ তাদের দেওয়া যায় কিনা।

১৩। গ্রাম বা সহরের তথ্যসংগ্রহ, লোকগীত নৃত্য ও উপাখ্যান উদ্ধার :—

অনেক সময় এটা দেখা যায় ছুটির সময় ছেলেরা (বিশেষতঃ গ্রামের ছেলেরা) বাইরে যায় না বা যেতে পারে না, সে সময়টায় তাদের অবসরও থাকে অনেক, সুতরাং যদি ছুটীর আগেই শিক্ষক-

মহাশয়রা বিভিন্ন দলকে গ্রাম বা সহরের নানা তথ্য সংগ্রহ কর্ত্তে দেন—এই গ্রামে ক'ঘর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নমশূদ্র ইত্যাদি, হিন্দু, মুসলমানের সংখ্যা কত, শিক্ষিত বা নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কত, কি কি প্রতিষ্ঠান গ্রামে আছে, কি কি অনুষ্ঠান হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, তা হলে বন্ধের ভেতর তারা দল বেধে এই কাজে লেগে যেতে পারে। লোকনৃত্য, গীতি, চিত্রকলা ও উপাখ্যানগুলিও গ্রাম থেকে একেবারে লোপ পেতে বসেছিল, শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গগত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় লোকনৃত্য, গীত ও চিত্রকলার কিছু কিছু উদ্ধার হয়েছে কিন্তু কাজ এখনও অনেক পড়ে আছে। ছেলেরা, বিশেষ করে ব্রতচারীরা এ কাজে লাগলে আমার বিশ্বাস তাঁর স্বপ্ন অগৌণে সফল হবে। আমি বলছিনা ছুটী ছাড়া এ কাজ হতে পার্ব্বে না, তবে ছুটীর সময় যে এ কাজ কর্ত্তে বিশেষ সুবিধে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৪। **স্কুল পরিচালনা :—**

এখন স্কুল পরিচালনা যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে সে সম্বন্ধে দুচারটী কথা বলতে চাই।

(ক) শ্রেণীসর্দ্দার প্রথা (Prefect System) :—

শ্রেণীসর্দ্দার প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার দরকার নেই, কারণ এটা প্রায় সকলেরই জানা আছে। প্রতি শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের ভেতর থেকে একজন কি দুজন বেছে নিয়ে তাদের উপর ক্লাশের শৃঙ্খলার ভার দিলে তাদের দায়িত্ব বোধ বাড়ে, শিক্ষকদেরও সর্ব্বদা ছেলেমেয়েদের পেছনে লেগে থাকতে হয় না। প্রতি তিন মাসের জন্য 'সর্দ্দার' নিযুক্ত করতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসে এবং কাজে তারা তৎপর হয়। সকল শ্রেণীর সর্দ্দারদের নিয়ে একটি 'ছাত্র কাউনসিল' গঠিত হতে পারে, এই কাউনসিলের সঙ্গে শিক্ষকমহাশয়দের স্কুল সম্বন্ধে নানা

বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। এতে স্কুলের ভাল তো নিশ্চয়ই হয়, ছেলেমেয়েরাও নিজেদের প্রতিনিধিদের নিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কাজ কর্‌তে শেখে।

(খ) ছেলেমেয়েদের কাছারী (Children's Tribunal) ঃ—

দেখা গেছে শাসন ও শাস্তির ভার ছেলেমেয়েদের হাতে ছেড়ে দিলে সুফল ছাড়া কুফল হয় না—অবশ্য শিক্ষক প্রয়োজনমত ছেলেমেয়েদের কাছারীতে উপস্থিত থাক্‌বেন। ছেলেমেয়েরা লঘু শাস্তির জায়গায় গুরু শাস্তিই বেশী দেয়, সে জায়গায় শিক্ষক-মহাশয়ের বাধা দেবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাক্‌বে।

(গ) আবাস বা দলপ্রথা (The House System) ঃ—

ইংলণ্ডের "পাব্লিক্ স্কুল" নামক স্কুলগুলোতে ছাত্রেরা স্কুলের প্রকাণ্ড আঙ্গিনার চারপাশে তাদের জন্য যে বাড়ীগুলো তৈরী করা হয়েছে তাতেই থাকে, তাদের তত্ত্বাবধান করেন একজন শিক্ষকমহাশয় ও তাঁর স্ত্রী। সাধারণতঃ তিন চারটে বাড়ীতেই স্কুলের ছেলেদের থাকবার জায়গা যথেষ্ট হয়ে যায়। স্কুলটীকে এ ভাবে তিন চারটী "হাউসে" বা "আবাসে" ভাগ করে নেওয়া হয়, তাতে ছেলেদের খেলা, লেখাপড়া, বিতর্ক, সামাজিকতা এ সব বিষয়েই বিশেষ সুবিধে হয়। আমাদের স্কুলগুলোতে যে এগারজন ছেলে স্কুল টিমে পড়ে তারাই শুধু খেলে ; সাধারণতঃ অন্যের খেলার কোন বন্দোবস্ত থাকে না। কিন্তু স্কুলকে তিন চারটী 'হাউসে' বিভক্ত করে নিলে এবং প্রত্যেক 'হাউসের' ছেলেদের খেলার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে করে দিলে সবাই খেল্‌তে সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন 'হাউসের' মধ্যে যখন ম্যাচ হয় তখন বেশ একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। পড়াশুনা সম্বন্ধেও সে কথা খাটে—শ্রেণীতে কোন্ 'হাউসের' ছেলে প্রথম হচ্ছে, দ্বিতীয় হচ্ছে

এই নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে যায়। প্রত্যেক 'হাউসেরই' চেষ্টা হয় সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করা, বাংলাদেশের বড় লোকদের নামে স্কুলে স্কুলে হাউসের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন মহসীন হাউস, রামমোহন হাউস, ভূদেব হাউস, বিদ্যাসাগর হাউস, চিত্তরঞ্জন হাউস, সুভাষ হাউস। ছেলেরা স্কুলের চারপাশে বাস না কর্‌লেও বিলিতি "হাউস" প্রথা অবলম্বন কর্‌তে আমাদের কোন অসুবিধে হওয়া উচিত নয়। এক এক হাউসে ৭০ হতে ৮০ জন ছেলে ফেলা যেতে পারে। মেয়েদের স্কুলেও এ প্রথা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) সম্মান বোর্ড (Honour Board) :—

সকল ছেলেমেয়েই প্রশংসা পাবার জন্য লালায়িত এবং যারা পায় না তারা অপরকে পেতে দেখে নিজেরাও সে সম্মান পেতে সচেষ্ট হয়। সে জন্য প্রতি শ্রেণীতে একটী 'সম্মান বোর্ড' থাকা উচিত। আগের মাসে যে তিনজন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তাদের নাম বেশ স্পষ্ট ও বড় অক্ষরে সুন্দর ভাবে চিত্রিত থাক্‌বে সে বোর্ডের উপরে। সমাজ সেবায় ও শিল্পকলায় যারা উৎকর্ষ লাভ করেছে তাদের নামও সমানভাবে চিত্রিত থাকবে সে সম্মানের আসরে।

(ঙ) শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিটিং; পূর্ণায়তন প্রোগ্রেস-রিপোর্ট; বৃত্তি অবলম্বনোপদেশ :—

স্কুলে ছেলেমেয়েদের যা বলে দেওয়া হয়, তা তারা বাড়ীতে কর্‌ছে কি না বা কর্‌বার সুযোগ পাচ্ছে কি না এবং স্কুলে ছেলেমেয়েরা কি কর্‌ছে না কর্‌ছে তা' অভিভাবকেরা ঠিক জান্‌তে পার্‌ছেন কি না এ দুটো বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত কর্‌তে হলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মাসে অন্ততঃ একবার করে মিটিং ও পূর্ণায়তন প্রোগ্রেসরিপোর্ট দরকার। মধ্যে মধ্যে শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীরা ছেলেমেয়েদের বাড়ী গিয়ে খবরাখবর করবেন

এ বলা বাহুল্য। স্কুলে নতুন কিছু করবার আগে অভিভাবকদের সঙ্গে মিটিংয়ে সে বিষয়ে আলোচনা না কর্‌লে তাঁদের সাহায্য সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যেতে পারে না এ কথাও মনে রাখা দরকার। শিক্ষকমহাশয় ও অভিভাবকদের ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হলে আরেকটা বিষয়ে বিশেষ স্থবিধে হয়—ছেলেরা স্কুল ছেড়ে কি বৃত্তি অবলম্বন করবে (Vocational Guidance) ভেবে চিন্তে তার একটা সুবন্দোবস্ত করা যেতে পারে। আজকাল এ বিষয়ে না ভাবেন অভিভাবকেরা, না ভাবেন শিক্ষকেরা ; তাই বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এ বিষয়ে সুষ্ঠু উপদেশ দেবার জন্য একটী 'বৃত্তি নির্ণয় বোর্ড' (Vocational Guidance Board) স্কুলে স্থাপন করা প্রয়োজন। বুদ্ধিমত্তা বা মনস্বিতার মাপ, বৃত্তি প্রবণতার মাপ, ব্যক্তিত্বের মাপ ইত্যাদির সাহায্যে বোর্ড অতি অল্প খরচে ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য উপদেশ কিশোর কিশোরীদের দিতে পার্ব্বেন।

আজকাল যে রকম প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেওয়া হয়, তাতে ত্রৈমাসিক পরীক্ষার নম্বর এবং ছেলের আচরণ 'ভাল' বা 'মন্দ' লিখেই আমরা খালাস, প্রোগ্রেস রিপোর্টে আরও অনেক জিনিষ থাকা উচিত—তার স্বাস্থ্য, খেলাধুলো, পড়াশুনা, অন্যান্য সখ, প্রবৃত্তি, চরিত্র, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে যা কিছু আমরা জান্তে পেরেছি তা তাতে সংক্ষেপে লেখা থাকা উচিত এবং এ রিপোর্ট অন্ততঃ মাসিক হওয়া দরকার।

(চ) স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ; স্কুল ডিস্‌পেন্‌সারী :—

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা যে সবচেয়ে দরকারী জিনিষ তা না বল্‌লেও চলে। অতি সামান্য কিছু পেলেই ডাক্তাররা এ কাজ সানন্দে গ্রহণ করেন, অনেকে আবার কিছুই নেন না। বৎসরে অন্ততঃ তুবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়া উচিত এবং সেজন্য স্কুলের একজন ডাক্তার থাকা নেহাৎ আবশ্যক। তাঁর তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা

একটী হোমিওপ্যাথিক্ ডিস্পেন্সারী খুল্তে পারে। স্কুলের পর এখানে দুঃস্থ ব্যক্তিরা ওষধপত্র পেতে পারে—স্কুল ডিস্পেন্সারী সমাজ সেবার একটী মস্ত বড় অঙ্গ। ডাক্তারবাবুর চেষ্টা অবিশ্যি হবে যাতে আর অসুখ না হয় বা ওষুধ খেতে না হয়, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দীপ্তির ওপরেই তার যশ ও কৃতিত্ব নির্ভর করবে।

(ঝ) আয় বাড়ানো :—

ছেলেমেয়েরা চেষ্টা করলে স্কুলের আয় অল্পস্বল্প বাড়াতে পারে। স্কুলে অভিনয়, কথকতা ও পাঠ থেকে কিছু কিছু টাকা উঠতে পারে—যাঁরা দিতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে কিছু নিলে ও আর সবাইকে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার দিলে কারো কিছু বল্বার থাকে না। গ্রামে আরেকটা বিশেষ সুবিধে আছে। অনেক পুকুর পানা কচুরিতে ভরে আছে—সেগুলো পরিষ্কার করে সেগুলোতে দুটাকার মাছের পোনা ছেড়ে দিলে দুবছর পর একশ থেকে দুশ টাকায় এক একটী পুকুর জেলেদের কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে। তাতে কোন ঝঞ্ঝাট নেই অথচ এ রকম তিন চারটে পুষ্করিণী নিয়ে মাছ ছাড়লে স্কুলের বেশ লাভ হয়। এই টাকা থেকে ছেলেমেয়েদের রংয়ের বাস্ক, শ্রেণীলাইব্রেরীর বই, হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীর ওষুধপত্র ইত্যাদি কেনা যেতে পারে।

১৫। শিক্ষক ও শিক্ষকতা :—

(ক) পড়াশুনা :— (খ) পাঠ-টীকা :—

এখন শিক্ষকতা সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ কর্ব্ব। এ কথা ঠিক, ক্লাশের পড়াকে সরস করে তুলতে হলে মাষ্টার-মহাশয়কে বাইরের বই অনেক পড়তে হয়; যে বিষয়টী পড়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে নানা রকম গল্প বলে, ছবি এঁকে, ছবি দেখিয়ে জিনিষটী চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হয়, তবেইতো বসবে ছেলেমেয়েদের মন। শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীকে এজন্য বাড়ীতে বেশ তৈরী হয়ে আসতে হবে—

ক্লাশের পড়া ঠিক ধারায় যাচ্ছে কিনা এজন্য তাঁকে পাঠ-টীকা (Notes of lessons) লিখতে হবে—পাঠ-টীকা না লেখা থাকলে খুব ভাল শিক্ষকের হাতে ছাড়া পড়া এলোমেলো ভাবে চলতে শুরু করে, ছেলেমেয়েদের বুঝতে বা বুঝে মনে রাখতে বিশেষ অসুবিধে হয়। পাঠ-টীকা লিখলে সে পাঠটী কি করে খুব ভাল করা যায় এ চিন্তা কর্ব্বার একটা সুযোগ অন্ততঃ আমাদের আসে। দীর্ঘ পাঠ-টীকা লেখার সময় হয়তো অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে পাঠ-টীকা লেখা খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়, বরং বেশ ভালই লাগে। নিজের উপর বিশ্বাসও আসে।

(গ) পাঠোপযোগী মালমসলা সংগ্রহ ঃ—

পাঠকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হলে শিক্ষকের একটা পুঁজি থাকা চাই—ছবি, কবিতা, বড় বড় লোকের উক্তি, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ের একটী সংগ্রহ থাকা নেহাৎ আবশ্যক। প্রতি শিক্ষকেরই এ রকম তুতিনটী 'ফাইল' বা লম্বা খাতা থাকা দরকার, যাতে ছবি, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি কেটে বা লিখে রাখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ নিয়মে চললে তুতিন বছরে আমাদের পুঁজিপাটা এমন জমে যায় যে তা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনে। পুঁজি বা মূলধন ছাড়া কোন ব্যবসা চলে না, শিক্ষা ব্যবসায়ে এ কথা আরো বেশী করে খাটে।

(ঘ) নতুন পড়া ; অতীত ও বর্ত্তমানের সম্বন্ধ ঃ—

শিক্ষকের আরও তুটী কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। নতুন পড়া অনেক সময় ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে পড়ে আসতে বলা হয় কিন্তু নতুন পড়া সর্ব্বদা ক্লাসে আরম্ভ হওয়া উচিত, কারণ শিক্ষকের সাহায্যে তারা যতটা বিষয়টীকে আয়ত্ত কর্ত্তে পারে নিজেদের চেষ্টায় তা পারা সুকঠিন। আবার অতীতের কোন কথা যখন আমরা পড়ি, বর্ত্তমানের উপর তার কি প্রভাব সেটিও খুব ভাল

করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তা হলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের যে অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তা ছেলেমেয়েরা সহজেই ধরতে পারবে।

(ঙ) ছাত্রের চিন্তাশীলতা ও কল্পনাশক্তি :—

ছেলেকে বা মেয়েকে চিন্তাশীল করে তোলা শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য—ক্লাসে নানা প্রশ্নের ভেতর দিয়ে, নানা রকম কাজের ভেতর দিয়ে তার চিন্তা ও কল্পনাশক্তির যাতে স্ফুরণ হয় সে বিষয়ে শিক্ষকমহাশয় ও শিক্ষয়িত্রী মহাশয়াকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি সকল বিষয়ই 'কেন হোল', 'কেন হোল না', 'কি হবে', 'কি হতে পার্ত্তো' এরকম বহুবিধ প্রশ্নসমাকীর্ণ ; এ সব প্রশ্নের সাহায্যে সরস পাঠদানে ছেলেমেয়েদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির স্ফূর্ত্তি শীঘ্রই করানো যায়।

(চ) শিশুমনোবিজ্ঞান ও শিক্ষকের চরিত্র :—

এ দুটো কথা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় বলে সবশেষে বলছি। যে শিশুকে মানুষ করে তুলতে হবে তার মনের গতি কি রকম, তার কি ভাল লাগে, তার কি বিপদ হতে পারে, কি ভাবে তার চরিত্র গঠিত ও তার মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হতে পারে, এ সব কথা সুশিক্ষকের জানা একান্ত প্রয়োজন। এ জ্ঞান না থাক্‌লে শিক্ষার কাজ ঘাড়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই শিশুমনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে দু একখানা বই প্রত্যেক শিক্ষকেরই পড়া উচিত। শিক্ষকের চরিত্র সম্বন্ধে বেশী না বল্লেও চলে—যিনি নিজেই আদর্শ চরিত্র গঠনের গুরুভার গ্রহণ কর্চ্ছেন, তাঁকে নিজেকে যে দেবচরিত্র হতে হবে, সে সম্বন্ধে দুমত কোনকালে কারো হয়নি। শিক্ষকের মধ্যে স্নেহ, ভালবাসা, সহানুভূতি, নিরপেক্ষতা, পরিশ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণগুলো থাকলে ছেলেমেয়েরা

মানুষ না হয়েই পারে না, তারাও তাদের শিক্ষকদের ছাঁচেই গড়ে ওঠে।

১৬। কয়েকখানা বই ঃ—

শিশুমনোবিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী ও ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা বিষয়ে কয়েকখানি বই সকল অভিভাবক ও শিক্ষকেরই পড়া উচিত। আমি বেশী বইয়ের নাম কর্ব্ব না, কারণ তাতে ভীতির সঞ্চার ছাড়া আর কোন ফলই হবে না। আমার মনে হয় এ ক'খানা বই পড়লে শিক্ষক ও অভিভাবক সমাজের বিশেষ উপকার হবে ঃ—

* 1. Education—Bertrand Russell. (Fisher & Unwin).
* 2. The Psychology of Adolescence—Luella Cole (Farrar & Rinehart).
* 3. Instruction in Indian Secondary Schools— Macnee (Oxford University Press).
4. New Teaching for a New Age—A. H. T. Glover (Nelson).
5. The Education of the Whole Man—L. P. Jacks.
* 6. Samagra Nai Talim—Hindusthani Talimi Sangha, Sevagram, Wardha.

এ বইগুলোর ভেতরে অন্ততঃ তারকা চিহ্নিত ক'খানা পড়া বিশেষ দরকার।

ছেলেমেয়েদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে নতুন পথে চালিত করে তাদের অতুল সম্পদের অধিকারী করে তুলতে আমাদের অনেক বেশী হয় তো পরিশ্রম কর্ত্তে হবে কিন্তু যে মহাব্রতে ব্রতী হয়ে আমরা কাজে এগিয়েছি তাতে সামান্য পরিশ্রমের ভয়ে পেছপাও হব এ আমি কল্পনাও কর্ত্তে পারিনে।

স্বাধীন বাংলায় ইংরেজী ভাষার স্থান

দেশনেতা ও দেশপ্রেমিকগণের আত্মত্যাগ ও বিশ্বপরিস্থিতির অপরিহার্য্য চাহিদায় দু'শ বৎসর পর আজ দেশে ইংরেজের অধীনতা ঘুচেছে, তাই প্রশ্ন উঠেছে ইংরেজের অধীনতা যখন গেল, ইংরেজী ভাষার অধীনতা কি ঘুচবে না? প্রশ্নটী ঠিক ন্যায়সঙ্গত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কারণ কোনো জাতি কোন ভাষা বিশেষের সাহচর্য্য চায় তখনই যখন ভাষার মারফৎ পায় সে অগণিত তথ্যসম্ভার ও নব নব ভাবধারা যা দ্বারা তার জাতীয় জীবন হয় গঠিত, সংস্কৃতও পূর্ণাবয়ব। এ অচ্ছেদ্য মৈত্রীর বন্ধনই করে নেয় নবাগত ভাষাকে আদরের সামগ্রী, গর্ব্বিত ঔদ্ধত্যের পঙ্কতিলককে করে নেয় ললাটের জয়টীকা। ভারতে ইংরেজী ভাষার বিবর্ত্তনের ইতিহাসও অনুরূপ। একদিন হয়তো শাসক-শাসিত সম্বন্ধোদ্ভূত ছিল এ ভাষা কিন্তু সেদিনও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দেবে বলেই রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীগণ এ ভাষার প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, এমন কি মেকলে সাহেবের কুখ্যাত মন্তব্যেও (১৮৩৪) এ দিকটা দৃষ্টিবহির্ভূত ছিল না। স্বল্প ব্যয়ে কেরাণীকুল উদ্ভব কোম্পানীর উদ্দেশ্য হয়তো ছিল কিন্তু পাঠ্যসূচী কেরাণীকুলজনন-সুলভ ছিল বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। বার্ক, শেরিডান, ফক্স, শেলী, বাইরণের অগ্নিময় বাণীতে তৈরী হয় না শুধু মসীজীবীরই দল, তৈরী হয় দেশাত্মবোধসম্পন্ন স্বাধীনতা প্রয়াসী বিপ্লবীদল ও দেশনেতৃবৃন্দ। তাই দেখি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃবৃন্দই গোড়াপত্তন কল্লে́ন দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের এবং প্রথম দাবী জানালেন সেই কংগ্রেসেরই মারফৎ দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের। আজ যে বিস্তীর্ণ ভারতে স্বদেশ ও স্বজাতি বলে দুটী দুর্লভ অমূল্য বস্তু লাভ করেছি তাও এই ভাষারই কল্যাণে।

পাশ্চাত্যের সংঘাতে কৃষ্টির নানাক্ষেত্রে ভারতের যে পুনর্জন্ম হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে, তা হয়েছিল ইংরেজী ভাষারই উদ্দীপনায় এ কথা ভুললেও চলবে না। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের যুগ্ম সভ্যতার প্রতীক রামমোহন, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, গান্ধীজী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এরা সবাই ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের কৃষ্টির শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণ করেছিলেন বলেই প্রতীচ্যের সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ কর্ত্তে সক্ষম হয়েছিলেন ও ক্ষীয়মান মুমূর্ষু দেশকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। পাশ্চাত্যের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞান ও ভাবসম্পদ সবই এসেছিল আমাদের কাছে এ ভাষারই মারফৎ। বহু বর্ষ পরে যখন জাতীয় সভ্যতার পঙ্কোদ্ধার হয় কোন ভাষা ও কৃষ্টির সংঘাতে, সে ভাষা বা কৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বহ্নি পোষণ না করে তার প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দনই জানায় উপকৃত জাতি। ভারতেও এর অন্যথা হয়নি। আমরা ইংরেজী ভাষা শিখেছিলাম এই বলে নয় যে আমরা ইংরেজের অধীন, জোর করে আমাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এ ভাষা না শিখলে আমাদের প্রাণ সংশয় বা লাঞ্ছনা নিশ্চিত (যা বহুবার অনুষ্ঠিত হয়েছে জার্ম্মান অধিকৃত পোলাণ্ডে)—আমরা এই বিদেশী ভাষা শিখেছিলুম শুধু এই বলে নয় এ ভাষা জীবনসংগ্রামে করবে অপরিসীম সহায়তা, শাসকের চোখে করবে আমাদের প্রীতিভাজন বা উঁচু স্তরের আদমী,—আমরা এমন একটা কিছু পেয়েছিলাম এই ভাষায় যাতে মন হয়েছিল সতেজ, চিত্ত হয়েছিল শুদ্ধ, ইন্দ্রিয়গ্রাম হয়েছিল ক্ষুরধার, সৌন্দর্য্য ও রসবোধ হয়েছিল প্রবুদ্ধ। তাই ভারত সাদরে গ্রহণ করেছিল এই ভাষাকে অন্তরের জিনিষ বলে, দাসত্বের তুর্ব্বিষহ শৃঙ্খল বলে নয়। আজ স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই কি যে ভাষাকে গ্রহণ করেছি জাতীয় বিজয় অভিযানের জয়টীকা বলে তাকে মুছে ফেলে দিতে হবে নির্ম্মম দাসত্বের শেষ চিহ্ন বলে?

তবু কেন এ প্রশ্ন ওঠে? প্রশ্ন ওঠে আমাদের শাসক জাতির

ভুলে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দোষে, বিজাতীয় হাবভাবের আমাদের নিজেদের অমার্জ্জনীয় অনুকরণে, ইংরেজী ভাষার অন্তর্নিহিত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে নয়। ইংরেজ যেদিন এ ভাষাকে শাসন পরিচালনার মাধ্যম বলে চালু কল্লে (১৮২৯), কাছারি দপ্তর আফিস দলিল দস্তাবেজ সবই এ ভাষার মারফতে চলতে লাগল, সেদিন থেকেই এ ভাষা অপরিহার্য্যরূপে গ্রাহ্য হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় চরিত্রের দৌর্ব্বল্যে দেশের বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকই হনুমানের বংশধরের মত বিলিতি হাবভাব, বিলিতি কথা, (এমন কি স্বরবিকৃতি), বিলিতি পোষাক, বিলিতি গান, বিলিতি ধর্ম্মবিমুখতা, বিলিতি অনাধ্যাত্মিকতা, ও বিলিতি চরিত্রের অন্যান্য দোষাবলী সবই গ্রহণ কল্লে, অর্থাৎ সব বিলিতি বাঁদর হয়ে উঠল— অশনে বসনে শয়নে স্বপনে ইংরেজের ছোট্ট হাস্যজনক সংস্করণ হবার অক্লান্ত চেষ্টা চলতে লাগল, কিন্তু কল্লে না গ্রহণ ইংরেজের প্রাণশক্তি, ইংরেজের দৈনন্দিন জীবনের সততা, ইংরেজের কর্ম্মকুশলতা, ইংরেজের প্রতিবেশীসহিষ্ণুতা, ইংরেজের জাতীয়তা বোধ। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও হয়ে উঠল একদিকে বাঁদর ও অন্যদিকে দাস তৈরী কর্ব্বার লজ্জাকর প্রয়াস। প্রাথমিক স্কুলের ও মাধ্যমিক স্কুলের ছয় সাত বৎসরের সুকুমারমতি বালক বালিকাকেও আয়ত্ত কর্ত্তে চেষ্টা কর্ত্তে হোল ইংরেজী ভাষার দুরূহ উচ্চারণ, বানান, পঠনপাঠন, কথন ও লিখন। আধুনিক ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজী ও বাংলার মত অরাজক ভাষা বোধ হয় খুব কমই আছে, এদের বানান ও উচ্চারণে এত তফাৎ, এদের ইডিয়ম বা বাক্‌পদ্ধতি এত নিজস্ব, এদের প্রকাশভঙ্গী এত বিচিত্র, ছোট ছোট ছেলে মেয়ের পক্ষে এ দুটো দুরূহ ভাষা আয়ত্ত করা সহজে সম্ভব হয় না। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ ইংরেজী ভাষাকে কল্লেন শিক্ষার বাহন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান সবই স্কুলে পড়াতে ও শিখতে হবে কঠিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। এতে জনসাধারণের ভেতর না হোল বুদ্ধির স্ফুরণ, না হোল জ্ঞানের প্রসার, না হোল স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্দীপন, মন

হয়ে রইল নির্জ্জীব বামন। এতে জাতি পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সব অসঙ্গত বিধিব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই, যে সব অব্যবস্থা হয়েছিল তা আমাদের পরাধীনতা-প্রসূত ও জাতীয় চারিত্রিক দৌর্ব্বল্যজনিত। আজ সে অবস্থা কেটে গেছে, ভারত আজ স্বাধীন, সে স্বেচ্ছায় যে ভাষাকে বরণ করে নেবে আপন কৃষ্টিগত ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের চাহিদায়, সে ভাষাকেই অধিষ্ঠিত কর্ব্ব আমরা রাজসিংহাসনে। সে ভাষা বাংলা হোক, মারাঠি হোক, গুজরাটি হোক, তামিল হোক, তেলেগু হোক, মলয়ালম হোক, গ্রীক হোক, ল্যাটিন হোক, ইংরেজী হোক, ফারসী হোক, রাশিয়ান হোক সে যে ভাষাই হোক না কেন, বসাব আমরা বেদী 'পরে যদি সে যোগায় আমাদের মনের আধার, সমৃদ্ধ করে আমাদের জ্ঞানকে, কৃষ্টিকে, উন্নততর করে তোলে আমাদের বাণিজ্য ও শিল্প ব্যবস্থাকে, যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বা বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির জীবন ও সভ্যতার সঙ্গে। এ মানদণ্ড নিয়ে বিচার কর্ত্তে গেলে ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষাই আজ আমাদের বহুমুখী চাহিদা মেটাতে সমর্থ নয়, আজ ভারতবর্ষে এমন ভারতীয় সর্ব্বজনীন ভাষা নেই যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশগুলি তাদের ভাবের আদানপ্রদানে সক্ষম হয়, বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। এক বিদেশীভাষা সে অভাব পূরণ করেছে, এমনকি ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী পর্য্যন্ত সেই বিদেশী ভাষায়ই গৃহীত হয়। এ অবস্থা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে গেলে দেশাত্মমর্য্যাদাক্ষুণ্ণকারী হতে পারে কিন্তু সত্যিকারের মর্ম্মন্তুদ নয় কারণ একটী জ্ঞানাঢ্য বিশ্বভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে কোন জাতি বা দেশই তার নিজস্ব কৃষ্টির চরম বিকাশ সাধনে সমর্থ হয় না, বিশ্বভাষার সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধের প্রয়োজন যার যার নিজের চাহিদায়, অপরের দাসত্বপনায় নয়। এ সাদাসিধে কথাটা মনে রাখলেই আজ ইংরেজীভাষার বিরুদ্ধে যে

ভুলে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দোষে, বিজাতীয় হাবভাবের আমাদের নিজেদের অমার্জ্জনীয় অনুকরণে, ইংরেজী ভাষার অন্তর্নিহিত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে নয়। ইংরেজ যেদিন এ ভাষাকে শাসন পরিচালনার মাধ্যম বলে চালু কল্ল (১৮২৯), কাছারি দপ্তর আফিস দলিল দস্তাবেজ সবই এ ভাষার মারফতে চলতে লাগল, সেদিন থেকেই এ ভাষা অপরিহার্য্যরূপে গ্রাহ্য হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় চরিত্রের দৌর্ব্বল্যে দেশের বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকই হনুমানের বংশধরের মত বিলিতি হাবভাব, বিলিতি কথা, (এমন কি স্বরবিকৃতি), বিলিতি পোষাক, বিলিতি গান, বিলিতি ধর্ম্মবিমুখতা, বিলিতি অনাধ্যাত্মিকতা, ও বিলিতি চরিত্রের অন্যান্য দোষাবলী সবই গ্রহণ কল্ল, অর্থাৎ সব বিলিতি বাঁদর হয়ে উঠল— অশনে বসনে শয়নে স্বপনে ইংরেজের ছোট্ট হাস্যজনক সংস্করণ হবার অক্লান্ত চেষ্টা চলতে লাগল, কিন্তু কল্ল না গ্রহণ ইংরেজের প্রাণশক্তি, ইংরেজের দৈনন্দিন জীবনের সততা, ইংরেজের কর্ম্মকুশলতা, ইংরেজের প্রতিবেশীসহিষ্ণুতা, ইংরেজের জাতীয়তা বোধ। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও হয়ে উঠল একদিকে বাঁদর ও অন্যদিকে দাস তৈরী কর্ব্বার লজ্জাকর প্রয়াস। প্রাথমিক স্কুলের ও মাধ্যমিক স্কুলের ছয় সাত বৎসরের সুকুমারমতি বালক বালিকাকেও আয়ত্ত কর্ত্তে চেষ্টা কর্ত্তে হোল ইংরেজী ভাষার দুরূহ উচ্চারণ, বানান, পঠনপাঠন, কথন ও লিখন। আধুনিক ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজী ও বাংলার মত অরাজক ভাষা বোধ হয় খুব কমই আছে, এদের বানান ও উচ্চারণে এত তফাৎ, এদের ইডিয়ম বা বাক্‌পদ্ধতি এত নিজস্ব, এদের প্রকাশভঙ্গী এত বিচিত্র, ছোট ছোট ছেলে মেয়ের পক্ষে এ দুটো দুরূহ ভাষা আয়ত্ত করা সহজে সম্ভব হয় না। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ইংরেজী ভাষাকে কল্লেন শিক্ষার বাহন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান সবই স্কুলে পড়াতে ও শিখতে হবে কঠিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। এতে জনসাধারণের ভেতর না হোল বুদ্ধির স্ফুরণ, না হোল জ্ঞানের প্রসার, না হোল স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্দীপন, মন

হয়ে রইল নির্জ্জীব বামন। এতে জাতি পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সব অসঙ্গত বিধিব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই, যে সব অব্যবস্থা হয়েছিল তা আমাদের পরাধীনতা-প্রসূত ও জাতীয় চারিত্রিক দৌর্ব্বল্যজনিত। আজ সে অবস্থা কেটে গেছে, ভারত আজ স্বাধীন, সে স্বেচ্ছায় যে ভাষাকে বরণ করে নেবে আপন কৃষ্টিগত ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের চাহিদায়, সে ভাষাকেই অধিষ্ঠিত কর্ব্ব আমরা রাজসিংহাসনে। সে ভাষা বাংলা হোক, মারাঠি হোক, গুজরাটি হোক, তামিল হোক, তেলেগু হোক, মলয়ালম হোক, গ্রীক হোক, ল্যাটিন হোক, ইংরেজী হোক, ফারসী হোক, রাশিয়ান হোক সে যে ভাষাই হোক না কেন, বসাব আমরা বেদী 'পরে যদি সে যোগায় আমাদের মনের আধার, সমৃদ্ধ করে আমাদের জ্ঞানকে, কৃষ্টিকে, উন্নততর করে তোলে আমাদের বাণিজ্য ও শিল্প ব্যবস্থাকে, যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বা বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির জীবন ও সভ্যতার সঙ্গে। এ মানদণ্ড নিয়ে বিচার কর্ত্তে গেলে ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষাই আজ আমাদের বহুমুখী চাহিদা মেটাতে সমর্থ নয়, আজ ভারতবর্ষে এমন ভারতীয় সর্ব্বজনীন ভাষা নেই যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশগুলি তাদের ভাবের আদানপ্রদানে সক্ষম হয়, বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। এক বিদেশীভাষা সে অভাব পূরণ করেছে, এমনকি ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী পর্য্যন্ত সেই বিদেশী ভাষায়ই গৃহীত হয়। এ অবস্থা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে গেলে দেশাত্মমর্য্যাদাক্ষুণ্ণকারী হতে পারে কিন্তু সত্যিকারের মর্ম্মন্তুদ নয় কারণ একটী জ্ঞানাঢ্য বিশ্বভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে কোন জাতি বা দেশই তার নিজস্ব কৃষ্টির চরম বিকাশ সাধনে সমর্থ হয় না, বিশ্বভাষার সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধের প্রয়োজন যার যার নিজের চাহিদায়, অপরের দাসত্বপনায় নয়। এ সাদাসিধে কথাটা মনে রাখলেই আজ ইংরেজীভাষার বিরুদ্ধে যে

বিদ্বেষবহ্নি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি জ্বলে উঠেছে তা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসবে, যদি বা একেবারে নির্ব্বাপিত না হয়। ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় এ বিষয়ে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছেন। একটী বিশ্বভাষা প্রতি সভ্য দেশেরই শেখা প্রয়োজন, সে ইংরেজীই হোক, ফরাসীই হোক, জার্ম্মানই হোক, রাশিয়ানই হোক বা চাইনিশই হোক। আজ যে ভারতে ফরাসীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী শিক্ষিত জগতের সর্ব্বজনীন ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা ঐতিহাসিক দৈবক্রমে, ইংরেজী না হয়ে ফরাসী বা অন্য কোন বিশ্বভাষাও হতে পারতো; এতে আক্ষেপ কর্ব্বার কিছু নেই। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার ভ্রান্তপ্রয়োগ বা অসঙ্গত প্রয়োগ যা এতদিন চলে এসেছে তা কেউ সমর্থন করার কথা আজ ভাবতেও পারে না, কিন্তু বিশ্বভাষা হিসাবে এর কি মূল্য তাও যাচাই করে দেখা দরকার।

বিশ্বভাষাগুলোর ভেতর কোনটির কিরূপ বিস্তৃতি, সমৃদ্ধি ও বর্ত্তমান কৌলিন্য এবং ভারতের পক্ষে কোন্‌টী আজ সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় সেটা আমাদের বিচার করে দেখা উচিত। ইংরেজী ও উত্তর চাইনিশ ভাষা দুইই আজ কুড়ি কোটি লোক ব্যবহার করে, রাশিয়ান সোভিয়েট রাশিয়ার বারকোটি লোক এবং স্প্যানিশ দশকোটি লোক ব্যবহার করে। কৃষ্টিগত সমৃদ্ধি থাকলেও ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষা আজ আর ব্যাপক নয়, এমনকি সমস্ত ইউরোপেও এ দুটীর একটীও সর্ব্বজনীন ভাষা হিসেবে আজ আর গ্রাহ্য নয়। রাশিয়ান ভাষা কঠিন এবং শুধু সোভিয়েটেই সীমাবদ্ধ, উত্তর চাইনিশ সম্বন্ধেও একই কথা খাটে অর্থাৎ দুরূহ এবং ব্যাপক নয় যদিও এদের কৃষ্টিগত মূল্য সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নেই। ইংরেজী ভাষা দুরূহ হলেও আমাদের শিক্ষিত সমাজ একে আয়ত্ত করেছে এবং ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, অ্যামেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রমুখ বহু প্রগতিশীল দেশে এ ভাষা আজ প্রচলিত এবং এতগুলো

জাতির সম্মিলিত অনুশীলনে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাব ও কৃষ্টি সকল দিক দিয়েই দিন দিন উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হচ্ছে। এমনকি যে সব দেশ একেবারে স্বাধীন, যাদের স্বেচ্ছায় বিশ্বভাষা মনোনয়ন কর্ত্তে কোন বাধা নেই, তারাও আজ ইংরেজীকেই বেছে নিচ্ছে। তাই দেখতে পাই, রুশ, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুয়েডেন ইত্যাদি দেশ তাদের পাঠ্যসূচীতে ইংরেজী ভাষার প্রবর্ত্তন করেছে, কোন কোন স্থানে আবশ্যিক ভাবে, কোন কোন স্থানে বা অন্যতম দ্বিতীয় ভাষারূপে। এ থেকে ইংরেজীর সর্ব্বজনীন প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। কাজেই বিশ্বভাষা হিসেবে গ্রহণ কর্ত্তে গেলে আজ ইংরেজীকেই আমাদের গ্রহণ কর্ত্তে হয়। বলা বাহুল্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাশিয়ান ও চাইনিশ শেখাবারও সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

ইংরেজী কতগুলো বিশেষ কারণেও আমাদের গ্রাহ্য, কিছুটা আমাদের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জন্য, কিছুটা আমাদের কৃষ্টিগত চাহিদায়। ইংরেজের সঙ্গে দুশ বছরের ঘনিষ্ঠতায় প্রতি প্রদেশে বহু সওদাগরী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তাদের কারবার শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, ইংলণ্ড আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া কানাডা ইত্যাদির সঙ্গেও। আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসায়ে ভারতে আজ ইংরেজীর ব্যবহার অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি কেউ বলে বিলেত বা আমেরিকাবাসী লোক কেন হিন্দী শিখবেনা, তারা হিন্দী বা হিন্দুস্থানী শিখলে এ আন্তর্জ্জাতিক ও আন্ত-প্রাদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য সবই হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর মারফতে হতে পারে। সেকথা সত্যি। কিন্তু তারা আমাদের ভারতীয় ভাষা যা বিশ্বভাষা নয় তা শিখবে কি? একে তাদের ভাষার কৃষ্টিগত মূল্য আমাদের ভাষার কৃষ্টিগত মূল্যের চাইতে কম নয়, তাতে তারা আমাদের চাইতে অনেক শক্তিমান্ জাতি; কাজেই ইংরেজ বা মার্কিন কোন ভারতীয় ভাষা ব্যবহারিক চাহিদায় শিখবে এ কথা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক বা অব্যবহারিক হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত

ব্যাপারে আমাদেরই অর্থাৎ দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় লোকেরই ইংরেজী শিখতে হবে।

যদিও আজ প্রতি প্রদেশে রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে বা শিগ্‌গিরই হবে প্রাদেশিক ভাষা, তবু জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্য আহরণের ভাষা আজও ইংরেজী। বহু বৎসর ধরে অনুবাদ কার্য্য চললেও একটা জীবন্ত ভাষার অভাব পূরণ করতে পারবে না প্রাণহীন শুষ্ক অনুবাদ। যতদিন না আমাদের সুধী ও মনীষীবৃন্দ সাহিত্য সৃষ্টি করবেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নিজেদের মৌলিক রচনার ভেতর দিয়ে, ততদিন আমাদের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষার সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি হতে পারে না। কিন্তু আমাদের পণ্ডিত সমাজ তা কর্ত্তে রাজী হবেন কি এমন এক ভাষায়, যার আবেদন পৌঁছবেনা প্রাদেশিক গণ্ডীর বাইরে? খুব সম্ভব নয়। আন্তর্জ্জাতিক বিদ্বৎসমাজের নিকট যে জিনিষটীর মূল্য ধার্য্য হয় নি তার বিজ্ঞানসম্মত কদর মেলা ভার। কাজেই এ কথা মনে কর্ল্লে অন্যায় হবেনা যে দেশের সুধীসমাজ মৌলিক গবেষণা ও রচনা বিশ্বভাষার সাহায্যেই করবেন।

তৃতীয়তঃ ইংরেজী ভাষার সঙ্গে এই দুশ বৎসরের কৃষ্টিগত সংস্পর্শে এমন কতগুলো সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকমান ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে যে আজ যদি আমরা হঠাৎ ইংরাজী ভাষাকে নির্ব্বাসিত বা সবলে নিষ্কাশিত করি, তাহলে আমাদের বিচার, চিন্তা ও সৃজনী-ধারা ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হবে প্রতি পদে পদে, তাতে যে অপূর্ণতা, যে ফাঁক থেকে যাবে তার পুরণ হবে না নিকট ভবিষ্যতে—ধীশক্তি বিবর্ত্তনের দিক থেকে এ কী কম ক্ষতি? ইংরেজ সুধীসমাজের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকমান ও ঐতিহ্যগুলির সঙ্গে আমরা বহুদিন পরিচিত, আজ হঠাৎ সে আদর্শ অপসৃত হলে দেশের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি কিছু হতে পারে না। এদিক থেকে দেখতে গেলে সংস্কৃত ভাষা আমাদের কাছে অধিকতর গ্রাহ্য হয়ে দাঁড়ায় কারণ সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের যে মানদণ্ড, বা যে ভাষ্য ও ব্যঞ্জনা চলিত রয়েছে তা ধীশক্তি বিবর্ত্তনের দিক থেকে যথেষ্ট অনুকূল। হিন্দী বা

হিন্দুস্থানীর কথা এ প্রসঙ্গে উঠতেই পারে না কারণ তাদের উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্যই নেই জ্ঞানের নানাক্ষেত্রে। এমনকি ফরাসী বা জার্ম্মানের কথাও ওঠে না কারণ তাদের ঐতিহ্য ও মানসিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে আমরা সে রকম ভাবে পরিচিত নই। সংস্কৃতের এ সম্পদ বিশ্ববিশ্রুত এবং এ আমাদের দেশের ভাষা কিন্তু সংস্কৃত বিশ্বভাষা নয়। হবারও কোন আশা নেই, এমন কি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবেও কোন দিন গ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা নেই তার।

পূর্ব্বেই বলেছি ইংরেজী ভাষাকে আমরা আপন করে নিয়েছি। তরুদত্ত, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, জওহরলাল, রাধাকিষণ এঁদের হাতে ইংরেজী ভাষার যে চরম পরিণতি ঘটেছে তা খ্যাতনামা ইংরেজ লেখকের হাতেও ঘটেনি। ইংরেজীকে আজ দেশের শিক্ষিত সমাজ বিদেশীভাষা হিসেবে দেখেন না। আর শেষ কথা এই—এত দিন ধরে এ ভাষার অনুশীলন ও চর্চ্চা করে আজ ভারতের প্রতি শিক্ষিত গৃহস্থ-ঘরে দুচারখানি অবশ্য পাঠ্য ইংরেজী গ্রন্থ আছে। ইংরেজী ছাড়া অন্য বিশ্বভাষার ব্যবস্থা কর্ত্তে হলে আবার কেতাবী হাঙ্গামার সম্মুখীন হতে হবে। প্রতিগৃহে ছোট খাটো একটি লাইব্রেরী সংগঠন কর্ত্তে কেটে যাবে আরো দুশ বৎসর অর্থাৎ ঠিক যেমন হয়েছে ইংরেজীর বেলায়। এই দুশ বৎসরের যে কষ্টলব্ধ ফল তাকে হেলায় শুধু একটা ভাবের বিলাসে দূরে ঠেলে দেব? তাতে কী লাভ হবে সেটা তো শত বিচার করেও ঠিক ধরতে পারছিনা। এই সেদিন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিতে মৌলানা আজাদ যে বক্তৃতা করেন তাতে 'বিদেশী ভাষা' ছাড়া ইংরেজী সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি দেখতে পান নি তিনি। তারপর যখন ভেবে দেখি বহু স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বিরাট সুসংবদ্ধ সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত লাইব্রেরী কত যত্নে গঠিত হয়েছে—তাদের কি ব্যবহার হবে? তারা কি মিশর দেশীয় মমীদের মতই একটা অলস কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে থাকবে, কোন দিনই জোগাবেনা মনের ইন্ধন? এত অর্থ, এত কষ্ট, এত চিন্তাশক্তি সবই

কি যাবে বিফলে ? কেন ? শুধু একটা ভাবের বিলাসে, জাতীয় আত্ম মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে বলে ? এ যুক্তি নিতান্তই অসঙ্গত। বিশ্বভাষা ব্যবহার বা প্রয়োগের সঙ্গে জাতীয় মর্য্যাদার সম্পর্ক খুবই কম। বিশ্বভাষা গড়ে ওঠে জাতীয় শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত সম্পদের জন্য, সে ভাষার প্রয়োগে অন্য জাতির সম্মানের লাঘব হয় না, বরং বিশ্বের দরবারে তার সম্মানের পথ উন্মুক্ত হয়। ইংরেজের পরাধীনতা আমরা স্বীকার করি না, কিন্তু ইংরেজী ভাষার কৃষ্টিগত বিজয় অভিযান মেনে নিলে আমাদের আত্মমর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

প্রশ্ন স্বতঃই উঠে, যদি আমাদের বিশেষ পরিস্থিতিতে কৃষ্টিগত ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে যদি আমাদের ইংরেজী শিখতে হয়, তাহলে শিক্ষার কোন্ স্তরে বা কোন্ কোন্ স্তরে ইংরেজীর প্রচলন বহাল থাকবে ? এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে আমরা ৬।৭ বছর থেকেই এখনকার মত বিদেশী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ কর্ব্বনা, তা অতীতে সুফল- প্রসূ হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। বিশেষতঃ ভারতের নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামবাসীকে গ্রামকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে শেখানো। কোন বৃত্তি শিখে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রামে বসে নানাক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন করা হবে তাদের কাজ, এ শিক্ষার ভেতরে ইংরেজী ভাষার মদিরা ঢুকিয়ে তাদের চঞ্চল করে তুলে শহরে নিয়ে এসে বেকারের দল বৃদ্ধি করলে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থারই পুনরাবৃত্তি করা হবে, শুধু তাদের প্রতিই নয়, দেশের প্রতিও করা হবে ঘোরতর অন্যায়। সুতরাং বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষায় (ছয় থেকে চোদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত) ইংরেজী শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। এসব বুনিয়াদী শিক্ষালয় থেকে যে সব ছেলে উচ্চ শিক্ষার জন্য এগার বার বছরে হাইস্কুলে যাবে এবং পরে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে তাদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এদের সংখ্যা বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক কম হবে কারণ বুনিয়াদী স্কুলের শতকরা কুড়িজন মাত্র হাইস্কুলে যাবে। আবার প্রশ্ন ওঠে, এই বার তের বছরে

ইংরেজী শিক্ষা কি বাধ্যতামূলক হবে, না এ শুধু একটি বৈকল্পিক অন্যতম ভাষা হিসেবে পরিগণিত হবে? পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের ঐতিহাসিক পরিবেশের জন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদের শুধু উচ্চ শিক্ষার জন্যে নয়, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্যেও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর্ত্তে হবে। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য বাঙ্গালীকে ইংরেজীতেই সংবাদপত্র পরিচালনা কর্ত্তে হবে। সওদাগরী আফিস গুলোতেও বাঙ্গালীকে কাজকর্ম্ম করতে হবে, এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে নিজের আফিস খুলে বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন কর্ত্তে হবে। বাঙ্গলা সরকারের নানা বিভাগের কাজ বাংলা ভাষার মারফৎ কর্ত্তে গিয়ে দেখা গেছে এর অনেক প্রতিবন্ধক আছে এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ইংরেজীভাষার রেওয়াজ চলবে। শুধু শর্টহ্যাণ্ডের কথা উল্লেখ কল্লেই চলতে পারে। শর্টহ্যাণ্ড ছাড়া কোন সরকারের কাজ চলতে পারে না কিন্তু বাঙ্গলাভাষায় শর্টহ্যাণ্ডের উদ্ভব হতে বেশ কিছু বিলম্ব হবে; এমন কি বাংলাটাইপরাইটার গুলো অফুরন্ত একার ওকার ঐকার ঔকার ই ঈর সমবায়ে এত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে যে সেগুলো কতটুকুন কার্য্যকরী হবে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। জাতীয় গভর্মেণ্টের কাজে যে ভাষা, যে ব্যবস্থা অধিকতর কার্য্যকরী হবে তাকেই আমরা আদরে গ্রহণ করব, শুধু জাতীয়তা-ভাব-বিলাসে অকার্য্যকরী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালে চলবেনা। সরকারী কাজেও তাহলে দেখা যাচ্ছে ইংরেজীর যথেষ্ট প্রয়োজন থাকবে। তারপর রেলওয়ে, টেলি-গ্রাফ, ডাকবিভাগ, শিল্পবিভাগ, খনিবিভাগ, জলবিভাগ ইত্যাদির ক্ষেত্র সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে। কাজেই এসকল বিভাগের কাজকর্ম্মে ইংরেজীর চাহিদা যথেষ্ট থাকবে। অ্যালোপাথিক ডাক্তারী চিকিৎসা আমরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করেছি, এর বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান ও কার্য্যকুশলতা বাড়াতে গেলে ইংরেজী ভাষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা ছাড়া যতদিন বাংলা ভাষার উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইতিহাস

ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, পূর্ত্তশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি নানাবিষয়ে মৌলিক রচনা না হচ্ছে, এবং তথ্যসম্ভার পূর্ণ সুলিখিত বাংলা গ্রন্থাবলী শিক্ষিত সমাজের হাতে অর্পিত না হচ্ছে—ততদিন হাই স্কুলে এগার বার বয়স থেকে ইংরেজী পড়াতে হবে। পূর্ব্বেই বলেছি শুধু অনুবাদ সাহিত্যের ওপর উচ্চশিক্ষা চলেনা,—হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিফলতাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, চাই এসবক্ষেত্রে মৌলিক রচনা ও সাহিত্যসৃষ্টি কিন্তু সুধীসমাজ বিশ্বভাষা পরিত্যাগ করে ভারতীয় ভাষায় সে কার্য্যে ব্রতী হবেন বলে মনে হয় না। তারপর যদি নিছক অনুবাদের কথাই ধরতে হয়, তাহলেও দেখা যায় ইংরেজীকে পাঠ্যসূচীতে অত্যাবশ্যকীয় স্থান দিতে হয়। জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে যে সব অনুসন্ধিৎসুরা প্রবেশ করে নব নব সম্পদ আহরণ করে এনে বাংলা ভাষা ও শিক্ষাক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চান বা বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যেতে চান, তাঁদের সবাইকেই যত্নসহকারে ইংরেজীশিক্ষিতদের কাছে ইংরেজী শিক্ষা করতে হবে। কৃষ্টিগত এ অচ্ছেদ্য বন্ধন চলবেই, একে অস্বাভাবিক ভাবে ছেদন করা যায় নিশ্চয় কিন্তু তাতে জাতীয় অকল্যাণেরই সৃষ্টি হবে।

কাজেই আমাদের নতুনতম শিক্ষা পরিকল্পনায় (বুনিয়াদী স্কুল বাদ দিয়ে) হাই স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা এগার বার বছর থেকে আবশ্যিক ভাবে রাখা দরকার। একথা আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত নতুনতম ব্যবস্থায় হাই স্কুলে (টেকনিকাল ও জ্ঞানমুখী) কম ছেলেই আসবে এবং যারা আসবে তাদেরও পনরো জনের ভেতর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। কাজেই এরাও যদি একটা বিশ্বভাষার সঙ্গে পরিচয় লাভ না করে তাহলে এটা একটা জাতীয় ট্রাজেডী হিসেবে পরিগণিত হবে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অনুমোদন কর্চ্ছে সেটাও একবার আমাদের দেখা দরকার। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও মান্দ্রাজে যে সব প্রস্তাবাবলী উপস্থিত করা হয়েছে তাতে

দেখা যাচ্ছে নবম ও দশম শ্রেণীতে অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য সকল প্রদেশেই ইংরেজী বাধ্যতামূলক ভাবে এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে বৈকল্পিকভাবে থাকবে। শুধু মান্দ্রাজে হাই স্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী (তৃতীয় শ্রেণী) থেকে এই ভাষাকে বৈকল্পিক ভাবে রাখার প্রস্তাব হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাধ্যতা-মূলক ভাবে ইংরেজীকে রাখার প্রয়োজনীয়তা বেশ প্রবল ভাবে অনুভূত হচ্ছে, নইলে স্বাধীন ভারতে এ প্রস্তাব উপস্থিতই করা যেতো না। পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজীভাষা বৈকল্পিক ভাবে চালু করার প্রস্তাব হয়েছে অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে তারা এই সর্ব্বজনীন ভাষা অধ্যয়ন করবে। এতে যে জাতীয় ঐক্য ও স্বাদেশিকতা বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আরেকটা কথাও আমাদের বেশ ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। একটা বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের পর রাষ্ট্র নানা বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন প্রয়োজন হয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জাতীয় সংহতি ও ঐক্য। এই সঙ্কটকালে যে ভাষার মারফৎ ভারতে জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে তাকে নাকচ করে নতুন করে ভাষা সমস্যা তুলে জাতীয় ঐক্যবন্ধন শিথিল করা মোটেই সমীচীন মনে করিনা।

এখন কথা উঠবে এগার বার বছরে ইংরেজী ভাষা সুরু করে চার পাঁচ বছরের ভেতর এমন জ্ঞানার্জ্জন কি সম্ভব হবে যাতে করে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার পুস্তকাদি পড়ে বোধগম্য হবে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে ইংরেজী শিক্ষার যে নানা রকম সহজ সরল উপায় ও প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে সে সব প্রণালী অনুসৃত হলে তা সম্ভব হবে। তবে পাঠ্যপুস্তক আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার হবে কারণ বার তের বছরের কিশোর কিশোরীকে ছয় সাত বছরের শিশুপাঠ্য পুস্তকের মানসিক খাদ্য দিয়ে সন্তুষ্ট করা যাবে না। ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও কতগুলো ধরণ ধারণ বদলাতে হবে। ইংরেজী বলার চাহিদা আর তেমন থাকবে না, কাজেই উচ্চারণ

নিয়ে মাথা ঘামানোর বেশী দরকার হবে না, বানান সমস্যাটাও সহজ করে নিতে হবে, আমেরিকা করেছে, আমরাই বা পার্ব্বোনা কেন?

আরেকটা কথা অনেকে ভুলে যান অথচ এটা বিজ্ঞানসম্মত কথা এবং বহু পরীক্ষা দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ। সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তির "অনুবন্ধ" (Correlation) পজিটিভ্ বা অনুকূল (সদর্থক), অর্থাৎ যে ছেলেমেয়ে মাতৃভাষায় ভাল সে ইংরেজী ভাষায়ও ভাল, এবং যে ইংরেজী ভাষায় ভালো সে মাতৃভাষায়ও ভাল। এ কথা, অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য কারণ ভাষা আয়ত্ত করার টেকনিক্ বা কৌশল সকল ক্ষেত্রেই প্রায় একরকম। কাজেই যদি বাংলা ভাষা ভাল করে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে এগার বার বছর বয়সে ইংরেজী শিক্ষা কঠিন হবে না, বিশেষতঃ যদি ভাল শিক্ষক দিয়ে নবাবিষ্কৃত প্রণালীতে এ শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদিন আমাদের স্কুলগুলোতে না হয়েছে ইংরেজী শিক্ষা, না হয়েছে বাংলা শিক্ষা, কাজেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি বা উৎকর্ষ লাভ ঘটে নাই আমাদের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যে। ১৯৪০ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার সকল পাঠ্যপুস্তকই (ইংরেজী বাদে) মাতৃভাষায় প্রবর্ত্তন করেছেন ও মাতৃভাষার মাধ্যমেই পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু যাঁরা প্রবেশিকা পরীক্ষার কাগজ দেখেন তাঁরা জানেন কি ভয়াবহ পরীক্ষার্থিদের ভাষা জ্ঞান বা তথ্যসম্ভার, বা সুসংবদ্ধভাবে বিবৃতি কর্ব্বার অক্ষমতা। হয়তো কালক্রমে বাংলা ভাষার প্রতি স্কুলে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া হবে কিন্তু এ সাত আট বছরের অভিজ্ঞতা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ইংরেজী শিক্ষার দোষ এতদিন দিয়ে এসেছি আমাদের শিক্ষার শোচনীয় পরিণামের জন্য, কিন্তু বাংলাভাষা শিক্ষার ও পরীক্ষার বাহন হয়েও তো শিক্ষার রথ অগ্রসর হচ্ছেনা, হয়ত বা পিছিয়েই পড়ছে। কাজেই শিক্ষার অবনতির জন্য শুধু ইংরেজীকে দুষ্‌লে অন্যায় করা হবে—শিক্ষার অবনতির যে মূল কারণ তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেওয়া

উচিত—বর্ত্তমান কালের ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও তাদের নৈতিক জীবনে অস্বাস্থ্যকর সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদির প্রভাব। রাজনৈতিক আবর্ত্তের সময় ছাত্রসমাজকে চিরদিনই বিদেশী শাসন চূর্ণীকৃত কর্ব্বার কাজে প্রয়োগ কর্ত্তে হয়, তাতে অধ্যয়ন অধ্যাপনার ক্ষতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতাও আসে। কিন্তু আজ ভাঙ্গার কাজ শেষ হয়েছে, গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। এখন অন্ততঃ আশা করা যায় ছাত্রসমাজ স্থির হয়ে বিদ্যার্জ্জন করার কাজে মনোনিবেশ কর্ব্বেন এবং জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে কার্য্যে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হবেন। পড়াশুনোর প্রতি অনুরাগ, নিয়মনিষ্ঠা, বিদ্যাসাধনার রেওয়াজ যদি আমাদের দেশে আবার ফিরে আসে, তাহলে ভাষা সমস্যাটা এত বড় হয়ে দেখা দেবেনা, যে ভাষাই শিখি না কেন, ব্যুৎপত্তি লাভ হবেই। পড়াশুনোর দিকে মন ফিরিয়ে আনতে গেলে ছাত্রছাত্রীর তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি সবই প্রয়োজন কিন্তু এর কোন ব্যবস্থা কি আমরা করেছি? শিক্ষার সুফল কুফল অনেকগুলো জিনিষের ওপর নির্ভর করে, শুধু কোন ভাষা আমরা শিখছি তা নিয়ে অযথা বাগ্‌যুদ্ধে সময় নষ্ট করা বোধ হয় সমীচীন নয়।

একটা কথা ইচ্ছে করেই আমি সর্ব্বশেষে অবতারণা কর্ব্ব বলে রেখেছি। প্রশ্ন উঠতে পরে হাই স্কুলে যদি ইংরেজী ভাষা অবশ্য পাঠ্য হয়, তবে ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান হবে কোথায়? ক'টা ভাষা শিখবে ছেলেমেয়েরা ইত্যাদি। আমার ব্যক্তিগত মত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী বা হিন্দুস্থানী হতে পারেনা কারণ বাঙ্গলাদেশ বা মান্দ্রাজ তা মেনে নেবেনা। যদি কোনোও প্রাদেশিক ভাষা তার কৃষ্টিগত সমৃদ্ধির জন্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্য হয় তাহলে সে একমাত্র বাঙ্গলা ভাষা। এ কথা ভুললে চলবে না যে বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর ভাষাগুলোর মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে এবং এমন এর ভাব সম্পদ, শব্দশক্তি ও প্রকাশভঙ্গী, যে বিশ্বভাষারূপেও গণ্য হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের একথা

মেনে নেবার উদারতা আছে কি? কাজেই হিন্দি বা হিন্দুস্থানী যার সাহিত্য বলে কিছুই নেই অর্থাৎ আমাদের বাংলা ভাষার চাইতে অনেক নিকৃষ্ট একটী ভাষা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে আমরা যে সেটা মেনে নেব তা মনে হয় না। হিন্দি বা হিন্দুস্থানী কয়েকটী সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের জন্য চলতে পারে—যাঁরা রাজনীতিতে অবতীর্ণ হতে চান, বা উত্তর ভারতের কোন কোন অংশের সঙ্গে তাদের ভাষার মারফৎ যোগাযোগ রাখতে চান তাঁরা শিখতে পারেন কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশের লোক বা বাঙ্গলা প্রদেশের লোকের পক্ষে হিন্দি বা হিন্দুস্থানী সম্বন্ধে উৎসাহিত হবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না। ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে আমরা নিশ্চয় হিন্দি বা হিন্দু-স্থানী শিখব, কিন্তু আবশ্যিকভাবে একে আমাদের ঘাড়ে চাপানো অত্যাচারের সামিল হয়ে দাঁড়াবে। আজ হিন্দি বা হিন্দুস্থানী যদি বিশ্বভাষা হত, তাহলে এত যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হতনা—দেশাত্ম-বোধের জন্য হিন্দি বা হিন্দুস্থানীর প্রয়োজন হয় না, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই দেশাত্মবোধ জেগেছে এ দেশে এবং দিন দিনই জাতীয় ঐক্য ইংরেজীভাষার মারফৎই সুদৃঢ় হয়ে আসছে। তাহলে হঠাৎ এ ভাষা ত্যাগ করব কেন? মাদ্রাজে কয়েক বছর আগে হিন্দুস্থানী প্রবর্ত্তন করতে গিয়ে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। পূর্ব্ববঙ্গ উর্দ্দু গ্রহণ না করে বাংলা ভাষা গ্রহণ করছে কেন? এসব কথাও আমাদের ভেবে দেখা দরকার। ভাষাটা মানুষের প্রয়োজনানুযায়ী নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ, তাই সবচেয়ে প্রয়োজনের, আদরের সামগ্রী হচ্ছে মানুষের কাছে তার মাতৃভাষা, তারপর যে কোন ভাষা সে গ্রহণ কর্ত্তে পারে তার কৃষ্টিগত ও ব্যবহারিক সম্পদের জন্য। আজ যদি ইংরেজী আমাদের সে চাহিদা মেটাতে পারে, তবে ইংরেজীকে আমরা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব কেন?

ইংরেজীভাষা শিক্ষাকে সংস্কৃতিগত পরাধীনতা বলে ঠাওরালে মহাভুল হবে, মানুষের মন মুক্ত হওয়া দরকার, এবং সে উদ্দেশ্যে পৃথিবীর যে কোন ভাষা ব্যবহার হতে পারে, এতে কৃষ্টিগত অধীনতা

কিছু নেই। হয়ত এমন হবে সমস্ত পৃথিবী একদিন বাংলাভাষা শেখার জন্য ব্যগ্র হবে, তারা সেদিন কৃষ্টিগত পরাধীনতার ভয়ে পিছিয়ে যাবে না। কৃষ্টিজগতে পরাধীনতা বলে কোন জিনিষ নেই, এ বিশ্বভাণ্ডার দেওয়া নেওয়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, যাতে নূতনতম সম্পদ সৃজনে বাধা না আসে তাই শিক্ষিত জগতের সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য।

বয়স্ক-শিক্ষা

ছোটদের শিক্ষার পরিকল্পনা যত সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরই হোক না কেন, বয়স্ক-শিক্ষার উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব হলে তা যে অনেকাংশে নিষ্ফল হয়ে দাঁড়াবে তা বিশদভাবে আলোচনা না কর্ল্লেও বুঝতে অসুবিধা হয় না; আমাদের দেশে বয়স্ক-শিক্ষা নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে আরেকটা দিক্‌মাত্র তা কেউ অস্বীকার কর্ব্বে না। আবার এ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে জিনিষটাকে না দেখে উদার দৃষ্টিতেও দেখা যায়। তাই পাশ্চাত্যের একজন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, "যদি জাগ্রত গণতন্ত্র তৈরী কর্ত্তে হয়, তা হলে শিক্ষার গতি হবে বিরামহীন—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত, যাতে বিশিষ্ট একটী স্থান থাকবে বয়স্ক-শিক্ষার।" পাশ্চাত্য সম্বন্ধে যদি একথা খাটে, তা হলে আমাদের দেশের পক্ষে একথা খাটে আরো অনেক বেশী করে, কারণ পাশ্চাত্যের জনসাধারণ মোটামুটিভাবে শিক্ষিত কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর। একথা নেহাৎ পাগল ছাড়া কেউ অস্বীকার কর্ব্বে না যে গণতন্ত্রের সাফল্য বা কার্য্যকারিতা শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করে বয়স্কদের সম্মিলিত জ্ঞান ও বুদ্ধির উপরে; সে বনিয়াদের যদি অভাব হয়, যত বড় ইমারতই গড়া যাক না কেন গণতন্ত্রের নামে, সে অট্টালিকায় রাজত্ব কর্ব্বে গণতন্ত্রের মুখোস পরে স্বৈরাচারতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, বা আমলাতন্ত্র—জাতির সত্যিকারের অগ্রগতি হবে প্রতিহত, রাষ্ট্রের নাগরিক সমাজ পেছিয়ে পড়ে থাকবে বিশ্বের জয়যাত্রায়।

তাই এ অপ্রিয় সত্য মেনে নিতে হবে, স্বাধীন বাংলা তথা ভারত শতকরা নব্বই পঁচাশীজন নিরক্ষরের দুঃসহ ভারে নুইয়ে পড়ে তার ভাবী উজ্জ্বল পরিণতির দিকে সম্যক অগ্রসর হতে পার্ব্বে না, যতদিন না বয়স্কদের শুধু সাক্ষরই নয়, নাগরিক জীবনের জন্যও উপযুক্ত করে তোলা হয়। যারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

নির্ব্বাচন করে, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দ্দেশ দিয়ে দেয় কোন্ আইন বা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হবে দেশে অর্থাৎ যারা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা, তারা যদি নিরক্ষর মূর্খ থেকে যায় তা হলে জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে এ কত বড় সঙ্কটময় অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। এ অবস্থা কায়েম করে রাখার চাইতে নির্ব্বুদ্ধিতার চরম নিদর্শন আর কিছু হতে পারে না। ব্রিটিশ ব্যবস্থায় কেন এ বিষয়ে তৎপরতার অভাব হয়েছিল তা সহজবোধ্য, কিন্তু জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে হয়ত সবচেয়ে আগে দেখতে হবে এ উপেক্ষিত অতি প্রয়োজনীয় জিনিষটাকেই। সার্জ্জেণ্ট রিপোর্টে পঁচিশ বৎসরের ভেতর বয়স্ক-শিক্ষা সমস্যার সমাধান কর্ব্বার প্রস্তাব করা হয়েছে, আমার মতে দশ বৎসরের একদিনও যাতে বেশী না লাগে সে বিষয়ে দেশবাসীর সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এ বৎসর জানুয়ারী মাসে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ দিল্লীতে যে শিক্ষা কনফারেন্স আহ্বান করেছিলেন তাতেও স্থির হয়েছে পাঁচ বছরে না হলেও দশ বৎসরের মধ্যে বয়স্ক-নিরক্ষরতার কলঙ্ক বিদূরিত করা হবে।

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসেরই মত বয়স্ক-শিক্ষার ইতিহাস অত্যন্ত অরুন্তুদ ও লজ্জাকর। এ সম্বন্ধে কোনদিনই পরিকল্পনানুযায়ী কোন কাজ সরকারের তরফ থেকে হয় নি, একেবারে প্রথমাবস্থায় যে টুকুন হয়েছে তা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সহৃদয় ব্যক্তি বা শ্রমিক ও ধনিক সম্প্রদায় হতেই হয়েছে। কিন্তু এতে সুফল ফলে নি। তাই স্বাধিকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এ বিষয়ে আস্তে আস্তে সচেতন হয়ে উঠতে হল, এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু অর্থ সাহায্য করেই ক্ষান্ত না হয়ে নিজেরাও এ বিষয়ে তৎপর হতে চেষ্টিত হলেন। এ প্রচেষ্টার শুরু হয়েছে মাত্র বছর পঁচিশেক আগে—এর পূর্ব্বে পরিস্রুতি নীতিই (Filtration Theory) এসব ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হবে বলে দেশের লোকের ধারণা ছিল। যা হোক সে ভ্রান্ত ধারণা আজ কেটে গেছে। সহৃদয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় ও কোন কোন স্থলে

শ্রমিকদের নিজেদের আগ্রহে ১৯১৯ সনের পূর্ব্বে অল্পস্বল্প নৈশ বিদ্যালয় বয়স্কদের জন্য প্রতি প্রদেশেই খোলা হয়েছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা এত মুষ্টিমেয় এবং কার্য্যকারিতা এত কম ছিল যে তাতে বয়স্ক-শিক্ষার প্রসার মোটেই হয় নি। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারোত্তর কালে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এদিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই বয়স্ক-শিক্ষার রূপও বদলাচ্ছে। প্রথম অবস্থায় আগ্রহাতিশয্যের দরুণ মান্দ্রাজ, বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে বহু স্কুল খোলা হল, ঝোঁকটা হল সংখ্যার উপর। পরে দেখা গেল এসব স্কুলগুলো উপযুক্ত শিক্ষক ও তদারকের অভাবে চালানো শক্ত, অর্থের সদ্ব্যয় না হয়ে অপব্যয়ই হচ্ছে এতে বেশী। তাই ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ এর মধ্যে অর্থাৎ এ দশ বছরের ভেতর প্রদেশগুলোতে এসব বাজে ভুঁইফোড় নৈশ বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়ে এমন করা হল যাতে সত্যিকারের বয়স্কদের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। মাত্র বার বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন প্রবর্ত্তনের পর বয়স্ক-শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টায় প্রকৃত প্রাণের সঞ্চার হয় বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে না।

ভারত সরকারের ১৯৩২-৩৭ সালের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে দেখা যায় মান্দ্রাজই সে সময়ে লোকশিক্ষা ব্যাপারে সব চেয়ে অগ্রণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রায় ছ শ (৫৮৬) নৈশ বিদ্যালয়ে সাড়ে বাইশ হাজার বয়স্কেরা শিক্ষালাভ কর্চ্ছিল। মান্দ্রাজের ব্যবস্থায় একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে লোকশিক্ষা ব্যাপারে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস। ১৯২৩ সন থেকে ইংলণ্ডের অনুকরণে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় শ্রমিক ও চাষীদের জন্য নানাস্থানে বিশেষ বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা করে আসছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বক্তৃতাবলী তাদের পক্ষে দুরূহ হওয়ায় এগুলো জনপ্রিয় হয় নি; কিন্তু এ থেকে এই-ই প্রমাণিত হয় যে যদি এদের উপযোগী করে বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে এগুলোর আদর বাড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে

জনসাধারণের একটা যোগাযোগও প্রতিষ্ঠিত হবে ; বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্রই হল বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ কৃষ্টিকেন্দ্র, এ যোগাযোগের অভাব হওয়াতেই আজ দেশে শ্রেণী-বিভেদ ও শ্রেণীবিদ্বেষ দেখা দিয়েছে, এর মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সমাজে সংহতি ফিরিয়ে আনতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকশিক্ষাকে বিশিষ্ট স্থান দিতেই হবে। দুঃখের বিষয় ভারতের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন বলে মনে হয় না। বোম্বাই প্রদেশে লোকশিক্ষা প্রসারের মূলে যদিও রয়েছে প্রাদেশিক সরকারের প্রেরণা ও প্রচেষ্টা তবুও বোম্বাই ও পুণাতে কয়েকটী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৩৯ সালে প্রায় এগার হাজার বয়স্ক-স্ত্রীপুরুষকে বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। সেদিনকার বোম্বায়ের লোকশিক্ষার বিশেষত্ব হচ্ছে স্ত্রীশিক্ষা, এ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টী এক মধ্যপ্রদেশ ছাড়া সেদিন আর সব প্রদেশেই অবহেলিত হচ্ছিল। স্ত্রীশিক্ষা না হলে বয়স্কশিক্ষা ও ছোটদের প্রাথমিক শিক্ষা যে বহুলাংশে তাৎপর্য্যহীন বা মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায় তা বোধ হয় সবাই সেদিন হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারেন নি ; যাহোক, বোম্বায়ের উদাহরণ স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে এবং ১৯৪২-৪৩ সালের রিপোর্ট থেকে দেখতে পাই বয়স্কদের শিক্ষায় যুক্তপ্রদেশ আজ বোম্বায়ের শীর্ষত্ব কেড়ে নিয়ে ভারতীয় প্রদেশগুলোর ভেতরে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তিন হাজারের উপরে (৩৩৫৬) অস্থায়ী ক্লাসে প্রায় যোল হাজার (১৫৯৬০) বয়স্ক-স্ত্রীলোক সেখানে শিক্ষালাভ কর্চ্ছে*। বাংলাদেশের লোকশিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বছরে ক্ষিপ্রগতিতে এর আকাঙ্ক্ষিত প্রসার এবং পল্লীউন্নয়ন বা গ্রামসংগঠন কেন্দ্র-

* ১৯৪২-৪৩ সনের রিপোর্ট অনুসারে বোম্বাইতে পুরুষদের জন্য ৯২০টী যথারীতি স্কুল ও ৮৮৪টী সাক্ষরতা ক্লাস এবং মেয়েদের জন্য ১৩১টী যথারীতি স্কুল ও ১২২টী সাক্ষরতা ক্লাস ছিল।

গুলোর (Rural Development Centres) সহায়তায় এর উন্নতি সাধন। ১৯৪২ সনে বাংলাদেশে ২২,৫৭৪টী বিদ্যালয়ে পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার (৫,৩০,১৭৮ জন) বয়স্কারা পড়ছিল। ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে বাংলার সাক্ষরদের সংখ্যা যে শতকরা ষোল জন হয়েছিল (বোম্বাই শতকরা কুড়িজন, মান্দ্রাজ শতকরা তেরজন) তার এও একটী অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে বঙ্গীয় লোকশিক্ষা-সংসদ ইত্যাদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি ভালই কাজ কর্চ্ছেন, কিন্তু অর্থ ও সুকল্পিত পরিকল্পনার অভাবে অগ্রসর যত ক্ষিপ্রগতিতে ও ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। দেশ স্বাধীন হবার আগে পল্লীসংগঠন বিভাগের সহযোগিতায় লোকশিক্ষা প্রসারের সুচিন্তিত একটী পরিকল্পনা স্থির করা হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থাভাবে সে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ শুরু হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তৎপর এবং একটী পরিকল্পনা স্থির কর্চ্ছেন কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লোকশিক্ষা বিষয়টীকে দেখার কতগুলো উপকারিতা আছে। শিক্ষিত ভদ্রসমাজে একটা ধারণা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে লোকশিক্ষা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলোর হাতেই থাকা উচিত। যেটুকু আলোচনা হয়েছে তা থেকে এ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লোকশিক্ষার মত ব্যাপক জিনিষ চালানো শুধু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাধ্যাতীত যদিও বা তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি দলাদলি নাও থাকত। এক, টাকার দিক দিয়ে দেখলেই জিনিষটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুধু এই খণ্ডিত সঙ্কীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠুভাবে লোকশিক্ষা চালাতে হলে বাৎসরিক অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ লক্ষ টাকা পৌনঃপুনিক ও প্রায় ত্রিশলক্ষ টাকা অপৌনঃপুনিক ভাবে খরচ করা দরকার। কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানমণ্ডলী তাদের সমবেত চেষ্টায় চাঁদা তুলে এ অর্থ সংগ্রহ কর্ত্তে সমর্থ হবে না, দলাদলি মনকষাকষি এসব কথা

না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ পরিচালনার ভার সরকারের হাতে থাকলে স্বাস্থ্য, সমবায়, রেজিষ্ট্রেশন, পল্লীসংগঠন, শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে এবং এঁদের সহযোগিতা ছাড়া কোন লোকশিক্ষা পরিকল্পনাই চালু হতে পারে না। প্রাদেশিক লোকশিক্ষার ইতিহাসে এটা বারবার দেখা গেছে, সরকার যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে তৎপর না হয়েছেন সে পর্য্যন্ত জিনিষটা মুহ্যমান প্রাণহীন অবস্থা কাটাতে পারে নি, এমন কি অনেক সময় একেবারে বিলীন হয়ে গেছে। এ কথা মনে রাখা উচিত সোভিয়েট রাশিয়া ও ইতালীতে রাষ্ট্র লোকশিক্ষার ভার সম্পূর্ণ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল। পঁচিশ বৎসর আগেকার রুশ ও ইতালীর মতই আজ আমরা পেছিয়ে পড়ে আছি, কাজেই আমাদের দেশে রাষ্ট্রকেই এ ভার সম্পূর্ণ নিতে হবে, এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য ও উপদেশ নিয়ে কাজ চালাতে হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যবস্থাই ফলপ্রসূ হতে পারে না, এ সবাই বোঝে। ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে লোকশিক্ষা অনেকাংশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেই অবিশ্যি আছে কিন্তু সে সব দেশের তুলনায় গণতন্ত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের দিক থেকে আমরা অনেক পশ্চাতে পড়ে আছি, কাজেই সে সব উদাহরণও আমাদের ঠিক খাটে না। আর সব চেয়ে বড় কথা, দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বা গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আগে যে আপত্তি ছিল তা আজ আর থাকা উচিত নয়। রাষ্ট্রের টাকা নেই ও সমষ্টির চেষ্টার ন্যায় কার্য্যকরী কিছু নেই এ অজুহাতে লিনলিথগাও কমিশন (The Linlithgow Commission) অবিশ্যি লোকশিক্ষার ভার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরেই ন্যস্ত করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের কুহককথায় ভোলবার মত মতিবিভ্রম বোধ হয় কারুর হবে না স্বাধীন ভারতে। লোকশিক্ষা বিবর্ত্তনের দিক থেকে আমাদের দেশে একটী জিনিষ খুবই আশার সঞ্চার

করেছে—সেটী হচ্ছে এ বিষয়ে কয়েকটী বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অকৃত্রিম সাড়া। এটী আরও আনন্দের বিষয় কারণ এদেশে শ্রমিক আন্দোলন পাশ্চাত্যের মত প্রগতিশীল নয় এবং শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের শিক্ষার ভার বহুলাংশে নিজেরা গ্রহণ কর্ত্তে অক্ষম, অনেক সময় তথাকথিত নেতাদের কবলে পড়ে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করে থাকেন। কাজেই অনুন্নত দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি তাদের শ্রমিকদের শিক্ষাবিষয়ে যত্নবান হন, তা হলে শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও তাদের যোগ্য নাগরিক করে তোলা বিষয়েই সাহায্য করা হয় না, দেশের শিল্পোৎপাদনও বিশেষভাবে এগিয়ে চলতে পারে। শিল্পোৎপাদন বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিকের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তা সহজেই অনুমেয় এবং শিল্পায়তনের কর্ত্তৃপক্ষেরা সে বিষয়ে ভুক্তভোগী। তাই খানিকটা মানবতার দিক থেকে ও খানিকটা হয় ত নিজেদের স্বার্থের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁদের কলকারখানায়, শিল্পায়তনে, কৃষিকার্য্যে। মান্দ্রাজে বাকিংহাম ও কার্ণাটিক মিলগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা তাঁদের শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে ও তরুণ শ্রমিকদের জন্য দিনের বেলায় স্কুল ও বয়স্ক-শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন এবং তামিল, তেলেগু ও উর্দ্দু ভাষার সাহায্যে বহুসংখ্যক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। বিহারে (জামসেদপুরে) টাটা আয়রণ ওয়ার্কসের ও টিনভেলী ও টুটীকোরিণে কাপড়ের মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণও শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছেন। এসব বিদ্যায়তনে কারখানায় যে যে-কাজ কর্চ্ছে তাকে সে বিষয়ে উন্নততর শিক্ষাও দেওয়া হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়েলফেয়ার কমিটিগুলি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এদের বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদেরও ব্যবস্থা করেছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌সের কথা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শ্রমিকদের লেখাপড়া, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি, তাদের জন্য সুদৃশ্য

মন্দির ও মসজিদও নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন। দেশের অন্যান্য শিল্প ও কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলো যদি এ বিষয়ে তৎপর হন তা হলে রাষ্ট্রের গুরুভার অনেকটা লাঘব হয়। এত বড় দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শিল্পপতিদের চুপ করে বসে থাকাও ঠিক হবে না, বিশেষতঃ যারা প্রতিষ্ঠানের অর্থ উৎপাদন কর্চ্ছে তাদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষগণের একটা মস্ত বড় কর্ত্তব্য রয়ে গেছে। প্রয়োজন হলে ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন করে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এ বিষয়ে আইনতঃ দায়ী সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যেমন সহরের বয়স্ক-শিক্ষার জন্য দায়ী করা যেতে পারে মিউনিসিপ্যালিটী ও করপোরেশনকে। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল বা করপোরেশন আইনে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে লোকশিক্ষার ভার নেবার অনুমতি দেওয়া আছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই করেন নি। কলিকাতা করপোরেশন গত মহাযুদ্ধের আগে মাত্র আটটী নৈশ বিদ্যালয় চালাতেন, যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাও বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মতে আইনতঃ বাধ্য করা উচিত এ বিষয়ে সহরের অন্যতম প্রতিষ্ঠানকে, এতে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের ভার লাঘব হবে সন্দেহ নেই।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি, বয়স্ক-পুরুষের সঙ্গে বয়স্ক-স্ত্রীলোকের শিক্ষার ব্যবস্থাও সমানভাবেই করা উচিত; করা কঠিন তা জানি কিন্তু যা করেই হোক শিক্ষয়িত্রী যোগাড় কর্ত্তেই হবে। এ বিষয়ে ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিতা রমণীর সমাজচৈতন্য বা বিবেক জাগ্রত না হলে চলবে না। প্রতি গ্রামেই দু চার জন শিক্ষিতা রমণী আছেন এবং তাঁরা একটু কষ্ট স্বীকার করে অবৈতনিকভাবে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের সাহায্য কর্লে বয়স্কাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হওয়া কঠিন হবে না। দেশের নতুন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক শিক্ষিতা রমণী এ কর্ত্তব্যটীকে শিরোধার্য্য করে নিতে কুণ্ঠিত হবেন না এই আমার বিশ্বাস; তাঁরা নিশ্চয় উপলব্ধি করেন প্রত্যেকটী অশিক্ষিত নরনারী দেশের অবশ্য বর্দ্ধনীয় সম্পদের অন্তরায়, তাদের

অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যহীনতা আজ সমস্ত জাতিকে পঙ্গু করে রেখেছে, যে সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সভ্যতার অধিকারী হতে পারত এত বড় একটা বিরাট দেশ, তা আজ সুদূরপরাহত। বিশেষ করে, গ্রামের স্ত্রীলোক অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানহীন, স্বামী পুত্রকন্যার অগ্রগতির পথে নিয়ত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে থাকে। তাদের শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এসব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে এবং বুঝিয়ে বল্লে আমার স্থির বিশ্বাস বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বৈতনিক বা অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর অভাব হবে না। অন্ততঃ প্রাণপণ চেষ্টা করে আমাদের দেখতেই হবে। হয়ত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ কর্ত্তে বয়স্কাদের আপত্তি থাকবে না এবং আস্তে আস্তে গ্রাম থেকেও পর্দ্দাপ্রথা অবলুপ্ত হবে। এ কথাটা অনেকে ভুলে যান গরীবদের ভেতর পর্দ্দা প্রথাটা ততটা কায়েম নয় যতটা আমাদের সংস্কারবশে আমরা মনে করে থাকি। হয় ত কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে কোন কোন কেন্দ্রে মেয়েদের পুরুষদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ কর্ত্তে কোন আপত্তিই নেই। যা হোক, প্রথমাবস্থায় আমরা মেয়েদের দিয়েই বয়স্কাদের শিক্ষা পরিচালনা কর্ব্ব।

এখন কথা উঠবে বয়স্কাদের শিক্ষা দিতে হলে কখন দেওয়া হবে—কারণ নৈশ বা সান্ধ্য বিদ্যালয় তাদের পক্ষে উপযোগী নয়। সে সময় তারা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, কাজেই সে সময় বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হলে অনেকে অনুপস্থিত থাকবে। সপ্তাহে অন্ততঃ চার পাঁচ দিন ক্লাশ হবে—সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে এতটা সময় দেওয়া মেয়েদের পক্ষে একরকম অসম্ভব। কাজেই দুপুর বা বিকেল বেলার দিকে বয়স্কাদের স্কুল বসানো ভাল। ইংলণ্ডে বয়স্কাদের জন্য অপরাহ্ণ বিদ্যালয়গুলো খুব সাফল্য লাভ করেছে। আমাদের দেশে ফসল কাটবার সময় মেয়েরা অনেকে মাঠে ব্যস্ত থাকে, সে সময়টুকুন বিদ্যালয় বন্ধ রাখা যেতে পারে। ফসল ঘরে আনার পর ছ মাস গ্রামের মেয়েদের বিকেলের দিকে কোন কাজই হাতে

থাকে না, অনেক সময়ই বেহুদা গল্প বা পরচর্চ্চায় কেটে যায়, তাই গান্ধীজী মেয়েদের এই দীর্ঘ অবসর সময় চরকায় সূতো কাটা ও তাঁত বোনার ব্যবস্থা কর্ত্তে উপদেশ দিয়েছেন। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে (১৯৩২-৩৭) পুরুষদের বেলায়ও মৌসুমী (Seasonal) বিদ্যায়তনের কথা অবতারণা করা হয়েছে কারণ সমস্ত দিন চাষের কঠিন শ্রমের পর নৈশ বিদ্যালয়ে এসে তারা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, যথারীতি শিক্ষালাভ কর্ত্তে পারে না। পুরুষদের পক্ষেও হয় ত সমস্ত বছর ক্লাশ না করে, যখন যখন চাষের কাজ কম থাকে তখন স্কুল চালালেই ভাল ফল হবে, অন্ততঃ যে সময়টা চাষের কাজ বেশী থাকে, সে সময়টা বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ; গ্রামোফোন, সিনেমা, রেডিয়ো ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ইত্যাদির সাহায্যে জ্ঞান ও আমোদ দু-ই তাদের দেওয়া যেতে পারে। বয়স্কাদের অপরাহ্ণ স্কুলের ব্যবস্থা কর্ত্তে হলে অল্পবয়স্কা মেয়েদের স্কুলের সময় বা ঘণ্টাগুলো একটু অদলবদল করে নিতে হবে, কারণ এসব স্কুলগৃহেই এবং প্রধানতঃ স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের সাহায্যেই, বয়স্কাদের শিক্ষা পরিচালনা কর্ত্তে হবে। আলাদা স্কুলগৃহ ও শিক্ষয়িত্রীর বন্দোবস্ত করার অর্থ আমাদের নেই।

বয়স্ক-শিক্ষার রূপ কি হবে সেটা এবার দেখা দরকার। প্রথম কথা, কাদের শিক্ষা দেওয়া হবে, দ্বিতীয়, কি শিক্ষা দেওয়া হবে, এবং তৃতীয়, কত দিন ধরে এ শিক্ষা দেওয়া হবে। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে বয়স্ক-শিক্ষা অন্ততঃ সতর আঠার বৎসরের আগে শুরু হয় না কারণ পনের যোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি কিশোরকিশোরীর একটা মোটামুটি শিক্ষাব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা না থাকায়, বয়স্ক-শিক্ষা কৈশোরের আগেই আরম্ভ কর্ত্তে হবে। বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার যে পরিকল্পনা হয়েছে তাতে ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকার্য্য আপাততঃ শুরু হবে, স্থতরাং বয়স্ক-শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে আমাদের ধরা উচিত এগারোত্তর

বালকবালিকা থেকে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীপুরুষ। চল্লিশোর্দ্ধে আক্ষরিক জ্ঞানের বালাই নিয়ে স্ত্রীপুরুষকে কষ্ট দেওয়া সমীচীন হবে না। বক্তৃতা, সঙ্গীত, কথকতা, যাত্রা, রেডিয়ো, সিনেমা, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, ছবি ইত্যাদি শিক্ষাসহায়কের সাহায্যেই তাদের শিক্ষা পরিচালনা কর্ত্তে হবে। কাজেই আক্ষরিক জ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে যাদের রীতিমত আমাদের শিক্ষা দিতে হবে তাদের বয়সের পরিধি হবে ১১ থেকে ৪০। কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া এ তিন শ্রেণীই এ গণ্ডীর ভেতরে রয়েছে কিন্তু এদের রুচি, অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য বিভিন্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালীতেও কিছু তফাৎ হবে, সুতরাং তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করেই এদের শিক্ষা দেওয়া উচিত :—১১ থেকে ১৬, ১৭ থেকে ২৫, ২৬ থেকে ৪০। তিনটী বিভিন্ন ক্লাসে বা গোষ্ঠীতে ভাগ করে শিক্ষা দিতে পাল্লে´ই ভাল হয়, না হলে অন্ততঃ দুটো ভাগে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়।

কি শিক্ষা দেওয়া হবে তা নিয়ে নানারকম মতভেদ আছে, কারণ বয়স্ক-শিক্ষার উদ্দেশ্য (যোগ্য নাগরিক প্রস্তুতীকরণ) এক হলেও, দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। আমার মনে হয় এ বিষয়ে অনেকাংশে চীনদেশকে মোটামুটি অনুসরণ কল্লে´ ভারতের পক্ষে মঙ্গল হবে, কারণ চীন ও ভারত প্রায় সমাবস্থই। চীনে শুধু পড়া, খেলা, আঁক, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব ইত্যাদি শেখানো হয় না, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ, স্বায়ত্তশাসন, দেশের ঐতিহ্য, শস্য সংরক্ষণ ও উৎপাদন উন্নয়ন, সমবায় প্রণালী, বন ও উদ্ভিদ্ সংরক্ষণ, রাস্তানির্ম্মাণ, বাঁধবাধন, অগ্নিনির্ব্বাপন, কুটীরশিল্প, খেলাধুলো, সঙ্গীত, লোক নৃত্যাদি এসবও শেখানো হয়। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক চীনাপুরুষ ও নারীকে সুষ্ঠুভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত কর্ত্তেই শুধু সুযোগ দেওয়া হয় না, প্রত্যেকটী নরনারীকে সামাজিক ও জাতীয় জাগরণের মূর্ত্ত প্রতীক করে তোলা হয়। ভারতেও আমরা এ ব্যবস্থাই চাই। আজ দু শ বৎসর পর শৃঙ্খলমুক্ত ভারতের

প্রতিভূস্বরূপ দেখতে চাই না জরাজীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরানন্দ কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন, পরমুখাপেক্ষী, অজ্ঞ নরনারীকে ; দেখতে চাই প্রত্যেক ভারতবাসীর আনন্দময় মূর্ত্তি, স্বাস্থ্যে দীপ্তিমান, জ্ঞানে প্রবুদ্ধ, কর্ম্মে নিরলস, ভারতাদর্শে আস্থাবান, আত্মনির্ভরশীল। একদিনে বা একআধ বছরে এ হবে না তা জানি, তবে দীর্ঘকাল এর অপেক্ষায় বসে থাকাও জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। চীনদেশে সুনইয়াৎসেনের সময় থেকে (১৯২৯) দশ বছরের ভেতর বয়স্কশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, আমাদের দেশেও কেন হবে না জানি না। চীনের পাঠ্যসূচীর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে গ্রামের নরনারীকে গ্রামে স্বচ্ছন্দে আনন্দময় জীবন যাপন কর্ব্বার পন্থা বা প্রণালী শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নরনারী যে একটা বিরাট শক্তিপিণ্ড সে অনুভূতিও এনে দেবার ব্যবস্থা তাতে করা হয়েছে। গ্রামকে ভূস্বর্গ না করে তুললেও, গ্রামের যে সব অভাব অভিযোগ, খারাপ রাস্তাঘাট, বন্যা, মন্দা ফসল, সাধারণ অগ্নিকাণ্ড, দারিদ্র্য, ব্যাধি ইত্যাদি প্রতিকার কর্ব্বার শক্তি ও কৌশল এদের শিখিয়ে দেওয়া হয়, তারা গভর্ণমেণ্টের মুখ চেয়ে নীরবে বছরের পর বছর দুঃখ কষ্ট গ্লানি সহ্য করে করে পিষিয়ে যায় না, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গ্রামকে শুধু বাসযোগ্যই নয়, উচ্চাঙ্গের একটী কৃষ্টিকেন্দ্রেও পরিণত করে। তারপর সাক্ষরতা ও কৃষ্টিকে বজায় রাখবার জন্য কী সুন্দরই না এদের ব্যবস্থা! একদিকে চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে লাইব্রেরী, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী, সিনেমা, রেডিয়ো, গ্রামোফোন, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, অপরদিকে অধ্যাপক, দেশনেতা, সরকারী কর্ম্মচারী ইত্যাদির সঙ্গে কথোপকথন ও মেলামেশা, আরও কত কী! আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কর্ত্তে হবে ; কিছু কিছু যে না হয়েছে বা না হচ্ছে তা নয়, স্বাস্থ্যবিভাগ ও প্রচারবিভাগের চেষ্টায় সিনেমা, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, ছবি, চার্ট ইত্যাদি আজ অনেক গ্রামে দেখানো হয়, কিন্তু উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে রীতিমত ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খলভাবে তা করা হয় না। সব চেয়ে যেটা বেশী

দরকার, সে হল লাইব্রেরীর। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী চট্ করে হয়ে উঠবে কিনা জানি না, তবে প্রতি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে একটী লাইব্রেরী আমাদের রাখতেই হবে এবং তা দুঃসাধ্য হবে বলেও বোধ হয় না। সহৃদয় ব্যক্তিদের বদান্যতায় একটী করে গ্রামোফোন্‌ও প্রতিকেন্দ্রে থাকতে পারে। রেডিয়ো বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও অনাবিল আনন্দ দানের একটী অন্যতম আবিষ্কার, এর সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। তবে রেডিয়ো সংগ্রহ করা অর্থসাপেক্ষ, কাজেই প্রতি গ্রামে আমরা হয় ত তা সম্প্রতি সরবরাহ কর্ত্তে পার্ব্বো না, তবে ইউনিয়নের মধ্যে যে কেন্দ্রটী সব চেয়ে বড় এবং সকলের পক্ষে সমদূর বা সমান অধিগম্য সেরকম কেন্দ্রে একটী করে রেডিয়ো আমাদের রাখা উচিত যাতে অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যাবেলা যার যার সুবিধামত শিক্ষা ও আনন্দ দু-ই পেতে পারে। কুটিরশিল্পের মহার্ঘ যন্ত্রাদি যথা তাঁত, লোহা ও কাঠের কাজের যন্ত্রাদি প্রতি কেন্দ্রে ব্যবস্থা করা শক্ত, তবে ইউনিয়নের মধ্যে যে কেন্দ্রে রেডিয়ো থাকবে সে কেন্দ্রে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁত বা অন্য শিল্প-যন্ত্রাদি থাকবে। প্রতি গ্রামে অবিশ্যি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে চরকায় সূতো কাটা, বেতের কাজ ইত্যাদি শেখাবার বন্দোবস্ত থাকবে, চরকা বা অন্যান্য কুটীরশিল্পের যন্ত্রাদির জন্য আলাদা খরচা করার প্রয়োজন হবে না, কারণ গ্রামবাসীদের অনেকের ঘরেই চরকা বা অন্যান্য ছোট যন্ত্রপাতি আছে, বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে তাদের শুধু উন্নততর কার্য্যপ্রণালী শিখিয়ে দিলেই যার যার নিজের ঘরে বসে অবসর সময়ে কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে। ছ মাস পর পর এদের হাতের কাজের এক একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর্ল্লে এদের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হবে।

আমাদের দেশে গ্রামগুলো নানা রোগের আকর, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরার বিভীষণ মূর্ত্তিকে বহুলাংশে ধ্বংস না কর্ত্তে পার্ল্লে বয়স্ক-শিক্ষা বা অন্য কোন শিক্ষা সফল হতে পারে না। কাজেই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য প্রতি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও রোগ নিবারণের

উপর সর্ব্বাপেক্ষা জোর দেওয়া, এ ভিত্তির অভাব হলে বয়স্ক-শিক্ষায় ব্যয়িত সমস্ত অর্থ, উদ্যম ও সময় জলাঞ্জলি দেওয়ার সামিল হবে। গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক এবং অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে, সে সহযোগিতার কোন অভাবও হয় না। তাঁর সাহায্যে সম্ভব হলে প্রাথমিক শুশ্রূষার জিনিষপত্র ও ছোট একটী হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেন্‌সারী প্রতি কেন্দ্রে রাখা প্রয়োজন। তবে ওষুধের চাইতে রোগের বীজাণু যাতে আক্রমণ না কর্ত্তে পারে সে ব্যবস্থা আগে করা দরকার—সেজন্য পুষ্টিকর খাদ্য, ভিটামিনযুক্ত টাটকা শাকসব্জী ও ব্যায়ামাদি সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সর্ব্বাগ্রে উপদেশ দেওয়া দরকার। সন্তরণের জন্য একটী পুষ্করিণী পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখা, বাইসখেলা, হাডুডুডু, দারিচা, গোল্লাছুট ও অন্যান্য দেশী খেলার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। ইংলণ্ডে সম্প্রতি লোকশিক্ষার একটী খুব বড় পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা চলেছিল পেক্‌হাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (Peckham Health Centre); যুদ্ধের সময় এ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এর উপকারিতা এত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল যে অনেকেই এখন এরকম কেন্দ্র স্থাপন কর্ত্তে উৎসুক হয়েছেন। পেকহাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ক্লাসে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, একটী ক্লাবের মত করে প্রতিষ্ঠাতারা একে চালাতেন। ডাক্তাররা গ্রামস্থ পরিবারগুলোর প্রত্যেক সভ্যকে দু তিন মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা করে ব্যবস্থা দিতেন, এবং প্রতি পরিবারে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা হত। তাদের শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের জন্যে কেন্দ্রে ছিল একটী লাইব্রেরী ও পাঠাগার; শিশুশালা বা নার্সারি (যেখানে শিশুকে অভিভাবকেরা রাখতে পারেন), রেঁস্তোরা, নাচঘর ও একটী সন্তরণাগার। সন্তরণাগারের আকর্ষণেই প্রথমে লোক আসতে শুরু করে এবং কেন্দ্রের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও চিত্তবিনোদন ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। অবিশ্যি ইংলণ্ডে যারা এ কেন্দ্রে আসত তাদের সকলেরই প্রায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল, সুতরাং

সুফল ফলতে দেরী হয় নি। আমাদের দেশে সেদিক্ থেকে বেশ একটু অসুবিধে আছে, তবে এরকম ব্যবস্থা হলে সাক্ষর হতে দেরী হবে না, আর সাক্ষরদের সংখ্যাও প্রতি গ্রামে সহরে আমাদের বেড়েই চলেছে এ কথাও মনে রাখা উচিত। অবিশ্যি নাচঘর আমাদের প্রয়োজন নেই, সেখানে নাটক, আবৃত্তি, লোকনৃত্য ইত্যাদি হতে পারে—তবে সবচেয়ে এ পরীক্ষার বড় অবদান যেটা —পরিবার হিসেবে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও রোগ নিবারণ সেটা আমাদের গ্রহণ কর্তে পাল্লে খুবই ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? প্রতি গ্রাম বা ইউনিয়নে এরকম এক একটী কেন্দ্র করা সরকারের পক্ষে হয় ত সম্ভব নয়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ, বা গ্রাম ও সহরের শ্রমিকেরা নিজেরা চেষ্টা করে এ ব্যবস্থা হয় ত জায়গায় জায়গায় প্রবর্ত্তন কর্তে পারেন। টাকা কোথা থেকে আসবে জিজ্ঞেস কল্লে বলতে হয় শুধু রেঁস্তোরা বা খাবার ঘরে খাদ্য বিক্রি করেই এ সম্ভব হতে পারে। ইংলণ্ডে আজ প্রায় তিন হাজারের উপর শ্রমিকদের এরকম সুন্দর ক্লাব আছে, ক্লাবের ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত তাদের নিজেদের—এ টাকা তারা উঠিয়েছে ক্লাবে তাদের জাতীয় পানীয় 'বিয়ার' (Beer) বিক্রি করে। আমরা না হয় 'বিয়ার' বিক্রি না করে দুধ বা ঘোল বিক্রি কল্লুম, কিছুটা লাভের অংশ ত থেকেই যাবে, তা থেকে অনেক কাজ হতে পারে। যা হোক, প্রতিকেন্দ্রে স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দিতে হবে, এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত হতে পারে না।

তারপর লেখাপড়া শিখবার একটা সহজ সরল প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন; সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণাও হয়েছে এবং দেখা গেছে ডক্টর লব্যাকের প্রণালীতে মাস তিন চারের ভেতরেই নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা যায় এবং তারা সাধারণ চলিত ভাষায় খবরের কাগজ ও সুলিখিত পুস্তকাদি পড়তে সক্ষম হয়। ডক্টর লব্যাক তাঁর প্রণালীতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রথম সাফল্য অর্জ্জন করেন এবং পরে পাঞ্জাব, বাংলা, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি

ভারতের নানা প্রদেশে তাঁর প্রণালী পরীক্ষিত হয় এবং এ প্রণালীতে চার্ট, পুস্তকাদি রচিত হয়। কাজেই সাক্ষরতা অর্জ্জন করা সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক নাই। কতকগুলো অতি পরিচিত কথার সাহায্যে স্মৃতিশক্তির উপর জুলুম না করে ছোট ছোট বাক্য শেখানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। আমাদের লোকশিক্ষায় ডক্টর লব্যাকের প্রণালী অনুসৃত হওয়া উচিত, প্রয়োজন মত কিছু অদলবদল করে নেওয়া যেতে পারে।

দেশের ঐতিহ্য শেখানো বিশেষ দরকার। ভারতের কৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য্য বয়স্কদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, বক্তৃতা করে নয়। তারা সাধারণভাবে আলোচনা করে বুঝুক, কেন ভারত ত্যাগ, মৈত্রী, অহিংসা, ভক্তি, প্রেম, কুলিশকঠোর কর্ত্তব্য বরণ করে নিয়েছিল, কোন্ কোন্ নৃপতি ঋষি, ফকির, ধর্ম্মপ্রচারক এসব আদর্শের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সময়ই ভারত সম্পদ ও কৃষ্টির শীর্ষদেশে অধিরোহণ করেছিল কেন, আর তার অভাব হওয়াতে বিরাট সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল কেন। দেশ স্বাধীন হল দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করে কোন্ কোন্ গুণের সমাবেশে আর এ স্বাধীনতা রক্ষা কর্ত্তে হলেই বা কি কি গুণের প্রয়োজন—এসব তথ্য তারা আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে, যেমন সংসারের আর পাঁচটা বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করে, তেমনি করে বুঝতে শিখুক, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্ত্তে শিখুক, তা হলেই হবে সবচেয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা।

শিশু বা বালকদের তুলনায় বয়স্কদের একটা বিষয়ে খুবই সুবিধে আছে—সেটা হচ্ছে গভীরতর অভিজ্ঞতা ও তাদের যৌক্তিকতা। এ দুটী জিনিষের প্রভাবে, তারা সব জিনিষই আলোচনার ভেতর দিয়ে সহজে হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে সক্ষম হয়, স্কুলের বালকদের মত শুধু না বুঝে মুখস্থ করে দু দিন বাদে তা ভুলে গিয়ে এ শিক্ষার ব্যর্থতা প্রমাণ

করে না। বয়স্কদের এই বৈশিষ্ট্যের দরুণ তারা বালকদের বা কিশোরদের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি শেখে, সুতরাং বয়স্কদের যা কিছু শেখানো হবে, তা যথাসম্ভব আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে শেখাতে হবে এ কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। বার বছর মোজার কলে কাজ করার পর ১৯৩৯ সালে উইসকনসিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শ্রমিকদের জন্য গ্রীষ্মকালীন দেড় মাসের কোর্স শেষ করে একজন কারিগর লিখেছিল ঃ—"প্রথম দিন স্কুলে এসে অবাক্ হয়ে গেলুম। সাধারণ স্কুলে পড়েছি কিন্তু এ একেবারে তফাৎ। শিক্ষকেরা কতগুলো 'থিওরি' মুখস্থ করান না, সমস্ত বিষয়েই আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এ প্রণালীতে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনটা চমৎকার বুঝেছি।" নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব, স্বায়ত্তশাসনের নানা প্রতিষ্ঠান, তাদের সঙ্গে নাগরিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্বন্ধ, গণপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন সময়ে নাগরিকের কি কর্ত্তব্য এবং কেন কর্ত্তব্য, খবরের কাগজ পড়ার প্রয়োজন, ইত্যাদি সব কথাই উদাহরণের ভেতর দিয়ে তাদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা কর্লে তাদের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

আরেকটী বিষয়ও বয়স্ক-বয়স্কাদের সঙ্গে খুব বেশী করে আলোচনা করা উচিত—সেটী হচ্ছে সমসাময়িক প্রসঙ্গ ও হালের খবর। পড়তে শিখলে তাদের জন্য রচিত বিশেষ ধরণের (অর্থাৎ কতকগুলো মনোনীত শব্দের সাহায্যে সহজভাবে লিখিত) খবরের কাগজ ত পড়বেই, কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে তাৎপর্য্য বুঝতে হলে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক যে পটভূমিকায় সংবাদ সরবরাহ করা হয় তা আগে বোঝা দরকার এবং দেশনেতাদের মধ্যে কে কি বলছেন, কেন বলছেন, ঠিক বলছেন কিনা, নানা সংবাদপত্রের নানারকম মত কেন, তা হলে সত্য কি করে বের করা যায়, এসব আলোচনা করে তাদের চিন্তা ও বিচার শক্তি বাড়ানো খুব প্রয়োজন। এজন্য গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিলেতে ও আমাদের দেশে সৈন্যদের

মধ্যে (বিলেতের সৈন্যদের মধ্যেও শতকরা প্রায় তিনজন নিরক্ষর ছিল) সমসাময়িক প্রসঙ্গ ও হালের খবরের বিশেষ আলোচনার বন্দোবস্ত ছিল এবং এ বিভাগের নাম ছিল এ. বি. সি. এ. (A. B. C. A.—Army Bureau of Current Affairs)। এ ব্যবস্থায় লোকশিক্ষার ফল এত চমৎকার হয়েছিল যে যুদ্ধশান্তির পর ইংলণ্ডে কার্ণেগি ট্রাষ্টের অর্থের সাহায্যে ডব্লু. ই. উইলিয়ামস্ সাহেবের পরিচালনায় (মিঃ উইলিয়ামস্ যুদ্ধের সময় এ. বি. সি. এ.'র পরিচালক ছিলেন) একটী সমসাময়িক প্রসঙ্গ ও খবরাখবর বিভাগ খোলা হয়েছে (Bureau of Current Affairs—B. C. A.)। আমাদের দেশের পক্ষে সামরিক শিক্ষা বিভাগও এ. বি. সি. এ. যে যুদ্ধের সময় লোকশিক্ষার একমাত্র বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যুদ্ধশান্তির সঙ্গে সঙ্গে সে লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে একেবারে অদৃশ্য না হয় সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার। ভারত গভর্ণমেণ্টের নিখিল ভারত লোকশিক্ষা সংসদের (Indian Adult Education Association) অর্থ সাহায্যে প্রতি প্রাদেশিক লোকশিক্ষা সংসদে ইংলণ্ডের মত একটী সমসাময়িক প্রসঙ্গ ও খবরাখবর বিভাগ খোলা দরকার যাতে তাদের চেষ্টায় প্রতি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে এ বিষয়ের বিশেষ প্রসার হতে পারে। বড় বা ছোট সহরে লণ্ডনের পূর্ব্বাঞ্চলে (East End) শ্রমিকদের টয়ন্‌বী হলের (Toynbee Hall) মত প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করাও যে বিশেষ দরকার সে সম্বন্ধেও আশা করি কোন মতভেদ হবে না।

এবার লোকশিক্ষা ব্যাপারে শিল্পপতি ও শ্রমিক সঙ্ঘগুলির কথা একটু বলা দরকার। ইংলণ্ডে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক শিক্ষাআইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকসঙ্ঘ ইত্যাদির চেষ্টায় লোকশিক্ষার ব্যবস্থা কিছু কিছু হয়েছিল এবং দিনে দিনে এ প্রচেষ্টার প্রসার হচ্ছিল। প্রথম থেকেই একটা জিনিষ ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনে পরিলক্ষিত হচ্ছিল যে ইংলণ্ডের শ্রমিকেরা একেবারে স্বাধীনচেতা, তারা অপরের মুখাপেক্ষী

না হয়ে যথাসম্ভব নিজেরা চাঁদা তুলে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে, নিজেদের স্বাধীনতার কিয়দংশও তারা বর্জ্জন কর্ত্তে চায় নি। তাই শ্রমিকশিক্ষা সঙ্ঘগুলি (Workers' Educational Association) সরকারের সাহায্য পারতপক্ষে নিতে চায় না। ১৯৪৪ সালের ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনে স্বেচ্ছাবৃত্ত সঙ্ঘগুলোকে (Voluntary Association) লোকশিক্ষা ব্যাপারে অর্থসাহায্য দেবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সর্ব্ব-ইংলণ্ডীয় শ্রমিকশিক্ষাসঙ্ঘ স্থির করেছেন যে তাঁদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখবার জন্যে সরকারের কাছে তাঁরা অর্থসাহায্য গ্রহণ কর্ব্বেন না। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন বা বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে তৎপর না হয়ে শিক্ষাব্যবস্থার দিকে আশু দৃষ্টি দিলে দেশের সত্যিকারের উপকার হবে। প্রয়োজন হয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষার জন্যে কিছু অর্থ নেওয়া যেতে পারে, যেমন ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে শিল্পপতিদের কাছ থেকে। তবে এ টাকা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দিলে আরো ভাল হয় কারণ তা হলে শ্রমিক ও শিল্পপতিদের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। আমার বক্তব্য এই যে—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই হোক বা আইনের বাধ্যতায়ই হোক, শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য শ্রমিক ও শিল্পপতিদেরই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত, এতে রাষ্ট্রের ভার বেশ খানিকটা হালকা হবে। আমাদের দেশের শিল্পপতিরা তাঁদের শ্রমকল্যাণসচিবদের (Welfare Officers) সাহায্যে কোন কোন স্থলে ক্যাডবেরী, রাউনট্রী, ভকসল ইত্যাদি বিলিতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মত লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন (যদিও তাঁদের ব্যবস্থা ডেনমার্ক* ও বিলিতি ব্যবস্থার মত আবাসিক (residential) বা অত ভাল নয়) কিন্তু আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি

* ৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

এসব বিষয়ে বিশেষ কিছুই করেন নি। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ কর্চ্ছি। পূর্ব্বেই বলেছি ইংলণ্ড ও ওয়েলসে নিজেদের চেষ্টায় শ্রমিকেরা গড়ে তুলেছে তিন হাজারের উপরে ক্লাব ও ইনষ্টিটিউট, তাদের সভ্যসংখ্যা হল কুড়ি লক্ষের উপরে এবং তাদের ধনসম্পত্তির (assets) মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে দেড় কোটি থেকে দু কোটি পাউণ্ডে। এদের পরিচালনায় চার পাঁচটী স্বাস্থ্যকর জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনীতে প্রাসাদোপম আরোগ্যালয় (Convalescence Homes) স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি সভ্য আইন, আয়কর, হিসেবপত্র, লাইব্রেরী ইত্যাদি নানাবিষয়ে সাহায্য পেয়ে থাকে। স্বাবলম্বনের এর চাইতে বড় নিদর্শন পৃথিবীতে খুব কমই মিলে।

রাষ্ট্রপরিচালিত সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, লোকশিক্ষা সম্বন্ধে মার্কিন শ্রমিকসজ্ঘগুলোর প্রচেষ্টাও বিশেষ শ্লাঘনীয়। শ্রমিকশিক্ষা আন্দোলনের একজন অন্যতম নেতা মার্ক ষ্টার সাহেব (Mr. Mark Starr) লিখেছেন যে একটি শ্রমিক ইউনিয়ন—আন্তর্জ্জাতিক স্ত্রীপোষাক নির্ম্মাতা শ্রমিকসঙ্ঘ (International Ladies' Garment Workers Union) শুধু নিজেদের চেষ্টায় পাঁচশত গোষ্ঠী ও ক্লাসে কুড়ি হাজার শ্রমিক ও কারিগরের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন। এ রকম ব্যবস্থা অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়ন থেকেও করা হয়েছে। কাজেই আমাদের দেশের শ্রমিকসজ্ঘগুলোর এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না, বিলেতের শ্রমিকদের মত তাদেরও একথা মনে হওয়া উচিত—কেন আমরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকব, যত ভাল ব্যবস্থাই হোক, কেন অপরের কৃপার পাত্র হয়ে তা নেব, যেটুকু পার্ব্ব নিজের চেষ্টায়ই তা কর্ব্ব। যতদিন না এ ভাব আমাদের শ্রমিক ও চাষীদের মধ্যে আসে, ততদিন প্রকৃত বয়স্ক-শিক্ষা বা লোকশিক্ষা এদেশে হবে বলে মনে হয় না, তবে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। যদি কোন দিন অনাস্বাদিত সুখের সন্ধান পেয়ে তারা নিজেরাই এ বিষয়ে সক্রিয় হয় এই আশায় বুক বেঁধে আমাদের

কাজ করতে হবে। তাদের ভেতরে আকাঙ্ক্ষার আলোড়ন না হলে উপর থেকে যত ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, কোন স্থায়ী ফল প্রত্যাশা করা যাবে না। তাই প্রয়োজন আমাদের সভাসমিতিতে, বক্তৃতায়, আলোচনায়, তাদের সুপ্ত মনকে জাগিয়ে তোলা, যাতে তারা নিজেরাই ঈপ্সিত পরিণতির দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে পারে বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোরও একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আছে। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় যে ভুল করেছিলেন সে ভুল করলে অবিশ্যি চলবে না, শ্রমিক ও জনতার উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় অধ্যাপকেরা যদি সান্ধ্য-বক্তৃতাবলী, আলোচনা ও চিত্রপ্রদর্শনাদির ব্যবস্থা করেন, তা হলে এগুলো আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে উঠছে তা ভেঙ্গে পড়বে। বিলেতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আজ শ্রমিকদের জন্য 'টিউটোরিয়াল' ক্লাস ও বিশেষ বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা করে এদের যথার্থ জ্ঞানের পথে চালিত কর্চ্ছেন। অবিশ্যি তারা কিছু শিক্ষিত, আমাদের হয় ত একেবারে কেঁচে গণ্ডূষ করে প্রথম থেকে শুরু কর্ত্তে হবে।

একটী বিষয় বিশেষ করে মনে রাখা কর্ত্তব্য। বয়স্কদের স্কুলগুলো চালানো উচিত ক্লাবনীতিতে—অর্থাৎ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মে ক্লাসে বসে দু তিন ঘণ্টা পড়বার বা লিখবার কোন প্রয়োজন নেই, ক্লাসে মাষ্টার মশায় কিছু বুঝিয়ে দিলে চার পাঁচজন করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে তারা কাজ কর্ত্তে পারে, একে অন্যকে পড়া দেখিয়ে দিতে পারে, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে পারে, সব সময়ই কিছু মাষ্টার মশায়ের উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই। চিত্তবিনোদনের জন্য গানবাজনা, আবৃত্তি, অভিনয় এসবও তারা ইচ্ছামত কর্ত্তে পারে, পূজো পার্ব্বণে যাত্রা, কথকতা, লোকনৃত্য, গাজির পট ইত্যাদির ব্যবস্থা কর্ত্তে পারে, কারো ইচ্ছে হয় সে বই নিয়ে বা খবরের কাগজ নিয়েও বসে পড়তে পারে বা কুটীরশিল্পের কাজ কর্ত্তে পারে। তবে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর দৃষ্টি রাখা দরকার যে সবাই কিছু কিছু

লেখাপড়া শিখছে ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের, দেহের ও চরিত্রের উন্নতি হচ্ছে, এক কথায় তারা আনন্দময় নাগরিকোচিত জীবন যাপন কর্চ্ছে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিক্ষকের সংখ্যাও কম লাগবে, তিনটী শ্রেণীর জন্য দু জন শিক্ষক হলেই চলবে। ক্লাব-নীতিতে চলে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বয়স্ক-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলো যে আশাতীত ফল লাভ করেছে তা থেকে মনে হয় বড়দের শিক্ষায় এ নীতি আমাদের দেশেও সমান ফলপ্রসূ হবে। স্বাধীনতা, আলোচনা ও আনন্দের ভেতর দিয়ে দিতে হবে তাদের শিক্ষা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় আবদ্ধ করে রেখে নয়। এ ক্লাবনীতিতে চলতে গেলে আমাদের স্কুলের আসবাবপত্রও বদলানো দরকার (প্রাথমিক স্কুলে এ বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল)—মাদুর পেতে নিজেদের ছোট জলচৌকি নিয়ে কাজ কর্ব্বে যার যার সুবিধে মত ডেস্কবেঞ্চির বালাই চুকিয়ে দিয়ে।

এখন বোধ হয় আমাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় হয়েছে—কতদিন ধরে এবং কোন সময়ে এ শিক্ষা দিতে হবে। আমরা যে ধরণের শিক্ষা দিতে চাই তাতে অন্ততঃ এক বছর প্রত্যেক বয়স্ক ও বয়স্কা প্রত্যক্ষভাবে একটী শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে, নইলে তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিও হবে না, নাগরিকোচিত কর্ম্মকুশলতাও বর্ত্তাবে না এবং গ্রামকে স্বচ্ছন্দ বাসোপযোগী করে তোলাও যাবে না। প্রয়োজন বোধে অবিশ্যি শিক্ষাকালটা কমিয়ে মৌসুমী বিদ্যালয়ও (Seasonal School) প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। বয়স্কাদের অপরাহ্ণে শিক্ষা দেওয়ার কথা পূর্ব্বেই বলেছি। নৈশবিদ্যালয় সম্বন্ধে যে আপত্তি তোলা হয় তা অনেক স্থলেই যুক্তিযুক্ত। তবে যতদিন না ছোটদের বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের সময় পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, ততদিন নৈশ বিদ্যালয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। বয়স্ক-শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ঘরবাড়ী বা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করার অর্থ আমাদের নেই, সম্প্রতি এর প্রয়োজনও বিশেষ কিছু নেই। বুনিয়াদী স্কুলের সাজসরঞ্জাম, বাতি ইত্যাদিও

বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যবহৃত হবে। বয়স্ক-শিক্ষা বিদ্যালয় সাধারণতঃ বুনিয়াদী শিক্ষালয় গৃহে বা পল্লীউন্নয়ন কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হবে এবং বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীরাই দু এক জন স্বেচ্ছাসেবীর সাহায্য গ্রহণ করে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন কর্ব্বেন। প্রয়োজন হলে ছাত্রছাত্রীর ভেতর কুশলী, শিল্পী বা শিল্পাভিজ্ঞ বয়স্ক-বয়স্কাকে স্বেচ্ছাসেবীর পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে। বৈতনিক বা অবৈতনিক শিক্ষক দুয়েরই বয়স্ক-শিক্ষা দেশের কাজ বা স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাজ বলে গ্রহণ কর্ত্তে হবে। বৈতনিক শিক্ষকদের অবিশ্যি কিছু ভাতা দিতে হবে, তবে এ ভাতা খুব বেশী না হলেও চলবে কারণ আশা করা যাচ্ছে তাঁদের বেতন বৃদ্ধি শীঘ্রই হবে। পূর্ব্বেই বলেছি বয়স্ক-শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন, পুস্তকাদি ভিন্ন এবং গ্রামে বাসোপযোগী নানা তথ্য, কার্য্যদক্ষতাও বয়স্কদের আয়ত্ত করা প্রয়োজন। সুতরাং এর জন্যে স্বল্পকালের জন্যে হলেও আলাদা ট্রেনিং দরকার। অন্ততঃ মাস দুয়ের জন্যে মনোনীত শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীকে বিশেষ শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে ট্রেনিং দিয়ে কাজের লায়েক করে নিতে হবে।

প্রতি কেন্দ্রে অন্ততঃ দু জন করে বৈতনিক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী থাকা দরকার, এবং তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হবেন। অবৈতনিক শিক্ষক বা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রধান শিক্ষকদের নির্দ্দেশমত কাজ কর্ত্তে হবে।

এবার স্কুল পরিদর্শনের কথা ভাবা উচিত। একথা ঠিক, যথারীতি তদারক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উৎসাহদানের অভাবে বয়স্ক-কেন্দ্র-গুলোর আশানুরূপ উন্নতি হয় না, সুতরাং স্কুল পরিদর্শনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা দরকার, কিন্তু এর জন্য আলাদা অর্থব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে সরকারের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। স্কুল সাবইন্সপেক্টর ও সাবরেজিষ্ট্রার এঁরা দুজনেই গ্রামে সমাসীন, কাজেই মুখ্যতঃ তাঁদেরই নিয়মিতভাবে স্কুল পরিদর্শনের ভার গ্রহণ কর্ত্তে হবে, তারপর সমবায় ও গ্রাম উন্নয়নবিভাগের, স্বাস্থ্যবিভাগের, প্রচারবিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও সার্কেল অফিসার ও ইউনিয়নবোর্ডের

প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বারগণ, মহিলাসমিতি ও সঙ্ঘের সভ্যগণ, স্থানীয় স্বেচ্ছাসমিতিগুলোর কর্ম্মিগণ যে যখন সময় পান কেন্দ্রে এসে বক্তৃতা করে, ছবি দেখিয়ে, আলাপ আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত কর্ব্বেন ও পুস্তকাদি যা পারেন কেন্দ্রে দান কর্ব্বেন। সরকারের নির্দ্দেশমত অন্ততঃ মাসে একবার করে কেন্দ্রে এঁদের আসতে হবে। সত্যিকারের একটা বড় কাজে সহায়তা কচ্ছে̐ন এ মনোভাব পোষণ করা প্রয়োজন। এ বিরাট অভিযানে জনসাধারণের আন্তরিকতার চাইতে বড় পাথেয় ও আশীর্ব্বাদ আর কিছু হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বয়স্ক-শিক্ষা পরিচালনার ভার কে গ্রহণ কর্ব্বে এ প্রশ্ন স্বতঃই ওঠে। প্রগতিশীল দেশে দেখা গেছে শ্রমিক ও চাষী-সঙ্ঘ বা তাদের শিক্ষাসংসদগুলো এর ভার গ্রহণ করে নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বার্থ অপ্রতিহত রেখেছেন, অপরের অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতার ধার তাঁরা ধারেন নি। কিন্তু আমাদের দেশে তা হওয়া সম্ভব নয়, দেশ ও শ্রমিকেরা এখানে অনুন্নত, অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় সরকার ও অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেই মুখ্যতঃ বয়স্কশিক্ষার ভার গ্রহণ কর্ত্তে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক চাষীদের মধ্যে এ প্রেরণার স্বষ্টি কর্ত্তে হবে যে তাদের শিক্ষার জন্যে মুখ্যতঃ তাদেরই একদিন দায়িত্ব গ্রহণ কর্ত্তে হবে। একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয়, অনেক সময় বেহুদা যে আপত্তি তোলা হয়—সরকারের হাতে বয়স্ক-শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা উচিত নয়—দাসত্বমুক্ত ভারতে এ যুক্তি কি আজ আর খাটে? বিশেষ করে, যেমন ব্যাপক ও আন্তরিক ভাবে নানা সরকারী বিভাগের সাহায্য প্রয়োজন বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে কার্য্যকরী করে তুলতে, তা মোটেই সম্ভব হবে না বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে এ শিক্ষার ভার ছেড়ে দিলে। পূর্ব্বেই বলেছি এত বড় দায়িত্ব, এক শুধু রাষ্ট্রই গ্রহণ কর্ত্তে পারে। রুশ, তুরস্ক ও চীন তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কাজেই এ নিয়ে মাথা না ঘামানোই উচিত। তবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ করে বয়স্ক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য বিশেষ ভাবে

নেওয়া প্রয়োজন এবং স্থানে স্থানে বয়স্ক-শিক্ষা সঙ্ঘের প্রবর্ত্তন হওয়া দরকার। বঙ্গীয় বয়স্ক-শিক্ষা সমিতির অভিজ্ঞতা ও উপদেশ নিশ্চয়ই সরকার যথাসম্ভব গ্রহণ কর্ব্বেন এবং সরকারের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও যাতে এঁদের উপযুক্ত প্রতিনিধি স্থান পান সে বিষয়েও নিশ্চয় দৃষ্টির অভাব হবে না। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সরকারের এ কয়টী বিভাগের কর্ণধারদেরও থাকা উচিত—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেতার, স্বরাষ্ট্র, সমবায়, রেজিষ্ট্রেশন, পূর্ত্ত ও জলসেচ। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, শিল্পপতি, শ্রমিকসঙ্ঘ, সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রতিনিধিরাও এতে থাকবেন। কেন্দ্রীয় কমিটীর উপদেশে শিক্ষাবিভাগের পরিচালনায় জাতির সমস্ত শক্তি এ কার্য্যে নিয়োজিত না হলে দশ বৎসরের ভেতর দেশের জাগ্রত মূর্ত্তি আমরা কিছুতেই দেখতে পাব না। কেন্দ্রীয় কমিটির কর্ত্তব্য হবে অল্প দামে শ্লেট পেন্সিল যাতে পাওয়া যায় তা দেখা এবং লব্যাক প্রণালীতে প্রস্তুত বড় হরফে লেখা ক্রমিক পাঠ্যপুস্তক, গল্পের বই, গ্রামের জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগদর্শী ছোট ছোট পুস্তিকা, খবরের পাতা (News Sheet) ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে সুলভ মূল্যে বের করে কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রেরণ করা ; এজন্যে তাঁরা নিজেরাও চাঁদা তুলবেন, এবং সরকার থেকেও বাৎসরিক একটা মোটা টাকা পাবেন। স্থানে স্থানে স্বল্প-বিস্তারী (Short Range) বেতারকেন্দ্র ও ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরী করার ব্যবস্থাও এঁদের কর্ত্তে হবে। যুদ্ধের সময় এন্‌সা (ENSA) ও সিমা (CEMA) সৈন্যদের সঙ্গীত, চারুকলা, উচ্চাঙ্গের অভিনয় ইত্যাদি দ্বারা চিত্তবিনোদন করে ছিল। ইংলণ্ডে সেই 'সিমা'কে "বিসিএম্‌এ" (British Council of Music and Arts) নাম দিয়ে শান্তির সময়ও লোকশিক্ষা ও চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিসিএম্‌এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার পার্টি, উচ্চাঙ্গের চিত্রপ্রদর্শনী ও কনসার্ট ইত্যাদি দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ করে জনতার কৃষ্টিজীবনকে উন্নততর কর্চ্ছেন। আমাদের দেশের প্রাদেশিক সরকারগুলিরও এ ব্যবস্থা করা

প্রয়োজন কেন্দ্রীয় কমিটির সাহায্য নিয়ে। রাজধানী থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে গ্রামের কেন্দ্রগুলোকে উপদেশ দেওয়া বা দেখাশুনো করা সম্ভব নয়, স্থতরাং ইউনিয়নবোর্ডের একটী স্থায়ী কমিটিকে এ দায়িত্ব গ্রহণ কর্ত্তে হবে। এ কমিটিতে স্কুল সাবইন্সপেক্টর বা রেজিষ্ট্রার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। শিক্ষাবিভাগ যথাসম্ভব স্বাধীনতা নীতি অবলম্বন কর্ব্বেন গ্রাম্য কেন্দ্রগুলো পরিচালনা বিষয়ে, তবে তদন্তের রিপোর্ট অনুসারে কেন্দ্রগুলোর উন্নতিবিধানে যা করণীয় তা তাকে কর্ত্তেই হবে। ইউনিয়নবোর্ড-লোক-শিক্ষা কমিটির হস্তে গুরুভার ন্যস্ত করা হলে তাদের উচিত হবে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে থিয়েটার পার্টী, যাত্রাপার্টী, মন্দির মসজিদে কৃষ্টিসম্মেলন, ও গ্রামের লাইব্রেরী ও পাঠাগারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। জনসাধারণের মনে যেন এ ধারণা আসে, সত্যি তারা আজ স্বাধীন হয়েছে জাতি ধর্ম্ম শ্রেণী নির্ব্বিশেষে দেশের কৃষ্টির অধিকারী হয়ে।

বয়স্ক-শিক্ষা প্রসঙ্গে যে সব মূলনীতি আলোচিত হয়েছে সে সব সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে ১১ থেকে ৪০ বৎসর বয়স্ক নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা নব্বই লক্ষের মত, কিছু কম বেশী হতে পারে। এ নব্বই লক্ষের মধ্যে এই বয়সের প্রায় বার লক্ষ স্ত্রীপুরুষ কলকাতা, হাওড়া, ও রাণীগঞ্জ, আসানসোল প্রভৃতি শিল্পপ্রধান সহরাঞ্চলে বাস করে এবং তারা শ্রমিক, চাকর, ঝি, চাপরাশি, ফিরিওয়ালা, মুটে মজুর ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত। কলকারখানার নিরক্ষর শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, কাজেই এ দশ লক্ষ শ্রমিকের শিক্ষার ভার শিল্পপতি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর যুগ্মভাবে নেওয়া উচিত, এবং বাদবাকী দু লক্ষের ভার মিউনিসিপ্যালিটী বা করপোরেশনগুলোর নেওয়া উচিত। প্রয়োজন হলে ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট, ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট বা মিউনিসিপ্যাল ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এ্যাক্ট সংশোধন করে এর ব্যবস্থা করা দরকার। আশা করি শিল্পপতি, শ্রমিকসঙ্ঘ ও ও মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় আইনের বাধ্যবাধকতার

প্রয়োজন হবে না। তা হলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল ১১ থেকে ৪০ বৎসর বয়স্ক আটাত্তর লক্ষ নিরক্ষরের জন্যে। যা হোক দশ বৎসরের ভেতর আমরা নব্বই লক্ষ নিরক্ষরের শিক্ষার বন্দোবস্তই কর্ব্ব, কারণ ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কার কখন সুমতি হবে সে জন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে না। অর্থাৎ বৎসরে নয় লক্ষ স্ত্রীপুরুষকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে। তবে আশা করা যায় প্রগতিশীল শিল্প, শ্রমিক ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের দায়িত্বটুকু সম্বন্ধে আশু ব্যবস্থা কর্ব্বেন।

অনেকের মত গ্রামে প্রতি ইউনিয়নে একটি করে বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র করা, কিন্তু আমাদের দেশে তা হলে এর অগ্রগতি ব্যাহত হবে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের রাস্তাঘাট খারাপ এবং লোকগুলোও রোগে জরাজীর্ণ, কাজেই তাদের পক্ষে অনেক পথ হেঁটে শিক্ষাকেন্দ্রে আসা কষ্টকর। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বয়স্ক-শিক্ষার ইতিহাসে এটা দেখা যায় বটে, ভীষণ কন্‌কনে ঠাণ্ডার ভেতর বরফ ভেঙ্গেও পাঁচসাত মাইল হেঁটে গ্রামাঞ্চলের লোক শিক্ষাকেন্দ্রে গেছে, কিন্তু সে নজির এদেশে বা পশ্চিমবঙ্গে চলবে না। এখানে প্রতি গ্রামে একটি করে শিক্ষাকেন্দ্র থাকা প্রয়োজন এবং ইউনিয়নের ভেতর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সহজাধিগম্য কেন্দ্রে রেডিয়ো ও তাঁত প্রভৃতি শিল্পসরঞ্জাম রাখা যেতে পারে। ইউনিয়নে পাঁচটি করে শিক্ষাকেন্দ্র (তিনটি পুরুষ, ও তুটি স্ত্রী কেন্দ্র) থাকলে গ্রামপিছু প্রায় একটি করে কেন্দ্র পাওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে তু হাজার ইউনিয়ন আছে সুতরাং দশ হাজার স্কুল প্রয়োজন। প্রতি স্কুলে বয়স অনুসারে তিনটি শ্রেণী থাকবে (১১ থেকে ১৬, ১৭ থেকে ২৫, ২৬ থেকে ৪০) সুতরাং অন্ততঃ তুটি করে বৈতনিক (ভাতাওয়ালা) শিক্ষক প্রয়োজন। ক্লাবনীতিতে স্কুল চালালে এতেই যথেষ্ট হবে, তারপর স্বেচ্ছাসেবীরা ত আছেনই। শ্রেণীতে ত্রিশটি করে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ধরে প্রতি স্কুলে নব্বইটি এবং দশ হাজার স্কুলে নয় লক্ষ বয়স্কবয়স্কা বৎসরে শিক্ষালাভ কর্ব্বে। দশ বৎসরে নব্বই

লক্ষের নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পাবে।

দশ হাজার স্কুলে কুড়ি হাজার ভাতাভোগী শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী পেতে আমাদের কষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ আমাদের হাতে বর্ত্তমানে প্রায় ৩২০০০ প্রাথমিক শিক্ষক ও ১৩০০ মাধ্যমিক শিক্ষক আছেন এবং পঁয়তাল্লিশ হাজারের মধ্যে কুড়ি হাজার বেছে নিতে বেশী বেগ পেতে হবে না। স্কুল প্রতি শিক্ষকের ভাতা পনের টাকা ধর্ল্লে (প্রধান শিক্ষক ৯৲ টাকা ও সহকারী শিক্ষক ৬৲ টাকা) দশ হাজার স্কুলে শিক্ষকের বেতন বাবদ বছরে পড়বে আঠার লক্ষ টাকা।

আমরা যে ধরণের উন্নততর শিক্ষা দিতে তৎপর হয়েছি এবং পাঠ্যসূচীতে যখন লেখাপড়া, আঁক, অঙ্কন, স্বাস্থ্য, পল্লীউন্নয়ন, গ্রামবাসোপযোগী নানা কৃত্যাদি, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি স্থান পেয়েছে* তখন অন্ততঃ দু মাসের জন্যে শিক্ষকদের বয়স্ক-শিক্ষার বিশেষ প্রণালীতে ট্রেনিং দেওয়া দরকার। প্রতি শিক্ষককে শিক্ষাকালীন মাসে কুড়ি টাকা বৃত্তি দিলে খরচ হবে অপৌনঃপুনিক ভাবে আট লক্ষ টাকা এবং শিক্ষণ-শিক্ষালয় চালাতে যেসব অত্যাবশ্যক খরচ প্রয়োজন তার বাবদ ধরা যেতে পারে এর উপর শতকরা দশ টাকা অর্থাৎ আশী হাজার টাকা। প্রতি শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে ২০০ করে শিক্ষক 'ট্রেন' কর্ল্লে এক শ° শিক্ষণ-শিক্ষালয় প্রয়োজন হবে। দু মাসের জন্য এক শ শিক্ষণ-শিক্ষালয় চালাবার জন্য অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকগণকে আলাদা বেতন দেবার প্রয়োজন নেই, সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে তাঁদের নিলেই হবে।

প্রতি স্কুলে একটী লাইব্রেরী থাকবে, কারণ লাইব্রেরীই বয়স্ক-শিক্ষার প্রাণস্বরূপ, উপযুক্ত লাইব্রেরীর অভাবে সাক্ষরও শীঘ্রই নিরক্ষরে পরিণত হবে। প্রথম বছর অন্ততঃ এক শ টাকার বিশেষ প্রণালীতে (ডক্টর লব্যাকের অনুসৃত পন্থায়) প্রস্তুতীকৃত সুলভ

---

* ১৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পুস্তকাবলী কেনা প্রয়োজন, পরে বৎসর বৎসর অন্ততঃ দশ টাকা করে লাইব্রেরী গ্রাণ্ট স্কুলের পাওয়া উচিত। এতে প্রথমে দশ লক্ষ ও পরে বৎসরে এক লক্ষ করে টাকা লাগবে। কেন্দ্রীয় বয়স্ক-শিক্ষা কমিটি যে সব ক্রমিক পাঠ্যপুস্তক বা খবরের পাতা ইত্যাদি বের কর্ব্বেন সেগুলো অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে এসব লাইব্রেরীতে সরবরাহ করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির বাৎসরিক সরকারী গ্রাণ্ট বা ভৃতি অন্ততঃ দশ হাজার টাকা হওয়া উচিত, তারপর চাঁদা থেকেও নিশ্চয় কিছু আসবে।

ইউনিয়নের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সহজাধিগম্য কেন্দ্রে রেডিয়ো রাখা বাবদ (২০০০ × ৩০০ টাকা) ছ লক্ষ ও তাঁত ইত্যাদি মহার্ঘ শিল্পসরঞ্জাম রাখা বাবদ (২০০০ × ৩০০) ছ লক্ষ, সর্ব্বসমেত অপৌনঃপুনিক বার লক্ষ টাকা লাগবে। মেরামতির কাজ কলকাতার প্রচারবিভাগ ও শিল্পবিভাগের সহায়তায় সম্পন্ন হবে।

বয়স্ক-শিক্ষা পরিকল্পনার কাজ শুরু হবার আগে বেশ কিছুদিন ধরে প্রচারকার্য্যটা ভালভাবে চালাতে হবে। সেজন্য গণ্যমান্য লোক ও শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের শুধু বক্তৃতা ও গ্রাম ও সহর-বাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা মিটিং কর্লেই চলবে না, কিছু মনোজ্ঞ চিত্তাকর্ষক পোষ্টারের প্রয়োজন, এ বাবদ অপৌনঃপুনিক ভাবে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা প্রয়োজন। প্রচারবিভাগ ইউনিয়ন বোর্ডের বয়স্ক-শিক্ষা কমিটির সাহায্যে এ পোষ্টারগুলো হাটে বা বাজারে অর্থাৎ অতি প্রকাশ্য জায়গায় মেরে দেওয়ার ব্যবস্থা কর্ব্বেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা ফিল্ম ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি কর্ব্বেন।

পূর্ব্বেই বলেছি স্কুল পরিদর্শন বা স্কুল ঘরের জন্যে আলাদা খরচ নেই, স্কুল সাবইন্সপেক্টর ও সাবরেজিষ্ট্রার মুখ্যতঃ এ জন্য দায়ী থাকবেন এবং অন্যান্য বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারিগণ, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর ও স্বেচ্ছাপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা অন্ততঃ মাসে একবার ইউনিয়নের কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন কর্ব্বেন এবং ছবি দেখিয়ে, গল্প বলে, আলাপ আলোচনা করে তাদের প্রাণে নতুন জগতের সাড়া